উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষাণ্মাযিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের মতই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি-প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক এবং কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) রঞ্জন চক্রবর্তী
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা
বিষয় : সাম্মানিক ইতিহাস
(Subject : Honours in History)
Course : History of India V (c. 1550-1605)
Course Code : CC-HI-09

প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর, 2022
First Print : October, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা
বিষয় : সাম্মানিক ইতিহাস
(Subject : Honours in History)
Course : History of India V (c. 1550-1605)
Course Code : CC-HI-09

: বিষয় সমিতি :

: সদস্যবৃন্দ :

অমল দাস
Professor of History (Former), Department of History, University of Kalyani

চন্দন বসু
Professor of History, School of Social Sciences, NSOU

ঋতু মাথুর (মিত্র)
Associate Professor of History, School of Social Sciences, NSOU

বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী
Associate Professor of History, Shyamsundar College, Burdwan

বলাইচন্দ্র বাড়ুই
Professor of History (Former), Department of History, University of Kalyani

রূপ কুমার বর্মণ
Professor of History, Department of History, Jadavpur University

মনোশান্ত বিশ্বাস
Professor of History, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia

: রচনা :

একক : ১ - ১৩, ১৯-২১ : সুব্রত রায়
Assistant Professor of History, Shantipur College

একক : ১৪-১৮ : রাজনারায়ণ পাল
Assistant Professor of History, Mahadevananda Mahavidyalaya

: সম্পাদনা :

মনোশান্ত বিশ্বাস
Professor of History, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia

: বিন্যাস সম্পাদনা :

চন্দন বসু
Professor of History, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ
নিবন্ধক (কার্যনির্বাহী)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

UG : History
(HHI)

History of India V (c. 1550-1605)

পর্যায় : ১ ❐ তথ্যসমূহ ও ইতিহাস চর্চা

একক - ১ ❐ ফারসি সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং অনুবাদ সমূহ 7-12

একক - ২ ❐ আঞ্চলিক সাহিত্যের পরম্পরা 13-16

একক - ৩ ❐ আধুনিক ব্যখ্যাসমূহ 17-21

পর্যায় : ২ ❐ মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা

একক - ৪ ❐ বাবরের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ 22-27

একক - ৫ ❐ আগ্নেয়াস্ত্র, সামরিক প্রযুক্তি এবং যুদ্ধব্যবস্থা 28-33

একক - ৬ ❐ সাম্রাজ্যের জন্য হুমায়ুনের প্রচেষ্টা 34-37

একক - ৭ ❐ শেরশাহ ও তাঁর প্রশাসনিক এবং রাজস্ব সংস্কার 38-43

পর্যায় : ৩ ❐ আকবরের অধীনে মুঘল শাসনের সুপ্রতিষ্ঠা/সুদৃঢ়করণ

একক - ৮ ❐ সামরিক অভিযান সমূহ এবং জয়ের ধারা: যুদ্ধকৌশল এবং প্রযুক্তি 44-51

একক - ৯ ❐ প্রশাসনিক বিধি সমূহের বিবর্তন: জাবতি, মনসব, জায়গির এবং মাদাদ-ই-মাস 52-60

একক - ১০ ❐ বিদ্রোহ সমূহ এবং তার প্রতিরোধ 61-65

পর্যায় : ৪ ❐ সম্প্রসারণ ও একীকরণ

একক - ১১ ❐ মুঘল অভিজাত সম্প্রদায়ের সাথে রাজপুত ও অন্যান্য দেশীয় সম্প্রদায়ের সংযোগসাধন 66-70

একক - ১২ ❐ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্য 71-75

একক - ১৩ ❐ মুঘল শাসনে বাংলাদেশ 76-83

পর্যায় : ৫ ❐ গ্রামীণ সমাজ এবং রাজস্ব ব্যবস্থা

একক - ১৪	❐	জমির স্বত্ব ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা; জমিদার ও কৃষক	84-104
একক - ১৫	❐	গ্রামীণ অস্থিরতা	105-110
একক - ১৬	❐	কৃষির প্রসার	111-115
একক - ১৭	❐	কৃষি-উৎপাদন	116-121
একক - ১৮	❐	শস্যের ধরন	122-124
একক - ১৯	❐	বাণিজ্য পথ ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ধরন	125-135
একক - ২০	❐	নৌ বাণিজ্য; সুরাট বন্দরের উত্থান	136-145

পর্যায় : ৬ ❐ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ সমূহ

একক - ২১	❐	রাজনৈতিক মতাদর্শ সমূহ: তত্ত্ব এবং প্রয়োগ	146-149
একক - ২২	❐	ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সুলহ-ই-কুল; সুফি আধ্যাত্মিকতা এবং বৌদ্ধিক মধ্যস্থতা	150-155
একক - ২৩	❐	উলেমাদের ভূমিকা	156-158

পর্যায় : ১ ◻ তথ্যসমূহ ও ইতিহাস চর্চা

একক : ১ ◻ ফারসি সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং অনুবাদ সমূহ

গঠন

১.০ **উদ্দেশ্য**

১.১ **ভূমিকা**

১.২ **ফারসি সাহিত্য**

১.৩ **দরবারি সাহিত্য**

১.৪ **বিদেশি বিবরণ**

১.৫ **আঞ্চলিক সাহিত্য**

১.৬ **অনুবাদ সমূহ**

১.৭ **উপসংহার**

১.৮ **প্রশ্নাবলী**

১.৯ **গ্রন্থপঞ্জি**

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল

- মুঘল আমলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সমসাময়িক বিবরণগুলির ভিত্তিতে সম্যক ধারণা লাভ করা।
- মুঘল আমলে রচিত বিভিন্ন জীবনচরিত, আত্মজীবনী, দরবারি সাহিত্য এবং আঞ্চলিক ভাষায় রচিত বিভিন্ন বিবরণগুলির গুরুত্ব, প্রামণ্যতা ও সেগুলিকে নিয়ে পরবর্তীকালে ইতিহাসচর্চার ধারা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।
- মুঘল ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাহিত্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণ এবং অনুবাদ সংস্কৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা।
- আমরা সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন পর্যটক ও ভ্রমণকারীদের ভারত ভূখণ্ডে এসে ভারতবর্ষের সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার নজির দেখেতে পাই। মুঘল আমলও এর বাতিক্রম ছিল না। ফলে সমসাময়িক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পর্যটক, ভ্রমণকারী, বণিক বা রাজদরবারে আগত প্রতিনিধির বিবরণগুলি থেকে সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা।

১.১ ভূমিকা

তথ্য ছাড়া ইতিহাসচর্চা হয় না। মুঘল আমলের ভারত ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে তথ্যসমূহ গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে ফারসি ভাষায় লেখা জীবনচরিত (Biography), আত্মজীবনী (Autobiography), দরবারি সাহিত্য, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই কারণে ভারতে মুঘল আমল সরকারি উদ্যোগে ইতিহাস রচনার যুগ বলে অভিহিত হয়। তা ছাড়া মুঘল আমলে ভারতে আগত বিভিন্ন পর্যটক ও ভ্রমণকারীদের বিবরণ ও স্মৃতিকথা থেকেও মুঘল যুগের ইতিহাসের অনেক নিদর্শন আমরা খুজে পাই।

১.২ ফারসি সাহিত্য

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ঐতিহাসিক না হলেও তুর্কি ভাষাতে লেখা তাঁর আত্মচরিত বাবরনামা-তে তাঁর নিজ জীবনকথা, তাঁর বাল্যকাল, যৌবনকাল, তাঁর কঠোর সংগ্রাম ও অভিযান এবং অবশেষে ভারতে রাজ্যে প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বিবৃত করেছেন। সর্বোপরি সমসাময়িক ভারতবর্ষের সমাজ ও রাজনীতির বর্ণনার পাশাপাশি ভারতের আবহাওয়া, জলবায়ু, ফুল-ফল ও প্রকৃতির বিবরণ তাঁর রচনায় ফুটে ওঠার ফলে এই গ্রন্থটি মুঘল ইতিহাসচর্চার এক অন্যতম দলিল রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আকবরের শাসনকালে আবদুর রহিম খান-ই-খানান তুর্কি ভাষা থেকে এ গ্রন্থটিকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তী কালে হেনরী বেভারিজ ফারসি থেকে এটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

বাবর পারসিক ও তুর্কি ভাষাতে কবিতা ও গান লিখে রেখে গিয়েছেন। এছাড়া খাজা ওবায়ইদুল্লার *রিসালা-ই—ওয়ালিয়াদিয়া* ফারসি থেকে তুর্কি ভাষায় তিনি অনুবাদ করেন। *রিসালা-ই-উরুজ* নামে একটি কবিতার বই লেখার পাশাপাশি বাবর একটি নতুন লেখনী বের করেছিলেন, যাকে খত-ই-বাবরী বলা হয়।

সম্রাট হুমায়ুনের ভগ্নী গুলবদন বেগম রচিত *হুমায়ুননামা* মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে হুমায়ুনের সুখদুঃখের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। গুলবদন বেগম কেবলমাত্র হুমায়ুনের সমসাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন তাই নয়, এরই সাথে সাথে তিনি মুঘল হারেমের অনেক ঘটনাকেও তুলে ধরেছেন। গৌড় থেকে হুমায়ুনের দিল্লি প্রত্যাবর্তনের বিশদ বিবরণ এবং চৌসার যুদ্ধে পরাজয়ের পর হুমায়ুনের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও গুলবদন বেগম তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ফলে সেকালের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য তথ্য *হুমায়ুননামা*-তে পাওয়া যায়। হুমায়ুনের সমসাময়িক ও তাঁর পারস্য সফরসঙ্গী ছিলেন জওহর আফতবচী। তিনি ১৫৮৭ সালে *তাজকিরাৎ-আল—ওয়াকিয়াৎ* নামে একটি গ্রন্থে হুমায়ুনের জীবনের নানান ঘটনা সন্নিবিষ্ট করেন। মেজর স্টুয়ার্ট এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে হুমায়ুনের অপর এক সফরসঙ্গী বায়াজিদ মুজসার নামে আরো একটি বই লেখেন কিন্তু বায়াজিদের তুলনায় জওহর আফতবচীর গ্রন্থ অনেক বেশি তথ্য সমৃদ্ধ ছিল।

জওহর আফতবচী তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন যে, রাজ্য হারানোর পর দ্বিতীয়বার রাজ্যলাভের মতো দুঃসাধ্য সাধন করেছিলেন হুমায়ুন। এই অসাধ্য সাধনের স্মৃতি যাতে চিরকাল বিশ্ববাসীর মনে জাগরুক থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ হতে শুরু করে দ্বিতীয়বার তাঁর রাজ্যলাভ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা জওহর তাঁর গ্রন্থে বিবৃত করেছিলেন। হুমায়ুনের চরিত্রের গুণ ও দোষ, কাব্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর প্রবল আগ্রহ ও আকর্ষণের কথাও জওহর লিখেছেন। ফলে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও জওহরের গ্রন্থটি হুমায়ুনের রাজত্বকালের একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস।

মুঘল সম্রাট আকবরের আদেশে আব্বাস খান শেরওয়ানি *তারিখ-ই-শেরশাহী* নামে শের শাহের উপর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থটির রচনা-কাল সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে, তবে গ্রন্থটি সমসাময়িককালের চিত্র যা সুবিন্যস্তভাবে গ্রন্থকার অঙ্কন করেছেন। গ্রন্থটির সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশি নেই, একে জীবন-চরিত বলা যায়, ইতিহাস হিসেবেও

গ্রন্থটি বেশি বিবেচ্য নয়। শেরশাহের চরিত্র ও প্রতিভার কথা এতে সুষ্ঠুভাবে জানতে পারা যায়। সেকালের আইন-কানুন এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর তিন দশক ধরে মুঘল-আফগান সম্পর্কের ইতিহাস গ্রন্থাকার আব্বাস দেখেছিলেন। ফলে তিনি তাঁর গ্রন্থে শেরশাহের আমলের প্রজাদের শান্তি ও নিরাপত্তা, প্রশাসনিক দক্ষতা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, রাজপথের ও দেশব্যাপী পথঘাটসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সুখ-সমৃদ্ধির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া শেরশাহের জীবনকথা, তাঁর উত্থান ও রাজনৈতিক সাফল্যের কাহিনি এবং বিজয়সমূহের বিবরণ, সুবিচার ও প্রজার সুখ-শান্তি ও কল্যাণের প্রতি শেরশাহের সজাগ দৃষ্টির কথা আব্বাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের মুঘল ইতিহাস রচয়িতাদের অনেকেই আব্বাসের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে তাঁদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেও সকলেই যে আব্বাসের প্রতি ঋণ স্বীকার করেছেন তা নয়।

১.৩ দরবারি সাহিত্য

আকবরের সময়কাল থেকে ইতিহাস রচনার ধারা বদলে যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের পাশাপাশি এই উপমহাদেশের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রকে যিনি উচ্চতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি হলেন আকবরের অন্যতম সভাসদ আবুল ফজল। তিনি প্রায় ১০টি গ্রন্থের প্রণেতা, তবে তাঁর অনুপম সৃষ্টি *আকবরনামা* একটি কালজয়ী ইতিহাস গ্রন্থ। তিনি প্রথমে পাঁচ খণ্ডে *আকবরনামা* শেষ করার পরিকল্পনা নেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি তিনটি খণ্ড রচনা করতে সক্ষম হন। এ তিন খণ্ডের দু খণ্ড বর্ণনামূলক ও এক খণ্ড তথ্যমূলক যা *আইন-ই-আকবরি* নামে সমধিক পরিচিত। আবুল ফজল তাঁর রচিত ইতিহাসকে বলেছেন তারিখ অনুযায়ী নথিভুক্ত পৃথিবীর ঘটনা। কিন্তু আকবরনামা পৃথিবীর ঘটনা নয়। মুঘল ইতিহাসের প্রেক্ষাপট আসার আগে পর্যন্ত আবুল ফজল কতকগুলি সাধারণ ঘটনাকে বেছে নিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা বলেছেন। কিন্তু ঘটনার কারণগুলি সম্পর্কে আবুল ফজল কোনো সাধারণ নিয়ম বের করার চেষ্টা করেননি।

আকবরের নির্দেশে আবুল ফজল মুঘল রাষ্ট্রের গৌরবময় কর্মধারা এবং রাজ্য বিস্তারের তথ্যমূলক বিবরণ লেখার কাজ শুরু করেছিলেন। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি *আকবরনামা* ও *আইন-ই-আকবরি* লিখতে শুরু করেন এবং বেশ কিছু সংযোজন ও সংশোধনের পর ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থদুটি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থের প্রথম দুটি খণ্ড হল *আকবরনামা*, তৃতীয় খণ্ডটি *আইন-ই-আকবরি*। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে আকবরের পূর্ব-পুরুষদের কাহিনি, পিতা হুমায়ুনের কথাও এতে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের রাজত্বের (১৫৫৬-১৬০২) ছেচল্লিশ বছরের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ড *আইন-ই-আকবরি*-তে সাম্রাজ্যের আয়তন, সম্পদ, অবস্থা, শাসন, বিচারব্যবস্থা, জনসংখ্যা, শিল্প, অর্থনীতি, শিক্ষা, পারিবারিক জীবন, উৎপাদিত শস্যাদি, নদ-নদী-খাল ইত্যাদির কথা আছে। হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদির কথাও তিনি তুলে ধরেছেন।

আবুল ফজল হলেন মধ্যযুগের একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি বহুমাত্রিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতির কথা বলেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *রোয়াকত-ই-আবুল ফজল* এবং *ইনসা-ই-আবুল ফজল*। রোয়াকত হল চিঠিপত্রের সংকলন। এতে আবুল ফজল কর্তৃক নানা সময়ে সম্রাট আকবর, বিভিন্ন উচ্চ কর্মচারী, শাহাজাদা, বেগম সাহেব সহ হারেমের নানা জনকে লেখা পত্র সমূহ সংকলিত করা হয়েছে। এই সংকলন থেকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক সমস্যা বিষয়ে আবুল ফজলের মূল্যায়ণের ধারণা পাওয়া যায়। *ইনসা-ই-আবুল ফজল*-এ সংকলিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে পাঠানো বহু গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলীর প্রতিলিপি। আবুল ফজলের ইতিহাসের পাতায়

প্রজাকল্যাণকামী সম্রাট আকবর অমরত্ব লাভ করেছেন। তিনি ইতিহাসচর্চায় যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা তার দ্বারা প্রভাবিত হন।

মুঘল আমলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন আবদুল কাদির বাদাওনি, তিনি বদাওনি নামেই অধিক পরিচিত। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ *মুন্তাখাব-উৎ-তওয়ারিখ*। ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি এর রচনা শুরু করেন এবং ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটির রচনা শেষ করেন। যদিও এই গ্রন্থটি রচনার পূর্বে আকবরের অনুরোধে বদাওনি ফারসিতে মহাভারত অনুবাদের কাজে হাত দেন। তবে এই অনুবাদের কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

সম্রাটের চাকরিতে তাঁর তেমন উন্নতি হয়নি, এজন্য তিনি সম্রাটের প্রতি বিরূপ ছিলেন। আশাহত হয়ে ভগ্নহৃদয়ে তিনি তাঁর ইতিহাস মুন্তাখাব-উৎ-তওয়ারিখ লিখেছিলেন। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত এবং এর আলোচনার পরিধি গজনীর শাসকদের ভারত-আক্রমণ কাল থেকে আকবরের রাজত্বের চল্লিশতম বর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে তিনি মুসলমান শাসনের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে তিনি আকবরের শাসনকালের বর্ণনা রেখেছেন। আবুল ফজল সম্রাটকে নিয়ে যেসব প্রশস্তি করেছেন বদাওনি তার সমালোচনা ও সংশোধন করেছেন। আকবরের শাসনকালে গ্রন্থটির কথা গোপন রাখা হলেও জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে এটি প্রকাশিত হয়।

বাদাওনি বত্রিশ সিংহাসন, মহাভারত ও রামায়ণ ফারসিতে অনুবাদ করেছিলেন সম্রাটের আদেশমত। এছাড়াও উনি কাশ্মীরের ইতিহাসের ফারসি অনুবাদ করেন। কিন্তু যে জন্য বাদাওনি ইতিহাসের পাতায় রয়েছেন সেট হচ্ছে ওঁর *মুন্তাখাব-উৎ-তওয়ারিখ*।

নিজামুদ্দিন আহম্মদ (১৫৪৯-১৫৯৪) মুঘল দরবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও দরবারের নানান বিতর্কের ছোঁয়া তাঁকে স্পর্শ করেনি। প্রথম থেকেই তাঁর বাবার প্রভাবে নিজামুদ্দিন ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। তাঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থ হল *তবাকৎ-ই-আকবরি*। এছাড়া মধ্যভারতের স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে *তারিখ-ই-ইরিচ* নামে একটি গ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন বলে অনেকে দাবি করেন, যদিও এর প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

নিজামুদ্দিন আহম্মদ, আবুল ফজল ও বদায়ুনির মত দরবারি ঐতিহাসিক নন, তবে সেই যুগের ইতিহাস রচনা সব দোষত্রুটি তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। *তবাকৎ-ই-আকবরি* নয়টি এলাকার ইতিহাস — দিল্লী, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, বাংলা, মালব, জৌনপুর, সিন্ধু, কাশ্মীর ও মুলতান। বইটি শুরু হয়েছে ১১৮৬-৮৭ সালে গজনভীদের আক্রমণ থেকে এবং শেষ হয়েছে আকবরের সাম্রাজ্য সীমার বর্ণনায়। আঞ্চলিক ইতিহাসের পটভূমিকায় নিজামুদ্দিন রাজবংশের ইতিহাস লিখেছেন। এই সব অঞ্চলের রাজবংশগুলির ইতিহাস দিয়ে তিনি আকবরের সময় এদের মুঘল সাম্রাজ্যভুক্তির কথা বলেছেন। আকবরের রাজত্বকালের বার্ষিক বর্ণনা রেখেছেন। বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক ইতিহাসকে তিনি বর্ণনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য ঘটনাকে তিনি সেই ভাবে তুলে ধরতে পারেননি। তবে তিনি তাঁর রচনায় ব্যক্তির চেয়ে ঘটনায় বেশি জোর দিয়েন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাফি খানের *মুণ্ডাখাব-উল-লুবাব* মুঘল রাজবংশের ইতিহাসকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এই ফারসি গ্রন্থটি মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্বের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। কাফি খান ঔরঙ্গজেবের সময়ে রাজস্ব বিভাগে কাজ করতেন। তিনি তাঁর গ্রন্থটিতে বাবরের সময় থেকে (১৫১৯) মহম্মদ শাহের রাজত্ব (১৭৩৩) পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তবে বাবর থেকে আকবরের সময় পর্যন্ত ইতিহাসকে তিনি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিচ্ছন্ন ভাবে লিখেছেন।

১.৪ বিদেশি বিবরণ

মুঘল সাম্রাজ্যে প্রচুর সংখ্যায় বিদেশি পর্যটক বণিক ও পাদরিরা এসেছিলেন যাদের লেখার বিস্তারিত বিবরণ থেকে আমরা মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লেখার উপাদান পেয়ে থাকি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে আকবরের শাসনকালে সিজার ফ্রেডারিক ও র‍্যালফ ফিচ, ভারতে আসেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই দু'জনের বর্ণনায় মূলত শহর, বাজার ও বাণিজ্যের ছবি ফুটে উঠেছিল। রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই দুজনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। সম্রাট জাহাঙ্গিরের সঙ্গে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন এবং পর্তুগিজরা কীভাবে ইংরেজদের বাণিজ্য করতে বাধা দিচ্ছে সে কথা বলার পাশাপাশি সমকালীন খ্রিস্টানদের প্রতি অভিজাতদের দৃষ্টিভঙ্গির ছবিও এই পর্যটকদের লেখায় রয়েছে। ঐ একই সময়ে ভারতে এসে পেলসার্ট ভারতবর্ষের বাণিজ্যিকপণ্য উৎপাদন ও সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের বিবরণ তুলে ধরেছেন।

মুঘল সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালে ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ের ভারতে আসেন। ১৬৫৮ থেকে ১৬৬৮ এই দশ বছর তিনি ভারতে ছিলেন। মুঘল অভিজাত সভাসদের চিকিৎসক হিসাবে তিনি ভারতে কাজ শুরু করে পরবর্তীতে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে লাহোর ও কাশ্মীর যান। সম্রাটের সঙ্গী হবার সুবাদে মুঘল সম্রাজ্যের কাঠামো, পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন ঘটনা বার্নিয়ের দেখেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছেন যা ভয়েজেস নামে প্রকাশিত হয়। বার্ণিয়ের ভারতের সঙ্গে ফরাসি দেশের বিভিন্ন বিষয়ের তুলনা করেছেন অত্যন্ত সুন্দর ভাবে। তবে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় শাহজাহানের রাজত্বের শেষ পর্যায়ের গৃহযুদ্ধের বিবরণ এবং দিল্লি ও আগ্রা শহরের অবস্থা।

১.৫ আঞ্চলিক সাহিত্য

মুঘল যুগে আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু উপাদান পাওয়া যায় এর মধ্যে অন্যতম ছিল আঞ্চলিক সাহিত্য। বাংলা, অসমিয়া, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, রাজস্থানি, মারাঠি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় লেখা সাহিত্যগুলি মুঘল ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। আঞ্চলিক সাহিত্য গুলির মধ্যে অন্যতম হল, বাংলায় লেখা বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত*, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখা *চণ্ডীমঙ্গল*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* উল্লেখযোগ্য। *অসমিয়া* ভাষায় বৈষ্ণব ভক্তি কবিতার ধারার সুত্রপাত ঘটান শঙ্করদেব। অহম বুরুঞ্জী বা ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা রচনার ধারারও এই সময় পর্বে আবির্ভাব ঘটে। সংস্কৃতে কাহিনি, উপকথা, আখ্যায়িকা, কিংবদন্তি ইত্যাদির রচনা চলতে থাকে। এর মধ্যে বল্লালসেনের *ভোজপ্রবন্ধ*, নারায়ণের *স্বাহাসুধাকরচম্পু* এবং কল্যান মল্লের *অনঙ্গরঙ্গ* অন্যতম। তামিল সাহিত্যে বড়থুঙ্গু রচিত প্রমত্তরকুন্দম ও অথিবীররামন এর ভেট্রিভেরকই অন্যতম। তেলেগু ভাষায় কৃষ্ণদেব রায়ের অমুক্তমাল্যদা এবং অল্লসানী পেদ্দান্নার মনুচরিত্র অন্যতম।

১.৬ অনুবাদ সমুহ

মুঘল সম্রাট ও বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের পৃষ্টপোষকতায় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে অনুবাদচর্চার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞান সাহিত্যে গ্রেকো-আরবীয় জ্ঞানভাণ্ডার ফারসি থেকে সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত হলে সংস্কৃতে বিজ্ঞান চর্চা সমৃদ্ধ হয়। এই ধরনের অনুবাদ কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নীলকণ্ঠ রচিত জ্যোতিষ বিষয়ক *তাজিক নীলকণ্ঠী* ও বেদাঙ্গ রায়ের *পারশী প্রকাশ*।

ষোড়শ শতকে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ পুরাণ ইত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদিত হয়। ওড়িয়া ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন বলরাম দাস, বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাস ওঝা। মালায়লী ভাষায় অধ্যাত্ম রামায়ণম এবং মহাভারতম রচনা করেন থুনচাথু এলুথাচন। মুক্তেশ্বর মারাঠিতে রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করেন। ওড়িয়া ভাষায় ভাগবৎ পুরাণ অনুবাদ করেন জগন্নাথ দাস।

১.৭ উপসংহার

আমাদের আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত যে, মুঘল যুগের ইতিহাসচর্চায় মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন পরিসরগুলিকেই তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের অনেকেই ছিলেন মুঘল রাজসভার সদস্য। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার রচনা ও অনুবাদ সাহিত্যগুলির সাথে ফারসি সাহিত্য, দরবারি সাহিত্য, বিদেশি বিবরণ ইত্যাদির তুলনামুলক আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মুঘল ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রটি ছিল বেশ প্রশস্ত।

১.৮ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল আমলে দরবারি ইতিহাস চর্চার ধারা আলোচনা করুন।

২. বিদেশিদের বিবরণে মুঘল ইতিহাসের বৈশিষ্টগুলিকে কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে?

৩. মুঘল আমলে আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ পর্যালোচনা করুন।

৪. অনুবাদ সাহিত্যর বৈশিষ্ট কী ছিল?

১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, কলকাতা, ২০১৪

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা, ২০০৯

ইরফান হাবিব, *মধ্যযুগের ভারত একটি সভ্যতার পাঠ*, নয়াদিল্লী, ২০০৯

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত, প্রথম খণ্ড*, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড*, কলকাতা, ১৯৯৩

J. F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

E. H. Carr, *What is History*, London, 2018.

E. Sreedharan, *A Text Book of Historiography*, New Delhi, 2018.

Satish Chandra, *A History of Medieval India*, New Delhi, 2007.

একক : ২ ☐ আঞ্চলিক সাহিত্যের পরম্পরা

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ ভূমিকা

২.২ দরবারি কাব্য ও সাহিত্যের নানা আঙ্গিক

২.৩ মুঘল শাসনে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

২.৪ বাংলাভাষা ও সাহিত্য

২.৫ অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্য

২.৬ উপসংহার

২.৭ প্রশ্নাবলী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- আপনারা আমাদের আলোচ্য সময় পর্বের অর্থাৎ ১৫৫০ থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যের উদ্ভব, বিকাশ ও সাহিত্য পরম্পরার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবেন।
- এই সময়পর্বে রচিত আঞ্চলিক সাহিত্যগুলি ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে যেমন নির্মিত হয়েছে তেমনি জীবনী সাহিত্য, সমন্বয়বাদী সাহিত্য, রোম্যান্টিক সাহিত্য এবং কাব্যেরও অনেক নিদর্শন আছে। এই বিষয়গুলির সম্যক ধারণা আপনারা পাবেন।

২.১ ভূমিকা

ভারত ইতিহাসের ব্যখ্যার গতানুগতিক যে ধারাটি এতদিন চলে এসেছে, পরিবর্তিত যুগ ও জীবনের আলোয় আজ তার কিছুটা অদলবদল হয়েছে। ফলে মধ্যযুগীয় ভারতের মর্জি ও মানুষকে বোঝার জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের পাশাপাশি আঞ্চলিক সাহিত্যগুলি সেই অঞ্চল সম্পর্কে আমাদের সমৃদ্ধ করে। সম্রাট আকবর তাঁর রাজসভাকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দ্বারা অলংকৃত করে মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে এক শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক পীঠস্থানে পরিণত করেন। মুঘল রাজবংশ যে একটি অত্যন্ত উন্নতমানের সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবার, তা তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে উপলব্ধি করা যায়। কারণ, তাঁর পিতামহ বাবর তরবারি ও কলম একই সঙ্গে ধরে এক অনবদ্য আত্মজীবনী লিখেছিলেন, যা আজও বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ভারতবর্ষে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যর উৎকৃষ্টতা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাকে প্রভাবিত করেছিল। সেই কারণে আকবরের আমলে দরবারি সাহিত্যের পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। হিন্দি ভাষাও এই সময় থেকে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।

২.২ দরবারি কাব্য ও সাহিত্যের নানা আঙ্গিক

বাবর, হুমায়ুন, তাঁর ছোটভাই কামরান, আকবর, তাঁর সহকারী বৈরাম খান, জাহাঙ্গির প্রমুখ মুঘল বাদশাহরা ও বাদশাহদের পুত্ররা কবিতা লিখতেন। তাছাড়া নুরজাহান, মমতাজ বেগম, জেবউন্নিসা বেগম কিংবা আমির খসরু, ফৈজি প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত কবি। বাদশাহি কবিতাগুলিতে সামন্তযুগীয় স্বৈরশাসকদের মানসিকতা, তাঁদের বৈভব ও ক্ষমতার দম্ভ, সুরা ও মিথুনাসক্তির আতিশয্য, কিংবা বৈরনিপাতের ও আত্মমহিমা বিঘোষণের বাগাড়ম্বরই শুধু প্রতিফলিত হয়নি। জাগতিক নশ্বরতার উপলব্ধি, সত্যের জন্য সন্ধিৎসা, অমৃতত্ব অর্জনের তৃষ্ণা এবং পাওয়ার ক্লান্তি ও না পাওয়ার ব্যাথাও ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। সভাসদ ও আমির উমরাহদের কবিতায় শুধু প্রভুপরিতোষক চাটুবাক্যই উচ্চারিত হয়নি, হয়েছে নিগূঢ় তত্ত্বকথা, নির্মুক্ত সত্যভাষণও। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সংস্কৃতের পাশাপাশি ফারসি ভাষার সাহিত্যও বৈচিত্রে এবং শিল্পগুণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেছিল। সম্রাট আকবরের সময়ে তুলসীদাস সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দি কবি ছিলেন; রাজা বীরবল হিন্দি কবিরায় ছিলেন। আব্দুর রহিম খাঁন্‌খানা, (১৫৫৬-১৬২৭), সংস্কৃত, হিন্দি, ফরাসি, আরবি, তুরকি এই পাঁচটি ভাষাতে সমান পণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী ও ভক্ত তুলসীদাসের ও আচার্য্য বিটঠ্‌লের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন রহিম। তাঁর রচিত সংস্কৃত কবিতাও আছে। আকবরের দরবারে ভারতীয় ও ইরানি-তুরানী গান হয়। সেখানে কাশ্মীরী পুরুষ ও নারী গুণীও ছিলেন। তবে বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যও যে এ বিষয়ে পিছিয়ে ছিল না সে নজিরও আছে।

২.৩ মুঘল শাসনে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

মুঘল বাদশাহদের আমলেই কাব্য সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। ভাষা ও সাহিত্যের জগতেও এ যুগে সামাজিক ক্ষেত্রের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিফলিত হয়েছে। তানসেন ছিলেন হিন্দু, পরে হন মুসলমান। আকবরের সভা তাঁর গানে ভরপুর ছিল। ১৬০৩ সালের কাছাকাছি সময়ে আহমদ একজন হিন্দি কবি ছিলেন। তাঁর দোহায় ভক্তরা ব্যাকুল ছিল। প্রায় একই সময়ে কাদের বক্‌স কিছু মধুর কবিতা রচনা করেন। গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের সুলতানেরা উর্দু ভাষার প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। বাংলার বৈষ্ণব কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুসলমান শাসকেরা। ফলে রাজদরবার থেকে অনেক দূরে সে যুগের বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রতিভার কথা আমরা জানতে পারি। যেমন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাংলায় *চৈতন্যচরিতামৃত* রচনা করেন এবং আগ্রার দৃষ্টিহীন কবি সুরদাস রাধাকৃষ্ণের বিষয়ে আবেগমথিত কবিতা রচনা করে গেছেন হিন্দিতে। অবশ্য এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন *রামচরিতমানসের* রচয়িতা তুলসীদাস। মারাঠি ভাষায় সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে তুকারাম ও রামদাস অগ্রগণ্য ছিলেন। হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদের পাশাপাশি মুসলমান কবিদের রচনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে অন্যতম হল মিঞা সাধনের ভোজপুরী কাব্য *মৈনাসৎ*, মালিক মহম্মদ জয়সীর *পদ্মাবতী কাব্য*, দৌলত কাজীর *সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী*, আলাওলের *পদ্মাবতী* ইত্যাদি।

২.৪ মুঘল আমলে বাংলাভাষা ও সাহিত্য

বাংলায় ইসলামের আগমনের সময়থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিম শাসক ও মুসলিম লেখকদের ঐকান্তিক সাধনা দেখা যায়। তবে বাংলায় মুঘল আমলের সাংস্কৃতিক-রূপ নানা কারণে প্রাক্-মুঘল যুগের সাংস্কৃতিক-রূপ থেকে বহুলাংশে ভিন্ন ছিল। মুঘল-আমলেই বাংলাদেশে ফারসি-ভাষার চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ষোড়শ, সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডী*, দ্বিজ বংশীদাস-এর *মনসা-মঙ্গল*, বৈষ্ণব পদাবলীসমূহ, বিভিন্ন

কুলিজ গ্রন্থসমূহ ইত্যাদি থেকে আমরা সমকালীন বাঙালি সমাজের একটা সঠিক চিত্র পাই। এই সময় পর্বে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি লোকায়ত জীবনের পাঁচালি। আর লোকায়ত জীবন যেহেতু অর্থনীতি নির্ভর সেহেতু মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট জীবন্তভাবে চিত্রিত। অর্থাৎ মুঘল আমলের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বাঙালি সংস্কৃতিকেই শুধু সমৃদ্ধ করেনি, সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে স্পষ্ট করেছে।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাভাষায় লেখা বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে ছিল ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে ঈশাননাগরের লেখা *অদ্বৈতপ্রকাশ*, ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ৪০ বৎসর পর বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* ও *নিত্যানন্দবংশমালা* এবং লোচন দাসের *চৈতন্যমঙ্গল* ও *দুল্লভসার* অন্যতম। এই সময় পর্বে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ছিল, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা ময়মনসিংহ জেলার দ্বিজ বংশীদাস-এর *মনসা-মঙ্গল*, মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত বলরাম কবিকঙ্কনের *চণ্ডী*, মাধবাচার্যের চণ্ডী রচিত হয় ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডী* কাব্য রচিত হয় ১৫৮৮-৮৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। এ ছাড়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু, মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকদের রচিত অসংখ্য পুঁথি, পাঁচালি, লোকগাথা, ইত্যাদিতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চার নজির মেলে।

২.৫ অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্য

বাংলা দেশের প্রত্যন্ত-ভূমিতে যে সকল স্বাধীন রাজ্য ছিল, তাদের মধ্যে কাম্‌তা বা কোচবিহার উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে কামরূপ অঞ্চলে বাংলা ভাষায় কাব্য রচিত হত। ঐ কাব্যগুলি এখন 'অসমিয়া সাহিত্য' বলে পরিচিত। কোচরাজ নারায়ণের রাজত্বকালে তাঁর ভাই শুক্লধ্বজের (চিলা রায়) আগ্রহে ও প্রেরণায় অনিরুদ্ধ নামক কবি এবং শঙ্করদেব ধর্মপ্রচার ও সাহিত্য রচনা করেন। ত্রিপুরার রাজকাহিনি কেবল বাংলাতে নয়, সংস্কৃতেও রাজারা রচনা করান। সংস্কৃত ভাষায় লেখা রাজরত্নাকর ত্রিপুরা রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস। বিভিন্ন সভাকবিদের দিয়ে প্রায় পাঁচশো বছরের ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস রাজমালা রচিত হয়েছিল বাংলায়। এই রচনার দ্বিতীয় লহরের রচনা কাল আমাদের আলোচ্য সময় পর্বের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতে বিশেষ করে আকবরের রাজত্বের শেষদিকে প্রাজ্য ভট্ট এবং শুক কাশ্মীরী ভাষাতে রচনা করেন *রাজবলিপতাকা*। *বুল্লে শাহ ছিলেন কাশ্মীরী ভাষার একজন অন্যতম লেখক। সিন্ধুদেশে সিন্ধী ভাষায় সুফিসাহিত্যে শাহ* করীম এবং শাহ ইনায়েতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবধী ভাষায় লেখা মালিক মহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য ১৫২০-১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হলেও এর অনুকরণে পরবর্তীতে বিভিন্ন সাহিত্য রচিত হয়। হিন্দিতে লেখা আমেদাবাদের সাধক কবি দাদুর রচনা ছিল অন্যতম। আফগানদের ব্যবহৃত পশতু ভাষার প্রথম গ্রন্থ বায়াজিদ রওশনীয়া লিখিত খয়রুল বয়াঁ। তাছাড়া পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, ভোজপুরি, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষাতে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল।

২.৬ উপসংহার

মুঘল সাম্রাজ্যের সমকালে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ভাষাগুলির সাহিত্যের ভাষায় বিবর্তনের ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নতুন পরম্পরার ভূমিকা হয়। এর থেকেই কেউ কেউ এই যুগে জাতিগুলির উত্থানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলে মনে করেন। মুঘল আমলে রচিত দরবারি ও আঞ্চলিক সাহিত্যগুলি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি শাসকের উদারতা, সহিষ্ণুতা, সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রেরণার কারণ হয়ে উঠেছিল। তবে ধর্মীয় সাহিত্য যে এই আঞ্চলিক সাহিত্যে সিংহভাগ দখল করেছিল সেটা খুবই স্পষ্ট।

২.৭ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল আমলে দরবারি কাব্য ও সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়বস্তু কী ছিল ?

২. মুঘল শাসনে আঞ্চলিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশের বিবরণ দিন।

৩. বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখুন।

৪. বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক সাহিত্যের বিবরণ দিন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম-শাসন*, ঢাকা, ১৯৮৮।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রাজসভার কবি ও কাব্য*, কলকাতা, ১৯৮৬।

দেবেশ কুমার আচার্য্য, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি ও মধ্য যুগ)*, কলকাতা, ২০০৩।

দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯২৬।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, *ভারতজিজ্ঞাসা*, কলিকাতা, ২০১০।

H. R. Ghosal, *An Outline History of the Indian People*, New Delhi, 1962.

S. K. Chatterjee (ed.), *The Cultural Heritage of India*, Vol. 5 (Language and Literature), Calcutta, 1978.

একক : ৩ □ আধুনিক ব্যাখ্যাসমূহ

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ ভূমিকা

৩.২ আধুনিক ব্যাখ্যাসমূহের বিভিন্ন ঘরানা

৩.৩ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা

৩.৪ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাসমূহ

৩.৫ উপসংহার

৩.৬ প্রশ্নাবলী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন —

- কী ভাবে মুঘল ইতিহাস চর্চার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণার নতুন মাত্রা যুক্ত হল।
- রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্পর্কে সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন।
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিশীলতার পরম্পরা কেমন ছিল।
- শাসক হিসাবে আকবরের সাম্প্রতিক মূল্যায়ন।

৩.১ ভূমিকা

মুঘল ইতিহাস চর্চায় ব্যতিক্রমী ধারার সূত্রপাত করেছিলেন উলিয়াম আর্ভিন; কিন্তু তার প্রয়াণে সে বিষয়টি পূর্ণতা পায়নি। পরবর্তীতে আর্ভিনের এই অসমাপ্ত কাজকে বাস্তব রূপ দেন যদুনাথ সরকার। আর্ভিন প্রধানত ফারসি উপাদানের উপর নির্ভর করেছিলেন কিন্তু যদুনাথ সেখানে মারাঠি ও অন্যান্য দেশি-বিদেশি ভাষার তথ্যাদিরও সদ্ব্যবহার করেন। যদুনাথ মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের ভিত রচনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কের সঙ্গে এই দিক দিয়ে তাঁর তুলনা করা হয়ে থাকে। দু'জনেই চেয়েছিলেন অতীতকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে; তথ্য সন্ধানে দু'জনেরই ছিল অপরিসীম আগ্রহ। কিন্তু যদুনাথের কাজ বস্তুত ছিল আরও দুরুহ। তথ্যের সন্ধানে র‍্যাঙ্কেকে ইউরোপের সর্বত্র খোঁজ চালাতে হয়েছিল। কিন্তু যদুনাথের অন্বেষণ আয়তনে ঢের বিশাল এক ভূখণ্ড জুড়েই কেবল বিস্তৃত হয়নি, স্বদেশ ছাড়িয়ে সমুদ্রপারের দেশগুলিতেও হানা দিয়েছিল। লন্ডন, প্যারিস ও লিসবনের মহাফেজখানার সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ রচনা করতে হয়েছিল। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে মুঘল ইতিহাস রচনার আধুনিক ব্যাখ্যাকারদের তথ্য নির্বাচনের ব্যাপ্তি মুঘল ইতিহাসের অনেক নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে।

৩.২ আধুনিক ব্যাখ্যাসমূহের বিভিন্ন ঘরানা

অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে লিখতে শুরু করেন। এই ধারাটির প্রথম পর্ব চলেছিল উনিশ শতকের শেষ অবধি। প্রথম দিককার ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ইউরোপের উন্নত আঙ্গিক, পদ্ধতি ও দর্শন মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চায় প্রয়োগ করেছেন। এরা পশ্চিমের রাজনৈতিক কাঠামো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক জগৎকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। এদের সঙ্গে তুলনায় ভারতের মধ্যযুগের প্রতিষ্ঠানসমূহ অবশ্যই নিম্নমানের ছিল। তবে প্রথম দিককার ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ডাও, ডাফ, এরস্কাইন ও এলফিনস্টোন মধ্যযুগ সম্পর্কে উদার, সহনশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। প্রথম দিককার ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা শুধু যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসই লেখেননি, প্রশাসনিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসও লিখেছেন। হিন্দু ধর্মের ওপর ইসলামের প্রভাবের কথা উল্লেখ ক'রে এঁরা মধ্যযুগের ইতিহাসের আকর সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির আমদানি করেছেন। ফারসিতে লেখা মধ্যযুগের ইতিহাস ও বিদেশিদের বিবরণীর সঙ্গে তাঁরা সরকারি আদেশনামা, সাহিত্যিক উপাদান, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ইত্যাদি মিলিয়ে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

মধ্যযুগের ভারতকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস রচনার প্রথম পর্ব শেষ হয় এলফিনস্টোনের সঙ্গে। ইলিয়ট হলেন দ্বিতীয় পর্বের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ও ডাওসন মনে করেন যে মধ্যযুগের ঐতিহাসিকরা সামান্য তথ্যই রেখে গেছেন। তাঁরা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে মধ্যযুগের ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাচ্ছিল্যও দেখিয়েছেন। তা ছাড়া এই দ্বিতীয় পর্বের বেশিরভাগ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ছিলেন প্রশাসক। তারা শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন, ফলে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু বিষয় আজানা থেকে গেছে। শেষপর্বের ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা মূলত দুটি উপাদানের উপর নির্ভর করে মুঘল ভারতের ইতিহাস লিখেছেন — ফারসি উপাদান এবং ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণী।

ভারতীয় ঐতিহাসিকরা উনিশ শতকের শেষদিক থেকে ইউরোপীয় ইতিহাসের পদ্ধতি অনুসরণ করে মুঘল যুগের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন। এদের ওপর ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও তাঁদের রচনার পদ্ধতির প্রভাব পড়েছিল। স্যার লুই নেমিয়ার, মার্ক ব্লখ ও জর্জ লেফেভরের প্রভাবে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা নূতন মাত্রা পেয়েছে। *The Cambridge Economic History of India*-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি মুঘল অর্থনীতির বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য সামনে আসে। ফলে তৈরি হয় মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার একটি নূতন ঘরানা। সতীশ চন্দ্র, আতহার আলি, নুরুল হাসান, ইকতিদার আলাম খান, তপন রায়চৌধুরী, কে. এন. চৌধুরী, অশীণ দাসগুপ্ত, নোনাম আহম্মদ সিদ্দিকি, মুজাফফর আলম, ইরফান হাবিব, অনিরুদ্ধ রায় প্রমুখের হাত ধরে মুঘল ইতিহাসচর্চায় একটি নতুন গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়, পার্থক্য আছে। তবে সকলে মুঘল যুগের নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আগ্রহ দেখিয়েছেন, এখানে তাঁদের মিল আছে।

৩.৩ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা

সর্বক্ষণের গবেষক ও ঐতিহাসিক হয়ে ওঠার আগে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথ —এর লেখা আকবরের জীবনীমূলক গ্রন্থ *Akbar the Great Mogul*, ১৫৪২-১৬০৫ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। এর এক দশক আগে ১৯০৯ সালে রিচার্ড ভন গ্রাবে-র *Akbar– Emperor of India– A Picture of Life and Customs from the Sixteenth Century* প্রকাশিত হয়েছিল। এদের গবেষণাতে মুঘল রাষ্ট্র ও প্রশাসনের বেশ

কিছু বিষয় উল্লেখিত হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক প্রতিফলন হয়নি। মুঘলদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস রচনারক্ষেত্রে ইংরেজ প্রশাসক W.H. Moreland-এর নাম উল্লেখযোগ্য। মুঘল ইতিহাস রচনার জন্য তিনি মূলত ফারসির পাশাপাশি ডাচ ও পর্তুগিজ সূত্র ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম *Agrarian System of Muslim India– From Akbar to Aurangzeb* ও *India at the death of Akbar*। মোরল্যান্ড বলেন রাষ্ট্র মুঘল যুগে এক-তৃতীয়াংশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ রাজস্ব হিসাবে নিত, আর শাসন হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জেমস মিল, জন ক্রফার্দ ও মোরল্যান্ড মুঘল রাষ্ট্রকে স্বৈরাচারী বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৫ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয় আব্দুল আজিজ এর *The Mansabdari System and the Mughal Army*। উল্লেখিত গবেষকের মুঘল প্রশাসন সংক্রান্ত বিশেষ করে মনসবদারি প্রথা কেন্দ্রিক বক্তব্যকে পরবর্তীকালে নুরুল হাসান, ইরফান হাবিব, মুজাফফর আলম ও অনিরুদ্ধ রায় নূতন তথ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে মুঘল প্রশাসন সংক্রান্ত ইতিপূর্বের অনেক ধারণায় বদল এসেছে।

ই. বি. হ্যাভেল মনে করেন তিন হাজার বছরের ভারতীয় রাজনৈতিক ঐতিহ্যের পরিণতি হল মুঘল সাম্রাজ্য। অনেকে মনে করেন আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার এটি আদিরূপ। রাশব্রুক উইলিয়ামস ও আর. পি. ত্রিপাঠীর মতো ঐতিহাসিকরা মনে করেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সম্রাট ও আভিজাতদের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি হল তুর্ক-মোঙ্গল ঐতিহ্য। মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থার এক বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীভূত শাসন, স্বৈরাচারী, আধাদৈবানুগৃহীত, সম্রাটের সঙ্গে শাসকশ্রেণি অভিজাততন্ত্রের সম্পর্ক নির্দিষ্ট বিধি-নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আতহার আলির মতে, একে সাধারণভাবে সাংবিধানিক আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনে পূর্বসূরিদের অবদান ছিল আবার মুঘল সম্রাটরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমদানি করেন। সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকরা মুঘল রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। অধ্যাপক আর. পি. ত্রিপাঠী মনে করেন মুসলিম সার্বভৌম তত্ত্বে শাসক পুরোপুরি স্বৈরাচারী হতে পারেন না। ইবন হাসানের মতে ভৌগোলিক পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা মুঘল রাষ্ট্রের সামরিক প্রকৃতি ও রাজতন্ত্রের চরিত্র নির্ধারণ করেছিল। রাজতন্ত্র কখনো পুরোপুরি স্বৈরাচারী হতে পারেনি। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মুঘল রাষ্ট্রের প্রকৃতি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা পশ্চিমের একদল ঐতিহাসিক গ্রহণ করেননি। এদের মধ্যে আছেন Burton Stein, C. A. Baily, Andre Wink, Frank Perlin প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ। এঁদের বক্তব্য হল সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে মুঘল যুগে কেন্দ্রীভূত শৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তবে পশ্চিমী ইতিহাসবিদদের এই বক্তব্যকে আর. চম্পকলক্ষ্মী, ডি. এন. ঝা, ইরফান হাবিব এবং মুজাফ্ফর আলম খণ্ডন করেছেন।

৩.৪ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাসমূহ

অনেক ঐতিহাসিকের মতে মুঘল-ভারতের কুটিরশিল্পের উৎপাদন পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের তুলনায় সবথেকে বেশি ছিল যার বিনিময়ে অঢেল বিদেশি মুদ্রা ভারতে আসত। ভারতে জিনিসপত্রের মূল্যমান সম্পর্কে বিতর্ক আছে। মোরল্যান্ড বলেছেন যে, ষোড়শ শতক পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি। এ ছাড়াও তিনি বলেছেন যে অত্যধিক রুপো বাংলায় আসার ফলে বাংলায় মুদ্রাস্ফীতি হয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল। অনিরুদ্ধ রায় মোরল্যান্ডের এই দুটি বক্তব্যকেই অস্বীকার করেছেন। তা ছাড়া শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি উৎপাদনকে প্রভাবিত করত। ফলে সমাজের মধ্যে বণিকদের অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ভাল। যদিও মোরল্যান্ড বলেছেন যে মুঘল ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল না। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ইকতিদার আলাম খান এই বক্তব্য অস্বীকার করে বলেছেন বণিকদের একটা বড় অংশকে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ফেলা যায়। এর প্রমাণ হিসাবে তিনি বলেছেন ষোড়শ শতকে হিন্দু বণিকরা বিলাসবহুল জীবনযাপন

করতেন। অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মর্যাদার প্রতীক ছিল অসংখ্য দাস-দাসী ও ভৃত্যকুল। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে সুলতানি যুগের শেষদিক থেকে গ্রামে ও শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হচ্ছে। এদের অবস্থা ছিল সচ্ছল।

মোরল্যান্ড বলেছেন যে সাধারণ মেয়েরা শাড়ির সঙ্গে কোন জামা ব্যবহার করত না, কারণ তারা ছিল খুব গরিব। সতীশ চন্দ্র বলেছেন যে সাধারণত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে মেয়েদের জামা পরার রেওয়াজ ছিল। অনেক জায়গাতেই পরম্পরা অনুযায়ী কাপড় পরা হত। বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি প্রসঙ্গে মোরল্যান্ড বলেছেন যে, বাংলায় গরীবশ্রেণি পাটের কাপড় পরত তা ছাড়া তিনি উৎপাদনের একটা হিসাবও দিয়েছেন; কিন্তু অনিরুদ্ধ রায়ের মতে মোরল্যান্ডের বর্ণিত বস্ত্র পাটের কাপড় নয়, এটি হল পট্টবস্ত্র বা বুনো রেশমের কাপড়। আর উৎপাদনের তথ্য মেনে নেওয়া শক্ত কারণ এ বিষয়ে তথ্য বিরল। ইরফান হাবিবের মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, বর্ণ ও জাতি প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণার ফলে অনেক নতুন তথ্য যেমন সামনে এসেছে তেমনি পূর্বের অনেক ধারণা পাল্টে গেছে।

মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য আকবর একটি ধর্মীয় নীতি নির্ধারণ করেছিলেন বলে যে দাবি করা হয় তাকে খণ্ডন করে এম. আতহার আলি আকবরের ধর্মীয় দর্শন, বিশ্বাস বা ভাবনা/ধারণার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে অধ্যাপক হরব্নশ মুখিয়া সাম্প্রতিক কালে একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ লিখেছেন। আকবরের এই ধর্মীয় দর্শন সমকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার ফলে মুঘল আমলে সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। তাছাড়া মুঘল পৃষ্টপোষকদের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল শিল্প সম্পর্কে তাঁদের উদার মনোভাব। প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন রুচিবান বিদগ্ধ পুরুষ। এঁদের মধ্যে আকবর নিজেই শিল্পশিক্ষা করেছিলেন, আব্দুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলির কাছ থেকে। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ *দরবারি শিল্পের স্বরূপঃ মুঘল চিত্রকলা*, এবং সোমপ্রকাশ বর্মার প্রবন্ধ, 'উইন্ডসর রয়াল লাইব্রেরীতে লোকচক্ষুর অন্তরালে মুঘল মিনিয়েচার' থেকে আমরা মুঘল চিত্রকলার অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছি। ফলে একথা বলা যায় যে মুঘল ইতিহাস সম্পর্কে সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা সমূহ থেকে আমরা ইতিপূর্বের অনেক ধারণার পুনর্নির্মাণ করতে পেরেছি।

৩.৫ উপসংহার

তথ্য ছাড়া ইতিহাসচর্চা হয় না। আবার এই তথ্যের যথাযথ ব্যবহাররের অভাবে ঐতিহাসিকের প্রদত্ত বক্তব্য পরবর্তীতে পরিবর্তিত বা ভুল প্রতিপন্ন হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকেরা নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান করে ইতিপূর্বের গবেষণাকে যেমন ভ্রান্ত প্রমাণ করেন, তেমনি নতুন ইতিহাস রচনা বা নতুন যুক্তি ও মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটান। আর এ ভাবেই ইতিহাস রচনায় যুক্তি, তর্ক, বিতর্ক ও প্রতর্কের সূচনা হয়।

৩.৬ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল ইতিহাস রচনায় সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?

২. মুঘল প্রশাসন সম্পর্কে মোরল্যান্ড ও আব্দুল আজিজের মতামত ব্যাখ্যা করুন।

৩. মুঘল ইতিহাস চর্চার আধুনিক ব্যাখ্যার বিভিন্ন ঘরানা গুলি কী কী?

৪. চিত্রশিল্প সম্পর্কে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাগুলি উল্লেখ করুন।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ১২০০-১৭৫৭*, কলকাতা, ২০০৮

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মুঘল সাম্রাজ্য থেকে ব্রিটিশ রাজ*, কলকাতা, ২০১৩

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরূপঃ মুঘল চিত্রকলা*, কলকাতা, ১৯৯৯

গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, কলকাতা, ১৯৮৩

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707*, New Delhi, 1999.

Ira Mukhoty, *Akbar- The Great Mughal,* New Delhi, 2020.

পর্যায় : ২ ▫ মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা

একক : ৪ ▫ বাবরের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ

গঠন

৪.০ **উদ্দেশ্য**

৪.১ **ভূমিকা**

৪.২ **মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক-পর্বের ভারতবর্ষ**

৪.২.৩ **রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি**

৪.২.৪ **বাবরের ভারত আক্রমণ ও পানিপথের প্রথম যুদ্ধ**

৪.৩ **মুঘল –- আফগান দ্বন্দ্ব**

৪.৪ **বাবরের সাফল্যের কারণ**

৪.৫ **মুঘল শাসনের সূচনায় ভারতবর্ষ**

৪.৬ **উপসংহার**

৪.৭ **প্রশ্নাবলী**

৪.৮ **গ্রন্থপঞ্জি**

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল

- বাবরের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের পাশাপাশি ভারতে মুঘলদের আগমনের পরিণতি সম্পর্কে সার্বিক ধারণা লাভ করা।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধে আফগানদের পরাজয় ও বাবরের নেতৃত্বে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার এবং সাম্রাজ্যের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।
- মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় বাবরের সাফল্য ও সাম্রাজ্য বিজেতা হিসাবে তাঁর মূল্যায়ন।

৪.১ ভূমিকা

জহির-উদ-দীন মোহাম্মদ বাবর ভারতবর্ষে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পিতার দিক থেকে তুর্কি এবং মাতার দিক থেকে মুঘল ছিলেন। বাবর একটি তুর্কি শব্দ যার অর্থ সিংহ। ১৫২৬ ও ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে যাথাক্রমে পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধ জয়লাভ করে বাবর ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। যদিও ভারতবর্ষে এই সাম্রাজ্য স্থাপনের বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বাবর ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। বাবরের ভারত আক্রমণের সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। লোদীর হঠকারিতা ও অদূরদর্শিতার ফলে

আফগান আমলারা তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা করে। সাম্রাজ্যের এই অন্তর্বিবাদের সুযোগে রাজপুতরা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহ এত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন যে, তিনি দিল্লী অধিকার করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। শুধু তাই নয়, ইব্রাহিম লোদীকে ধ্বংস করার জন্য তিনি বাবরকে দিল্লী আক্রমণ করতে আহ্বান করেন। তাছাড়া সেই সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই ঘটনাগুলি থেকে সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে এবং বাবরের আক্রমণ ও জয়লাভের বিষয়ে আমাদের ধারণাকে স্পষ্ট করে।

৪.২ মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক-পর্বের ভারতবর্ষ

আমারা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে, পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বাবরের এ সাফল্য আলোচনার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন ভারতবর্ষের মতো একটি বৃহৎ দেশের শাসক হওয়া সত্ত্বেও ইব্রাহিম লোদী কেন পরাজিত হলেন। শুধু তাই নয় সামরিক শক্তির দিক থেকেও লোদী বাহিনী বাবরের তুলনায় এগিয়ে ছিল। সেই কারণেই আমরা পানিপথের যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করব।

৪.২.৩ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি

সিকান্দর লোদীর (১৪৮৯-১৫১৭) অধীনে লোদী রাজ্য সিন্ধু নদী থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর আমলেই রাজধানী দিল্লী থেকে আগ্রায় স্থানান্তরিত করা হয়। সকল বিদ্রোহী আফগান অভিজাতরা সিকান্দারের নেতৃত্ব মানতে বাধ্য হন। সিকান্দার-এর পুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে বসলে আফগান স্বাতন্ত্র্যবোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। রাজ্যের প্রভাবশালী আফগান নেতাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ করতে ইব্রাহিম তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার নীতি নেন। জৌনপুরের শাসনকর্তা জালাল খান, সেনাপতি আজম শেরওয়ানি ও আরও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী একে একে নিহত হলে আফগান সর্দাররা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়। বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান এদের নেতৃত্ব দেন। বিহারের জায়গিরদার শেরখান শূর (পরে ইনিই শেরশাহ নামে বিখ্যাত হন) এবং পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেয়।

মধ্য ভারতে ঐ সময় তিনটি বড় রাজ্য ছিল — গুজরাট, মালব ও মেবার। মালবের সুলতান মহম্মদ দ্বিতীয় খলজীর অবস্থা তুলনায় দুর্বল। গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর এবং মেবারের সিসোদিয়া বংশের রাণা সঙ্গ (সংগ্রাম সিংহ) উভয়েই মালব দখল করার চেষ্টা করছিলেন। উত্তর ভারত থেকে গুজরাটের বন্দরে পণ্য চলাচল হত মালবের ওপর দিয়ে। কৃষির দিক থেকেও মালব ছিল বেশ উন্নত। তাছাড়া লোদী সাম্রাজ্য এবং গুজরাট ও মেবারের মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (buffer state) মালব সামরিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মালবের প্রধান মন্ত্রী মেদিনীরাই অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও লোদী সাম্রাজ্য, গুজরাট ও মেবার-এর চাপ থেকে রাজ্য সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন, রাণা সঙ্গ রণখম্ভোর ও চান্দেরী জয় করে গুজরাট, মালব উত্তর ভারত তিন দিকেই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য দুটি উত্তর ভারতের রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখত। (বাবরের আত্মচরিত *বাবরনামা* গ্রন্থে ষোড়শ শতকের গোড়ায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সুন্দর বিবরণ আছে।) ওপরের বিবরণ বাবরের আত্মচরিত *বাবরনামা* গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু বাবর লিখেছেন ভারতের রাজ্যগুলি ধর্মের

ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হিন্দুরা রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে দিল্লির সাম্রাজ্য দখল করে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করার চেষ্টায় ছিল। বাবরের এ ধারণা ভুল। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ এই ক্ষেত্রে ছিল না, কারণ বিবাদমান পক্ষগুলিতে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। এই শত্রুতার চরিত্র ছিল রাজনৈতিক, - ধর্মীয় নয়। মুসলমান হাসান মেওয়াটি বাবরের বিরুদ্ধে রাণা সঙ্গকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। অতএব ধর্মের ভিত্তিতে ভারতে রাজনৈতিক বিভাজনের ধারণাটা ভুল।

কাবুল থেকে বাবর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। তিনি উজবেগদের হাতে পরাজিত হয়ে মধ্য-এশিয়ায় পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের আসা তখনকার মত ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনুর্বর আফগানিস্তান নিয়েও তার ক্ষুধা মেটেনি। ভারতের বিপুল ঐশ্বর্যের দিকেই তাঁর নজর। তাছাড়া বাবর মনে করতেন তৈমুরলঙের উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতের ওপর তাঁর অধিকার আছে। বাবরের সামনে সুযোগ উপস্থিত হল যখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান এবং ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান বাবরকে ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। সম্ভবত রাণা সঙ্গও বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

৪.২.৪ বাবরের ভারত আক্রমণ ও পানিপথের প্রথম যুদ্ধ

পানিপথের বিখ্যাত যুদ্ধের আগে বাবর চারবার ভারত আক্রমণ করেন। প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারতে প্রবেশপথ ভীরা (১৫১৯-২০), পরে শিয়ালকোট (১৫২০) এবং লাহোর (১৫২৪) অধিকার করেন। এরপর কুরুক্ষেত্রের কাছে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ শুরু হয় (১৫২৬ খ্রিঃ)। এ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পক্ষে ছিল এক লক্ষ সৈন্য এবং সহস্রাধিক হস্তী। অন্যদিকে বাবর এনেছিলেন বারো হাজার অশ্বারোহী এবং একটি গোলন্দাজ বাহিনী। 'রুমি' প্রথায় বাবর যুদ্ধ করেন। এই প্রথায় সামানা-সামনি যুদ্ধ না করে মুঘল সৈন্য দুই পাশ দিয়ে আফগানদের আক্রমণ করে এবং দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে আফগানদের ঘিরে ফেলে। পরে গোলন্দাজ বাহিনী সামনে থেকে আক্রমণ করে। জানা যায় যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে প্রায় কুড়ি হাজার আফগান সৈন্য প্রাণ হারায় এবং স্বয়ং লোদী মারা যান। যুদ্ধের পর মুঘল সৈন্যরা দিল্লী এবং লোদীদের রাজধানী আগ্রায় সঞ্চিত অগাধ ধনরত্ন লুট করে। লুটের পরিমাণ এতই বিপুল ছিল যে বাবর তাঁর সৈন্য ও অনুচরদের পুরস্কৃত করেও বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন কাবুলে নিয়ে যান এবং মুসলমান দুনিয়ার প্রভাবশালী সুলতানদের উপঢৌকন পাঠান।

৪.৩ মুঘল — আফগান দ্বন্দ্ব

বাবর দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হলেও ভারতবর্ষের, এমনকি উত্তর ভারতের বিরাট অংশ তখনও তাঁর কবলের বাইরে থাকে। সারা দেশে আফগান আমীর এবং জায়গিরদাররা নিজেদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে এবং এই আফগানদের পরাস্ত না করা পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন নিষ্কন্টক নয়, বাবর সেটা বুঝতে পারেন। কেন না রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে রাজপুতরা ভারতে স্থায়ী মুঘল রাজত্বের ঘোর বিরোধী ছিল এবং পূর্ব ভারতে আফগানরা পানিপথের পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বাবরের পরবর্তী পদক্ষেপ হল মেবারের রাণা সঙ্গকে পরাজিত করা।

রাণাসঙ্গ মালবের মেদিনীরাই, হাসান খাঁ মেওয়াটি এবং বহু বিক্ষুব্ধ আফগান সর্দারদের সহায়তা পান। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ার প্রান্তরে মুঘল সৈন্য রাজপুত-আফগান মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হয়। *বাবরনামা* এবং মুঘল যুগের দুই ঐতিহাসিক ফিরিস্তা ও বদাউনির লেখায় খানুয়ার যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজপুতদের বীরত্বের কাহিনি জেনে এবং তাদের বিপুল সৈন্যবাহিনী দেখে মুঘল সৈন্য ভীত হয়ে পড়ে। বাবর তখন তাদের উন্মাদনাময় বক্তৃতা দিয়ে

উদ্বুদ্ধ করেন। নাটকীয়ভাবে পান-পাত্র ভেঙে ফেলে আর জীবনে মদ স্পর্শ করবেন না শপথ নেন। সৈন্যদেরও তিনি কোরান ছুঁইয়ে আপ্রাণ যুদ্ধ করার শপথ নেওয়ান। মুঘলরা এখানেও 'রুমি' প্রথায় যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত রাজপুতরা পরাজিত হয়। রাণা সঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যান কিন্তু হাসান খাঁ মেওয়াটি প্রাণ দেন। এরপর বাবর চান্দেরীর যুদ্ধে মেদিনীরাইকে পরাজিত করেন। এইভাবে রাজপুত প্রতিরোধ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।

বিহারে সিকান্দার লোদীর পুত্র, ইব্রাহিম লোদীর ভাই মহম্মদ লোদীর নেতৃত্বে আফগানরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল। বঙ্গের শাসনকর্তা নসরৎ খাঁ এদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। পাটনার উত্তরে গঙ্গা-ঘর্ঘরার মিলন স্থান ঘর্ঘরা বা ঘাগরায় ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘল বাহিনী আফগানদের সম্মুখীন হয়। এখানেও বাবরের কাছে আফগানরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। এইভাবে পানিপথ, খানুয়া, চান্দেরী এবং ঘাগরায় যুদ্ধে মুঘল-বিরোধীদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি তখনও সুদৃঢ় হয়নি। ঐ কাজে হাত দেওয়ার আগেই বাবরের মৃত্যু হয় (১৫৩০ খ্রিঃ)। পুত্র হুমায়ুনের ওপর আরব্ধ কাজ শেষ করার দায়িত্ব আসে।

৪.৪ বাবরের সাফল্যের কারণ

বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণ ও সফল হবার জন্য যে কারণগুলি অন্যতম হিসাবে বিবেচনা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল — মধ্য-এশিয়ায় তাঁর রাজনৈতিক বিপর্যয়, সমকালীন ভারতীয় শাসকদের রাজনৈতিক দুর্বলতা, ভারতবর্ষের সম্পদের প্রতি বাবরের প্রলোভন এবং তাঁর ব্যাক্তিগত উদ্যোগ। বাবরের আত্মীয়-স্বজনদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের কারণে মধ্য-এশিয়ায় তাঁর সাফল্য স্থায়ী হয়নি। ফলে তিনি সিন্ধু-উপত্যকার অঞ্চলগুলির দিকে নজর দেন এবং কাবুল জয় করেন। কাবুল জয়ের পরবর্তীতে সময়ে ভারতীয় শাসকদের কলহ বিবাদের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাবর ভারতবর্ষ জয়ের জন্য প্রস্তুত হন এবং ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহার দখল করেন। ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রায় বারো হাজার অশ্বারোহী ও দক্ষ গোলন্দাজ বাহিনীসহ বাবর ভারত আক্রমণ করেন, দুর্ভাগ্যবশত দৌলত খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর এই অভিযান ব্যর্থ হয়। এই সাময়িক ব্যর্থতা বাবরের ভারত জয়ের জেদকে আরও বাড়িয়ে তোলে; ফলে ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাবর আবার ভারতের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন এবং ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করেন। বাবরের এই সাফল্যের অন্যতম কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রয়োগ, সুনিপুণ যুদ্ধ কৌশল, রণনিপুণতা ও পরিচালন ক্ষমতা।

৪.৫ মুঘল শাসনের সূচনায় ভারতবর্ষ

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সামরিক বিজয় ও ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ভারতবর্ষে সুলতানি শাসনের অবসান ঘটাল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হল। সুলতানি শাসনের অবসানের অর্থ এই নয় যে ভারতে বাবরের রাজনৈতিক-সামরিক আধিপত্য নিষ্কন্টক ছিল। বিজিত দেশে রাজনৈতিক-সামরিক আধিপত্য স্থাপনের শক্ত প্রশ্ন যেমন বাবরের সামনে ছিল, তেমনি একই ভাবে এত বৈচিত্র্যসম্পন্ন একটি দেশে কীভাবে মুঘল শক্তির নূন্যতম গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করা সম্ভব হবে — সেই প্রশ্ন-ও ছিল। সুতরাং বাবর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের সামনে দু-ধরনের রুক্ষ বাস্তবতা ছিল: প্রথমত, অন্তত উত্তর ভারতে মুঘল শক্তির নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক-সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা; দ্বিতীয়ত, শাসক শ্রেণি রূপে ভারতীয়দের থেকে নির্ভরযোগ্য আনুগত্য অর্জন করা। মনে রাখা দরকার এই দুই এর চরিত্র ছিল দীর্ঘমেয়াদি, কঠিন ও সংবেদনশীল। সম্পূর্ণ একটি নতুন দেশের মানুষের আনুগত্য অর্জন করা খুব সহজ কাজ যে নয় তা বলা বাহুল্য। উত্তর ভারতে বাবর আফগান ও রাজপুত শক্তিকে পরাস্ত করে

মুঘল শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন। এর ফলে গঙ্গা-দোয়াব অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্য মুঘলদের পক্ষে আসে। বাবরের এই জয় মুঘল শক্তির ভবিষ্যৎ অনেকটা সুরক্ষিত করেছিল।

১৫২৯ সালে ঘর্ঘরার যুদ্ধে বাবর আফগান শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন: কিন্তু এর পর থেকে ক্রমশ তিনি শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৫৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতে তাঁর কর্মজীবন মাত্র চার বছর। এই সামান্য সময়ের মধ্যে তিনি যে সামরিক বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন তা ঈর্ষণীয়। কিন্তু বিজিত অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ শাসন-কাঠামোর প্রতি তিনি খুব নজর দিতে পারেননি। ফলে, বাবরের সময় ভারতের প্রচলিত আইন-কানুন — যা সুলতানি শাসনের সময় দেখতে পাওয়া যায় — সেইগুলোর খুব কিছু পরিবর্তন হয়নি। পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো একই রকম থেকে যায়, - শুধু মুঘল রাজপুরুষদের বাবর এই কাঠামোর মধ্যে সংযুক্ত করেন। সাম্রাজ্যের আর্থিক শৃঙ্খলার উন্নতি করা বা নিয়মবদ্ধ করার কোনো প্রচেষ্টা বাবর করেননি। এর চাপ রাজকোষের উপর পড়েছিল, বিশেষ করে হুমায়ুনের সময়। ১৫৩০ সালে মুঘল শক্তি পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্ব দিকে বিহার পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। উত্তর দিকে স্বাভাবিক সীমা ছিল হিমালয় পর্বতমালা; দক্ষিণ দিকে সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল মালব পর্যন্ত। রাজপুতানার কিছু অঞ্চলের উপর বাবরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ভারত ছিল স্বাধীন। স্থানীয় স্তরে যে সকল সামন্তপ্রভু, ভূস্বামী, রানা বাবরের আগে থেকেই ক্ষমতা ভোগ করছিল তাদের চিরাচরিত অধিকারে বাবর সাধারণভাবে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত ছিলেন। সাম্রাজ্যের বাকি অংশ তিনি মুঘল রাজপুরুষদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এর ফলে ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে একটি নতুন ধরনের শ্রেণি সংযুক্ত হয়। এরা ছিল প্রায় অর্ধ-স্বাধীন। সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য ছিল সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তি। ফলে এই কথা বলা যাবে না যে ১৫২৬ থেকে ১৫৩০ এর মধ্যে ভারতে মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে প্রশাসনিক কাঠামো খুব দৃঢ়বদ্ধ ছিল।

৪.৬ উপসংহার

মধ্য এশিয়া থেকে বিতাড়িত এক রাজপুত্র, যাঁর সহায় ও সম্বল অতি সামান্য ছিল, তিনি কীভাবে ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন তা বিস্ময়কর। বাবর মধ্যযুগের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। তাঁর সারাজীবন নানা ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে গেছে। জীবনে বহুবার তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন; কিন্তু সেই নৈরাশ্য তাঁর জীবনে স্থায়ী হতে পারনি। চরম ভেঙে পড়ার মুহূর্তে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সামরিক কৌশলের প্রেক্ষিতে বাবর ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান। আফগানিস্তান ও ভারতের উপর তাঁর সামরিক কর্তৃত্ব এর সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। ইব্রাহিম লোদীর বিশাল সেনাবাহিনী তাঁর ক্ষুদ্র সেনার সামনে বিধ্বস্ত হয়েছিল : বাবরের রণনীতি ও রণকৌশল ছিল তুলনাহীন। বাবরের সামরিক কৃতিত্বের পাশে কিন্তু রাজনৈতিক-প্রশাসনিক দক্ষতা অনেকটাই ম্লান। তিনি ভারতে যথেষ্ঠ বড় সাম্রাজ্য নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু বিজিত অঞ্চলের সুশাসন স্থাপন করা বা সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-আর্থিক কাঠামো বিধিবদ্ধ করা তাঁর আয়ত্তের বাইরে ছিল। তাঁর সময় মুঘল ভারত ছিল একাধিক অর্ধ-স্বাধীন ভূখণ্ডের সমাহার বা সমষ্টি মাত্র। সংস্কৃতি, কলা ও রুচির বিচারে বাবরকে একজন অগ্রগণ্য চরিত্র বলে ভাবা যেতে পারে। তুর্কি ভাষায় রচিত বাবরের আত্মজীবনী *তুজুক-ই-বাবরি* বা *বাবরনামা* বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ। জীবন, সময়, সমাজ ও সমকাল সম্পর্কে বাবরের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর রুচি, আগ্রহের বিষয়বস্তু, সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে তাঁর কৌতুহল *বাবরনামা*-র সম্পদ। এই গ্রন্থ বাবরের চরিত্রের বহুদিকের প্রতিফলন। বাবর মধ্যযুগের ইতিহাসের অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র। তাঁর সময় মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি অনেক বীরের জন্ম দিয়েছে। সবার নাম কিন্তু ইতিহাসে টিকে থাকেনি। বাবর ইতিহাসের পাতায় রয়ে গিয়েছেন।

৪.৭ প্রশ্নাবলী

১. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ করুন।

২. ভারতবর্ষে বাবরের সাফল্যের কারণ কী ছিল?

৩. ভারতে বাবরের সময় মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৪. বিজেতা ও শাসক হিসেবে বাবরের চরিত্রের একটি মূল্যায়ন করুন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750,* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000-1765*, UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest. War, Environment, and Empire in Mughal North India*, Oxford, 2019.

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

একক : ৫ □ আগ্নেয়াস্ত্র, সামরিক প্রযুক্তি এবং যুদ্ধব্যবস্থা

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ ভূমিকা

৫.২ যুদ্ধের উপকরণ

৫.৩ মুঘলদের যুদ্ধের উপকরণ

৫.৩ সামরিক প্রযুক্তি ও যুদ্ধ ব্যবস্থা

৫.৫ পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সমরনীতি

৫.৬ মুঘল-আফগান সমরনীতি

৫.৭ উপসংহার

৫.৮ প্রশ্নাবলী

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন

- ভারতীয় যুদ্ধব্যবস্থা ও যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রযুক্তি।
- মুঘলদের যুদ্ধ ব্যবস্থা ও যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রযুক্তি।
- লোদী, আফগান ও মুঘলদের যুদ্ধকালীন অবস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ।

৫.১ ভূমিকা

পঞ্চদশ শতকের শেষে ভারত বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে উত্তর ভারতে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়, যাতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল সামরিক প্রযুক্তি এবং যুদ্ধব্যবস্থা। বাবর অসাধারণ গুণী ছিলেন যার মধ্যে নানান ধরণের গুণ সমন্বিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে ছিল উদারতা, সরলতা ও মানুষের প্রতি অনুকম্পা। ভারতের মধ্যেকার শক্তির ভারসাম্য ভেঙে দিয়ে, লোদী ও আফগান শক্তি ধ্বংস করে, বাবর একটা নতুন সাম্রাজ্য গড়ার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর গঠিত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেননি বা মন্ত্রীদের পুতুল করে রাখেননি। বাবরের মত ছিল যে সম্রাট দেখবেন যে মন্ত্রীরা তাদের কর্তব্য করছে। বাবার দৌত্যকার্যে নিপুণ ছিলেন এবং যখন দৌত্যে অসফল হয়েছেন শক্তি ব্যবহার করেছেন। যেভাবে তিনি হিন্দুস্থানের আফগান অভিজাতদের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন বা বাংলা ও বিহারের শাসকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন, তার থেকে বোঝা যায় যে ওঁর ধৈর্য ও দূরদৃষ্টি ছিল।

বাবর যে বিদ্যা ভারতে নিয়ে এলেন, সেটি যুদ্ধবিদ্যা। ওঁর আসার আগে বন্দুকের ব্যবহার হয়েছিল বলে সাম্প্রতিক

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কিন্তু উনি যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের যে ব্যবহার শুরু করলেন, তা এর আগে আর হয়নি। অশ্বারোহী ও কামানের সুদক্ষ ব্যবহারে যে প্রতিপক্ষের বিশাল সৈন্যদলকে হটানো যায়, সেটা বারবার বাবর দেখিয়েছেন। এর ফলে দুর্গগুলির দুর্ভেদ্য শক্তি কমতে থাকে। সুন্দরভাবে ব্যবহার করা শক্তিশালী দুর্গগুলি আর বেশিদিন দাঁড়াতে পারে না। কামানের ব্যবহারের ফলে ভারতের সামরিক অবস্থার মৌলিক রূপান্তর ঘটে।

৫.২ যুদ্ধের উপকরণ

সুলতানী শাসকদের যুদ্ধের প্রধান স্তম্ভ ছিল পদাতিক বাহিনী, ঘোড়সওয়ার বাহিনী ও হস্তিবাহিনী। এই সমস্ত বাহিনীর যুদ্ধের উপকরণ ছিল তরবারি, বল্লম, তীরধনুক ইত্যাদি। সুলতানি শাসকদের অশ্বারোহী সেনাদের গোড়া থেকেই লোহার রেকাব ছিল। মার্কোপোলোর মতে দক্ষিণ ভারতে ঘোড়ার খুরে নাল লাগাতে দক্ষ কামারদের অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ সুলতানি যুগে ঘোড়সওয়ার বাহিনী বেশ দক্ষ ছিল তা বলা যায়। এর অন্যতম প্রমাণ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয়নগরের রাজা দেবরায় জানতে চেয়েছিলেন কেন মুসলিম ফৌজ সর্বদা বিজয়ী হয়। এর উত্তর ছিল, মুসলিমদের সাফল্যের চাবিকাঠি দক্ষ ঘোড়সওয়ার এবং তীরন্দাজেরা। সুলতানি তীরন্দাজ বাহিনীর ব্যবহৃত ধনুকটির নাম 'আড়ধনুক' বা 'Cross-bow'। চতুর্দশ শতাব্দীতে, দিল্লীর সুলতানদের ফৌজে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গোলা নিক্ষেপক ছিল, যাদের বলত 'মনজনিখ', 'মঘ্‌রিবি' এবং 'আররাদা' কিন্তু এদের মধ্যে সঠিক পার্থক্য কী ছিল তা প্রমাণ করা সহজ নয়, এই গোলা নিক্ষেপকগুলি অবরোধকালীন — অবরোধকারী ও অবরুদ্ধ — দু'পক্ষই ব্যবহার করত।

৫.৩ মুঘলদের যুদ্ধের উপকরণ

মুঘলদের ভারতে আসার আগে পর্যন্ত ভারতীয় যুদ্ধ ব্যবস্থা ও যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রযুক্তি সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে যে আলোচনা করেছি তা থেকে স্পষ্ট যে ভারতীয় যুদ্ধব্যবস্থা একেবারে সেকেলে ছিল না। শুধু তাই নয় সাম্প্রতিক গবেষণায় একথা প্রমাণিত যে মুঘলদের আসার আগেই ভারতীয়রা বন্দুকের ব্যবহার জানত। কিন্তু মুঘলদের যুদ্ধোপোকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কামান, যাতে বারুদের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করা যেত। এই কামানের প্রচলনের উৎস ছিল অটোমান সাম্রাজ্য, যারা ইউরোপ থেকে ধার করা জিনিস ভারতবর্ষে সঞ্চারিত করেছিল। নিঃসন্দেহে পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) বাবরের চমকপ্রদ সাফল্যের সূত্রেই কামান ও হালকা বন্দুকের দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিত তৈরি হয়েছিল। বাবর পানিপথের যুদ্ধে কামান ইত্যাদি হাতিয়ারের ওপর নির্ভর করে চূড়ান্ত সফলতার সাথে অটোমান রণকৌশল অনুকরণ করেছিলেন। কামান নির্মাণের ক্ষেত্রে মুঘলরা ব্রোঞ্জ ও পেতল-এর ব্যবহার করে আরো বড় মাপের কামান তৈরিতে রপ্ত হয়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতকে বাংলায় উৎপাদিত সোরা বিদেশে পাড়ি দিত। পর্তুগিজরা বাংলার সোরা গোয়ায় পাঠায়। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, দুর্গ রক্ষা সবেতেই প্রয়োজন রসদ, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে সোরা বা সল্টপিটার।

৫.৪ সামরিক প্রযুক্তি ও যুদ্ধ ব্যবস্থা

ভারতীয় যুদ্ধব্যবস্থায় সামরিক প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল সে কথা আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, মুঘলদের আগমণের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় যুদ্ধব্যবস্থায় সামরিক প্রযুক্তির প্রয়োগ আরো উন্নত হযেছিল। মুঘলদের আগমনের প্রাক্কালে ভারতীয় যুদ্ধব্যবস্থায় একে অপরের মুখোমুখি সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে আক্রমণে শামিল হত। এক্ষেত্রে অবশ্য দক্ষ পদাতিক বাহিনী ও তাদের ব্যবহৃত বল্লম ও বর্শা চালনার কৌশল ছিল সাফল্যের চাবিকাঠি।

শুধু তাই নয় ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অন্তর্গত ঘোড়ার গতিশক্তি এবং পায়ে খুর লাগানোর মধ্য দিয়েও যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণিত হত। দক্ষ তীরন্দাজ বাহিনী বিপক্ষকে কীভাবে তাঁর নিশানায় রপ্ত করবে সে বিষয়টিও যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির নির্ণায়ক হত। সর্বোপরি আক্রমণকারী শত্রুরা যখন বিপক্ষকে দুর্গের চারিপাশ ঘিরে ধরে আক্রমণের অপেক্ষায় থাকত তখন উভয় পক্ষের তরফে গোলা নিক্ষেপের ব্যবস্থাও ছিল। এই গোলা নিক্ষেপের অন্যতম উপাদান ছিল সোরা। ফলে একথা স্পষ্ট যে ভারতীয় যুদ্ধব্যবস্থায় প্রথাগত অস্ত্র-শস্ত্রের পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগও ঘটেছিল যা যুদ্ধের প্রকৃতিকে বদলে দিয়েছিল।

৫.৫ পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সমরনীতি

আমাদের আলোচনায় আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে পানিপথের যুদ্ধের পূর্বে মুঘল বাহিনী বেশ কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেছিল। এই আক্রমণে বাবরের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী সাফল্য লাভ করলে বাবর ইব্রাহিমের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা নেন। ইব্রাহিম বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লি ছেড়ে অগ্রসর হতে থাকেন। মুঘলবাহিনীর গতিরোধ করার জন্য ইব্রাহিম লোদী স্ব-সৈন্যে সাহাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। সুলতানি বাহিনীতে ছিল প্রায় একলক্ষ সেনা ও একহাজার হাতি। ফিরিস্তার মতে, ইব্রাহিমের সাথে একশ হাতি ছিল, একহাজার নয়। এই সংবাদে বাবরও যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুরু করেন এবং পানিপথ থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত প্রায় দু-তিন মাইল এলাকা জুড়ে নিজ বাহিনী মোতায়েন করেন। ১২-১৯শে এপ্রিল বাবর তার বাহিনীকে পরিকল্পনা অনুযায়ী মোতায়েন করেন। প্রধানত তিনটি দলে বিভক্ত বাহিনীর কেন্দ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে থাকেন বাবর স্বয়ং। দক্ষিণভাগের নেতৃত্ব দেন হুমায়ুন ও খাজা কালান। অন্যদিকে বামভাগের নেতৃত্বে থাকেন সুলতান মীর্জা ও মাহদি খাজা। হুমায়ুন পানিপথের দিক থেকে এবং সুলতান মীর্জা যমুনার দিক থেকে আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। তবে এই যুদ্ধে বাবরের তিনটি বড় অস্ত্র ছিল তাঁর যুদ্ধ-কৌশল, গোলন্দাজ বাহিনী ও আব্দুল আজিজের নেতৃত্বাধীন সংরক্ষিত রণদক্ষ অশ্বারোহী বাহিনী।

পাণিপথ শহরকে বাবর রেখেছিলেন তাঁর সৈন্যদলের একদিক রক্ষা করার জন্য। অন্যদিকের রক্ষার জন্য ছিল বড় একটা নালা ও তার উপর বড় গাছ ফেলা। সামনের মালবাহী গাড়ির সারি দড়ি বা কাঁচা চামড়া দিয়ে বাঁধা। ঐ গাড়িগুলির মাজখানে ফাঁক ছিল যেখানে ছোট ইঁটের কাজ করে বন্দুকধারীদের রক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল। এই সারির পিছনে তৈমুরের প্রণালী অনুযায়ী সৈন্য সাজানো হয়েছিল, যার সঙ্গে ছিল উজবেগ ধরনের ছড়ানো ছিটানো গতিশীল অশ্বারোহী।

বলা হয় যে ইব্রাহিম লোদীর এক লক্ষ সৈন্য ছিল; সম্ভবত যুদ্ধ করার মত সৈন্য ছিল পঞ্চাশ হাজার। সঙ্গে ছিল দু-হাজার হাতি যারা অবশ্য গোলাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এক সপ্তাহ মুখোমুখি দাঁড়ানোর পর, ইব্রাহিম ২১ শে এপ্রিল ১৫২৬ সালে আক্রমণ করেন। আফগান অশ্বারোহী সৈন্য সামনাসামনি আক্রমণ করলে দেখতে পায় তাদের সামনের জায়গাটা অত্যন্ত সরু। এর ফলে তাদের দু'পাশের অশ্বারোহীরা মাঝখানে এসে পড়লে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বাবর এই সময়ে তাঁর দু'পাশের অশ্বারোহী দলকে পাঠান শত্রুর পিছন থেকে আক্রমণ করার জন্য এবং সামনে থেকে মাঝখানে গুলি চালাতে থাকেন। নড়াচড়ার জায়গা না থাকার ফলে, আফগান সৈন্য একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ইব্রাহিম তাঁর পাঁচ-ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে মাঝখানে আক্রমণ করলে, তাঁর মৃত্যু হয়। ওঁর মাথা কেটে বাবরকে উপহার দেওয়া হয়। আফগান সৈন্য চারিদিকে পালাতে থাকলে বাবরের বিজয় সম্পূর্ণ হয়। পানিপথে বাবরের এই বিজয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, সামরিক প্রযুক্তি ও যুদ্ধকৌশল যুদ্ধ জয়ের একটি অন্যতম শর্ত।

৫.৬ মুঘল-আফগান সমরনীতি

পানিপথের যুদ্ধ জয়ের পর বাবরের সেনাপতিরা দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও বাবরের ভারতে থাকার সিদ্ধান্তে তারা সকলে খুশি হতে পারেননি। শুধু তাই নয় বাবরের এই সিদ্ধান্তের ফলে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করে তুলল। রাণা আঠারোটি যুদ্ধ জিতেছিলেন ও রাজনৈতিক উচ্চাশা পোষণ করতেন উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য তৈরি করার। আফগান কিছু নেতারাও ঐ ধরণের উচ্চাশা পোষণ করতেন। কিন্তু বাবর প্রথমে রাণার সঙ্গে যুদ্ধ না করে আফগান নেতাদের দমন করার নীতি নিয়েছিলেন। আফগান শাসনকর্তাদের হাতে তখনো ছিল বিয়ানা, ধোলপুর, সম্ভল, রাপড়ি, এটোয়া ও কালপি। কনৌজ থেকে বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত লোহানী ও ফারমুলিদের দখলে ছিল। বাবর তাঁর অনুচরদের মধ্যে জায়গাগুলি বিতরণ করে ওদের দখল নিতে আদেশ দিলেন। হুমায়ুনকে পাঠানো হল লোহানী ও ফারমুলিদের বিরুদ্ধে। ২১ শে আগস্ট হুমায়ুন এগোতে থাকলে আফগানরা পিছোতে থাকে যার ফলে হুমায়ুন জৌনপুর ও গাজীপুর সহজে দখল করেন।

সম্ভবত রাজপুতদের উপর নজর রাখার জন্য, বাবর আগ্রাতে রয়ে গেলেন। ঐ সময়ে তিনি একটি বাগান তৈরি করেন যার তলায় স্নানঘর সমেত অন্যান্য ঘর ছিল। কিন্তু তাঁর প্রথম পরিকল্পনা ছিল ছোট ছোট আফগানদের বশ্যতা স্বীকার করানো। বিয়ানা ছিল রাজপুতানায় ঢোকার দরজা। এখানকার শক্ত দুর্গ মেওয়ার এর পাশে ছিল যেটাকে ভিত্তি করে রাজপুতানা আক্রমণ করা সম্ভব। নিজাম খান এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু ওর ভাই আলবু খান (কারৌলির এক দুর্গের কিল্লাদার) বাবরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলে তারদি বেগকে আড়াই হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠোনো হয়। কিন্তু নিজাম খান যুদ্ধে ওদের হারিয়ে দিলে ওরা পালায়।

যথেষ্ট সামরিক প্রস্তুতি না থাকার জন্য এবং আফগানদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বাবর রাণার বিরুদ্ধে অগ্রসর হননি। এর মধ্যে বাবর বিয়ানা দখল করে নিজাম খানের সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করলে রাণা বুঝতে পারেন যে যুদ্ধ আসন্ন। ৩০শে নভেম্বর ১৫২৬ সালে বাবর হুমায়ুনকে জৌনপুর থেকে আগ্রায় আসতে বলেন। ইতিমধ্যে ছোট ছোট কয়েকজন জমিদার বাবরের বশ্যতা স্বীকার করেছে। এদেরকে অন্য জায়গায় ওয়াজা দেওয়া হযেছে এর ফলে গোয়ালিয়র, বিয়ানা, ধোলপুর ও অন্যান্য দুর্গগুলি মুঘলদের হাতে চলে যায়। ব্যতিক্রম ছিল আলওয়ারের (মেওয়াট) হাসান খান যে বশ্যতা স্বীকার করেনি। হাসান ইব্রাহিমের ভাই মাহমুদকে পরাজিত করে রাণা সঙ্গের দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়। ফলে হাসান খান ও রাণা সংগ্রামসিংহের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়, যা বাবরকে চিন্তিত করে তোলে। এতদিন পর্যন্ত তিনি উজবেক, আফগান, তুর্কি ইত্যাদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু এখন তিনি দুর্ধষ রাজপুতদের সম্মুখীন হন। রাজপুতরা যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল শত্রুবাহিনী বা মৃত্যুর পরোয়া করে না। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে সমর-নিপুণতা এবং দুর্ধষতার প্রয়োজন। বাবর ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আগ্রা থেকে বেরিয়ে সিক্রি নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করেন এবং রাণা সংগ্রামসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন।

১৭ই মার্চ, শনিবার ১৫২৭ সালে বাবর তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে এসে খবর পেলেন যে রাজপুতরা অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ রাজপুতরা বাবরের সৈন্যদের দক্ষিণ অংশে আক্রমণ করে। বাবর এই অংশটি রেখেছিলেন তাঁর তুলঘমা আক্রমণ (শত্রুদের পিছনে গিয়ে আক্রমণ) করার জন্য। বিপদ বুঝে বাবর বাছাই করা সৈন্য নিয়ে রাজপুতদের বাম দিকে আক্রমণ করে। এর ফলে রাজপুতদের বাম দিকে ও মাঝখানের মধ্যে একটা ফাঁক তৈরি হয়। মুস্তাফা রুমি এর মধ্যে ঢুকে গুলি ছুঁড়তে থাকে; কিন্তু রাজপুতরা মুস্তাফার দক্ষিণদিক আক্রমণ করে তাকে বিব্রত করে তোলে। ডান দিকে ভয়ানক যুদ্ধ হলেও রাজপুতরা মুঘল সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি। ফলে রাজপুতরা

মুঘলদের বাম দিকে আক্রমণ করেও মুঘলদের হটাতে পারে না। এই সময়ে বাবর তুলঘমা আক্রমণ করলে রাজপুতরা চারিদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে যায়। রাজপুতরা মাঝখানে আক্রমণ করলেও মুঘলদের হটাতে পারেনি। আর একবার আক্রমণ করে রাজপুতরা বাবরের দুপাশের সৈন্যদের হাটিয়ে দিতে থাকে। মুঘলদের বাম দিক প্রায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সময়মত গুলি ছুঁড়ে তারা রাজপুতদের ঠেকিয়ে রাখে। প্রায় দশ ঘন্টা যুদ্ধের পর রাজপুতদের আক্রমণ শিথিল হয়ে গেলে বাবর দু'পাশ থেকে আক্রমণ করেন। এর ফলেই সূর্য্য ডোবার আগে রাজপুত ভাগ্য ডুবে যায়।

বাবর আর একবার দেখালেন যে উচ্চধরনের যুদ্ধ কৌশল, সাহস ও কামান তাঁর বিজয়ী করেছে। রাণা যদি বিয়ানা দখলের পর আক্রমণ করতেন, তাহলে বাবর সৈন্য প্রস্তুত করা ও সাজানোর সময় পেতেন না। যুদ্ধে গোড়ার দিকে আহত হয়ে উনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিলেন। ওঁর হাতিতে এক ঝালা আজ্জাকে সাজিয়ে পাঠানো হয় যাতে কেউ বুঝতে না পারে। এর ফলে রাজপুতরা রাণার অভিজ্ঞতার সুযোগ পায়নি।

এ যুদ্ধের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। রাজপুত মোর্চা এর ফলে ভেঙে যায় কারণ সেটার ভিত্তি ছিল যুদ্ধে জেতা বা দৌত্যকার্যে সফল হওয়ার উপর। যুদ্ধে বহু উল্লেখযোগ্য রাজপুত নিহত এবং রাণা সহ আহত হবার ফলে রাজপুতানা এখন মুঘলদের আক্রমণের সামনে খোলা অবস্থায থাকে। বাবর গাজী উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁর সিংহাসনও সুদৃঢ় জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ওঁর কার্যকলাপ এখন কাবুল থেকে হিন্দুস্থানে চলে আসে। এছাড়া, রাজপুতদের পরাজয়ের ফলে আফগান শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে।

৫.৭ উপসংহার

উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে বাবরের নেতৃত্বে মুঘল শক্তির একটানা জয় সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে সামরিক কৌশলে একটি মৌলিক বদল এসেছে, যা ভারতীয় শক্তিবর্গের (যেমন আফগান, রাজপুত প্রমুখ) অজানা। দূর্গ, অশ্বারোহী বাহিনী, তিরন্দাজ শক্তি, হস্তি বাহিনী, পদাতিক সৈন্য কোনো কিছুই — আফগান ও রাজপুতদের মুঘলদের বিরুদ্ধে বিজয় হাসিল করতে পারেনি। বাবরের সময় মুঘলরা রণক্ষেত্রে প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। সংগ্রাম সিংহের দুর্ধর্ষ রাজপুত বাহিনীও বাবরকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধে কামানের ব্যবহার নিঃসন্দেহে বাবরের জয়ের একটা বড় কারণ ছিল, কিন্তু কখনই তা একমাত্র কারণ নয়। বাবরের রণনীতি ও রণকৌশল উভয়ই তাঁর প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। মধ্য এশিয়া ও অটোমান রণকৌশল উভয়ই তিনি প্রয়োজনমতন ব্যবহার করেন। তাঁর প্রতিপক্ষরা যখন চিরাচরিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ করছিল, বাবর কিন্তু নতন ধরনের কৌশল শিখতে কোনো দ্বিধা করেননি। এই শেখার মানসিকতা তাঁকে অন্যদের থেকে এগিয়ে দেয় ও ভারতে মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন ঘটায়।

৫.৮ প্রশ্নাবলী

১. মধ্যযুগের ভারতে সামরিক প্রযুক্তি ও যুদ্ধ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

২. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সমরনীতি কী ছিল? বাবর কেন বিজয়ী হয়েছিলেন?

৩. মুঘল-আফগান সমরনীতি সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989.

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750*, New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000-1765*, UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest. War, Environment, and Empire in Mughal North India*, Oxford, 2019.

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

একক : ৬ □ সাম্রাজ্যের জন্য হুমায়ুনের প্রচেষ্টা

গঠন

৬.০ **উদ্দেশ্য**

৬.১ **ভূমিকা**

৬.২ **মুঘল সম্রাট হিসাবে হুমায়ুন**

৬.৩ **হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবন**

৬.৪ **হুমায়ুনের ব্যর্থতা**

৬.৫ **হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয় ও সাম্রাজ্য পুনর্দখল**

৬.৬ **উপসংহার**

৬.৭ **প্রশ্নাবলী**

৬.৮ **গ্রন্থপঞ্জি**

৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন-

- বাবরের মৃত্যুর পর মুঘল সিংহাসন দখলের চক্রান্ত থেকে হুমায়ুনের সিংহাসন লাভের ঘটনা।
- সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য হুমায়ুনের সংগ্রাম।
- হুমায়ুনের পরাজয় ও ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনি।
- হুমায়ুনের দিল্লী পুনর্দখল ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

৬.১ ভূমিকা

খানুয়ার যুদ্ধের পর বাবর হুমানুয়নকে কাবুলে পাঠান। কিন্তু উজবেকদের বিরুদ্ধে হুমায়ুন টিকতে না পারায় বাবর নিজেই কাবুলের দিকে রওনা হন। লাহোর পৌঁছবার পর বাবরের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে হুমায়ুনের পরিবর্তে তাঁর মামা মাহদী খাজাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে হুমায়ুন ভারতে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে বাবরও দেশে ফিরে হুমায়ুনকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন এবং ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সিংহাসনে বসে হুমায়ুন দেখতে পেলেন তাঁর ভাইরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের লিপ্ত, আমীর-ওমরাহ ও সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, সর্বোপরি আফগানদের বিরোধিতা। এই সমস্ত বিশৃহলা ও বিরোধিতার পরিণতি ঘটে শেষ পর্যন্ত ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে শেরশাহের হাতে হুমায়ুনের পরাজয়। এরপর পনের বছরের বিরতি (১৫৪০-১৫৫৫)। ঐ সময় শেরশাহ ও তাঁর পুত্র ও আত্মীয়রা দিল্লীর সিংহাসন দখল করেছিল। এই সময় পর্বে নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিযে হুমায়ুন পরিকল্পনা করে চলেছিলেন ভারতের শাসন ক্ষমতা কীভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়, শেষ পর্যন্ত ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন সাফল্য লাভ করেন এবং সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য তার সংগ্রাম পরিণতি লাভ করে।

৬.২ মুঘল সম্রাট হিসাবে হুমায়ুন

সিংহাসনে আরোহনের সময় হুমায়ুনের বয়স ছিল মাত্র তেইশ। বাবর যে সাম্রাজ্য রেখে গিয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। সিংহাসনের দাবিদার ছিল অনেক। মুঘলদের নির্দিষ্ট কোন উত্তরাধিকার আইন না-থাকার ফলে হুমায়ুনের আত্মীয়বর্গ, কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাত এবং অন্যান্য ভারতীয় শক্তির নেতারা প্রত্যেকেই সিংহাসন দখলের জন্য লালায়িত ছিলেন। হুমায়ুনের চরিত্রে সারল্য ও কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যরক্ষার সংগ্রামে এই দুটি মানবিক গুণ খুব বেশি কার্যকরী ছিল না, 'হুমায়ুন' কথাটির অর্থ ভাগ্যবান। কিন্তু হুমায়ুনের প্রতি ভাগ্য কখনও সুপ্রসন্ন ছিল না। অন্যদিকে শেরখান বিভিন্ন সময়ে ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। হুমায়ুন গুজরাটে বাহাদুর খানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে শেরখান বিহারে নিজের অধিকার দৃঢ় করতে সুযোগ পান। হুমায়ুন যখন চুণার দুর্গ অবরোধ করতে ছয়মাস কাটিয়ে দেন তখন সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করে শেরখান অবাধে গৌড় লুঠ করেন। আবার হুমায়ুন বঙ্গ দেশে গৌড় বিজয়ের উল্লাসে মত্ত থাকলে শেরখান মুঘলদের আগ্রার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। চৌসায় ভুল করে হুমায়ুন নদী পার হয়ে আক্রমণ করতে গেলে শেরখান সহজেই মুঘল সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারেন।

৬.৩ হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবন

মধ্য এশিয়া দখল করার স্বপ্ন বাবরের যায়নি, বিশেষত সমরকন্দ দখল করার ইচ্ছা বরাবরই তার ছিল। এইজন্য শাহ আহমাসগ-এর কাছে উজবেগদের পরাজয়ের পর তিনি হুমায়ুনকে পাঠিয়ে ছিলেন। হুমায়ুন কিছুটা সাফল্য অর্জন করলে কামরানকে পাঠানো হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশেষ কিছু লাভ হয়নি ও উজবেগদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করতে হয়। এই অসাফল্যের জন্য বাবর হুমায়ুনকে বাদাকশান থেকে সরিয়ে হিন্দলকে ঐ দায়িত্ব দেন। ২৭ শে জুন ১৫২৯ সালে হুমায়ুন আগ্রাতে পৌছান। এর পরে কাশগড়ের শাসনকর্তা সৈদ খান বাদাকশান অবরোধ করে বিফল হন। বাবর সুলেমান মীর্জাকে পাঠান বাদকশানের দায়িত্ব নিতে।

বাররের স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান, আফিম, ভাঙ ইত্যাদি খাওয়া ও গরমের মধ্যে এরকম অভিযান চালানোর ফলে ওঁর শরীর ভাঙতে থাকে। ওঁর ক্রমশ বিশ্বাস হতে থাকে যে ভগবান ওঁকে ওঁর জীবন হুমায়ুনকে দিতে বলছেন বিশেষত হুমায়ুনের অসুখের সময়ে। হুমায়ুন সেরে ওঠার পাঁচ-ছয় মাস পরে বাবর অসুস্থ হয়ে পড়েন ও হুমায়ুনকে উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করেন। এই অসুস্থতার মধ্যে মুঘলদের প্রধানমন্ত্রী নিজামুদ্দিন খলিফা নিজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্য বাবরের বোনের স্বামী মহাদী খাজাকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মাহদী খাজা সিংহাসনে বসে ওঁদের প্রাণদণ্ড দেবার কথা বললে, খলিফা মত পরিবর্তন করে মহাদী খাজাকে বন্দী করেন ও হুমায়ুনকে রাজধানীতে ডেকে পাঠান। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হলে হুমায়ুন সিংহাসনে বসেন।

হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে বিস্তৃতি ছিল ১৫৩০ থেকে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই দশ বছরে তিনি সিংহাসনে তাঁর অধিকার রক্ষার জন্য অনবরত যুদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের কালক্রম ১৫৪০ থেকে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময় তিনি ছিলেন রাজ্যচ্যুত ও আশ্রয়চ্যুত একজন হতভাগ্য রাজপুরুষ। আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছেন ভারতের নানা প্রান্তে। শেষ পর্যন্ত ভারত ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছেন পারস্যের শাহ দরবারে। ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়। এ পর্যায়ে তিনি আবার নতুন করে রাজ্য পুনরুদ্ধারে স্বপ্ন দেখেছেন। সংগ্রহ করেছেন। সেনাবাহিনী, অর্থ ও রসদ। কাবুল-কান্দাহারকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন নতুন অভিযান পরিকল্পনা। আর চতুর্থ তথা শেষ পর্যন্ত ছিল ১৫৫৫ থেকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

এ সামান্য কাল তিনি আবার বসেছেন দিল্লীর সিংহাসনে। আংশিকভাবে হলেও পুনরুদ্ধার করেছেন পিতার হৃত সাম্রাজ্য।

৬.৪ হুমায়ুনের ব্যর্থতা

আপনারা ইতিপূর্বেই জেনেছেন যে সিংহাসনে বসার পর ভাগ্য হুমায়ুনের সঙ্গ দেয়নি। তাই বারে বারে তাঁকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আফগানদের পাশাপাশি তাঁকে লোদীদের সঙ্গেও লড়তে হয়েছে। সাফল্য তাঁর জীবনে এলেও দুরদৃষ্টির অভাব এবং ভাগ্যবিপর্যয় তাঁর পিছু ছাড়েনি। ফলে তাকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আফগান নেতা শেরশাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাংলা আক্রমণ ও লুণ্ঠনের সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে হুমায়ুন প্রথম চুণার দুর্গ অবরোধ করেন। চুণার দুর্গ এমনিতেই দুর্ভেদ্য। শেরখান সেখানে যে সৈন্যদল রেখেছিলেন তারা ছয় মাস পর্যন্ত দুর্গের দখল ছেড়ে দেয়নি। ফলে চুণার জয় করতে হুমায়ুনের বড্ড বেশি সময় লেগে যায়। ঐ সময়ে শেরখান গৌড় জয় করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে মুঘল সৈন্য এড়িয়ে বিহারে রোটাসগড় দুর্গে রেখে দেন এবং বিহারে ফিরে গিয়ে অবাধে লুঠপাট করে ঘুরে বেড়ান। হুমায়ুন চুণার জয় করে গৌড়ে যান এবং গৌড় জয় করে প্রচুর ধনরত্ন লুঠ করে বিহারের মধ্য দিয়ে আগ্রায় পাঠান। পরে গৌড়ে চারমাস ধরে বিজয় উল্লাসে মত্ত হন। শেরখান হুমায়ুনের পাঠানো ধনরত্ন বিহারে লুঠ করেন এবং আগ্রা থেকে মুঘল সৈন্যকে সাহায্যের পথ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেন। হুমায়ুন এবারে গৌড় থেকে আগ্রায় ফেরার পথে বক্সার-এর কাছে চৌসায় শেরখানের সৈন্যের সম্মুখীন হন। ইতিমধ্যেই তাঁর আগ্রার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। হুমায়ুন নদী পার হযে শেরখানকে আক্রমণ করতে গেলে শেরখান তাঁকে সহজেই পরাজিত করেন। হুমায়ুন কোনওভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু শেরখান ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। কনৌজের কাছে আবার হুমায়ুনকে পরাস্ত করেন (১৫৪০)। হুমায়ুন সিন্ধুপ্রদেশে পালিয়ে যান আর শেরখান 'শেরশাহ' উপাধি নিয়ে দিল্লীর মসনদে বসেন। মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বিতীয় পর্যায় এখানেই শেষ হয়।

৬.৫ হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয় ও সাম্রাজ্য পুনর্দখল

চৌসা ও কনৌজ-এ হুমায়ুনের ব্যর্থতাকে কেউ কেউ প্রকৃতির বিরূপতা ও শরশাহ-এর ষড়যন্ত্রের পরিণতি বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতির উপর দোষ চাপিয়ে হুমায়ুনের দুর্বলতা বা ব্যর্থতাকে চাপা দেওয়া নিরর্থক। কারণ প্রকৃতির বিরূপতা উভযপক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। আর রণক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র তৎকালীন রাজনীতিতে কোন নতুন বা অন্যায্য পথ ছিল না। আসলে শেরশাহ-এর সুনেতৃত্ব, কর্মদক্ষতা, দূরদৃষ্টি ইত্যাদির কাছে হুমায়ুনের আলস্য, অদূরদর্শিতা, বিশৃঙ্খলা বাহিনীর পরাজয় ছিল স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি।

পরবর্তী পাঁচ বছর রাজ্যচ্যুত হুমায়ুন সামান্য একটু আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান নানা স্থানে। ভাই কামরান আশ্রয় দিয়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান তিনি। তারপরে অমরকোটের রাণার আশ্রয়ে কাটান কিছুদিন। অবশেষে চলে যান পারস্যের শাহ তাহমাস্পের দরবারে। এক চুক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর সাহায্যে দখল করেন কাবুল ও কান্দাহার (১৫৫৫ খ্রীঃ)। হত্যা করেন বেইমান ভায়েদের। এরপর একে একে দখল করেন লাহোর, আগ্রা, ও দিল্লী (১৫৫৬ খ্রীঃ), পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় মুঘল সাম্রাজ্য। সামান্যভাবে হলেও বাবরের কষ্টার্জিত রাজ্যকে সচল দেখেই হুমায়ুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

৬.৬ উপসংহার

মুঘল ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করলে হুমায়ুনকে সম্রাট হিসেবে অন্যান্য মুঘল সম্রাটের তুলনায় কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নিস্প্রভ ও অদূরদর্শী বলে মনে হয়। বাবরের রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য ও সম্পদের প্রতি তিনি যথেষ্ঠ মর্যাদা দেখাতে পারেননি বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন। শাসক হিসেবে হুমায়ুন নিশ্চিত ভাবেই খুব বড় কোনো কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন না। সঠিক সময়ে সঠিক নীতি বলিষ্ঠ ভাবে রূপায়ণের সদিচ্ছার অভাব তাঁর মধ্যে ছিল: হুমায়ুনের শত্রুরা তার সুযোগ নিতে দ্বিধা করত না। হুমায়ুনের সবচাইতে বড় প্রতিপক্ষ ছিলেন শের শাহ, যিনি ছিলেন অসম্ভব ক্ষিপ্র, সমরকুশলী, ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতাসম্পন্ন, সুযোগের সদব্যবহার করতে সিদ্ধহস্ত, রণনীতি ও রণকৌশল রচনায় পারঙ্গম। সময় নষ্ট করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। হুমায়ুনের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের এই মানুষটির সঙ্গে এঁটে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। হুমায়ুন তাঁর ভাইদের বিশ্বাস করেছিলেন। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা তাঁর ভাইরা রাখেননি। ঐতিহাসিকরা এই বিষয়ে একমত যে হুমায়ুন ছিলেন ভদ্র মানুষ। কোনো কোনো সময় তার জন্য হুমায়ুনকে মূল্য দিতে হয়েছে। সব মিলিয়ে কখনও হুমায়ুন পরিস্থিতির শিকার, কখনও বা তিনি উদ্যমহীনতার কারণে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। উপসংহারে এইটুকু বলা যায় তিনি আকবরের জন্য বাবরের সাম্রাজ্য কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

৬.৭ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল সম্রাট হিসেবে হুমায়ুনের মূল্যায়ন করুন।

২. হুমায়ুনের সঙ্গে শেরশাহ-র দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতি সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526–1750*, OUP, 2000

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000-1765*, UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest. War, Environment, and Empire in Mughal North India*, Oxford, 2019.

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা, ২০০৯

একক : ৭ : শেরশাহ ও তাঁর প্রশাসনিক এবং রাজস্ব সংস্কার

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.২ ভূমিকা

৭.২ শেরশাহের সিংহান লাভ

৭.৩ মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান

৭.৪ শেরশাহের প্রশাসনিক সংস্কার সমূহ

৭.৪.১ শাসন সংস্কার

৭.৪.২ বিচার সংস্কার

৭.৪.৩ পরিবহন সংস্কার

৭.৪.৪ রাজস্ব সংস্কার

৭.৫ উপসংহার

৭.৬ প্রশ্নাবলী

৭.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা

- মুঘল সাম্রাজ্য দখল করে শেরশাহ কীভাবে আফগান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন সে বিষয়ে যেমন জ্ঞাত হবেন, তেমনি আফগান শক্তির কাছে সাময়িক হার স্বীকার করে নিয়ে হুমায়ুন কীভাবে হৃত পিতৃ সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন তা জানতে পারবেন।
- আফগানদের স্বল্পস্থায়ী শাসন কাঠামোর মধ্যে শেরশাহ যে সমস্ত প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংস্কার করে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে আছেন তা জানতে পারবেন।

৭.১ ভূমিকা

শেরশাহের বাল্য নাম ফরিদ। তিনি সাসারামের জায়গিরদার হাসান খান সুরের পুত্র ছিলেন। শেরশাহের জন্ম-তারিখ সঠিক জানা না গেলেও মনে হয় তিনি ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতা পাঞ্জাব এলাকায় জায়গারিদার ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর পিতা বিহারের সাসারামের জায়গির লাভ করেন এবং এখানেই শেরশাহ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। প্রথম জীবনে নানা প্রকার ভাগ্য বিপর্যয়ের পর শেরশাহের জীবনের গতি যে ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। সামান্য জায়গিরদার থেকে দিল্লীর মসনদ দখল করা তাঁর অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় শেরখানের এই সাফল্যের মূলে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। প্রথম, অল্পদিনের মধ্যে আগাধ সম্পত্তি লাভ, দ্বিতীয়, দক্ষ সামরিক বাহিনী গঠন এবং তৃতীয়, তাঁর সুপ্রসন্ন ভাগ্য।

৭.২ শেরশাহের সিংহাসন লাভ

পানিপথ আর খানুয়ার যুদ্ধ জয়ের পরে বাবর যখন দিল্লী-আগ্রাকে কেন্দ্র করে ভারত সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা করেছেন। শের খাঁ-র বীরত্ব কথা তিনিও কিছুটা শুনেছেন। আবার শের খাঁও জানতেন, মোঙ্গলদের যুদ্ধ-পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে পারলে তাঁরই লাভ হবে। তাই লক্ষ্য স্বতন্ত্র হলেও দু'জনের মিলন ঘটতে অসুবিধা ছিল না (১৫২৭-২৮ খ্রীঃ)। কিন্তু অচিরেই শের খাঁ বুঝতে পারেন যে, মুঘলের অধীনে আফগানদের উন্নতির সম্ভাবনা খুবই কম। তাই তিনি দিল্লী ত্যাগ করে আবার বিহারে ফিরে আসেন। এই সময় বিহারের শাসক ছিলেন বাহার খাঁ-র নাবালক পুত্র তথা শের খাঁ'র প্রক্তন ছাত্র জালাল খাঁ। খুব সহজেই শের খাঁ জালাল খাঁর অভিভাবকত্ব লাভ করেন এবং নিজ প্রতিভা ও দক্ষতায় প্রায় সব ক্ষমতাই কুক্ষিগত করে নেন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে চুনার দুর্গের অধিপতি ও তাঁর পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগে চুনার দুর্গ শের খাঁ'র অধীনে চলে আসে। দুর্গাধিপতির বিধবা পত্নী শের খাঁকে বিবাহ করে তার অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দেন। এই সময় হুমায়ুন চুনার অবরোধ করলে চতুর শের খাঁ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে বিপদমুক্ত হন।

শের খাঁর উচ্চকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে লোহানী আফগান সর্দাররা এই সময় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। জালাল খাঁও শের খাঁ'র প্রভাবমুক্ত হবার জন্য উন্মুখ ছিলেন। এমতাবস্থায় বাংলায় শাসক মামুদ শাহ'র সাথে মিলিতভাবে জালাল খাঁ শের খাঁকে ক্ষমতাচ্যুত ও বিতাড়িত করার প্রস্তুতি শুরু করেন। সুরজগড় বা কিউলের যুদ্ধে (১৫৩৩ খ্রীঃ) সব হিসেব পাল্টে দেন শের খাঁ। পরাজিত হন জালাল ও তাঁর মিত্রবাহিনী। সমগ্র বিহার করায়ত্ত হয় একভাগ্যদ্বেষী, গৃহচ্যুত উদ্যমী সৈনিক শের খাঁর। কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট হবার মত সামান্য মানুষ শের খাঁ ছিলেন না। তাই তিনি হাত বাড়ান বাংলার দিকে। বাংলার শাসক মামুদ শাহ সুরজগড়ের যুদ্ধেই শের খাঁর শক্তি দেখেছেন। তাই তিন প্রচুর অর্থ এবং রাজ্যখণ্ড উপঢৌকন দিয়ে শের খাঁ'কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন (১৫৩৬ খ্রীঃ)। প্রথমবার এতে সন্তুষ্ট হলেও পরের বছরই শের খাঁ আবার বাংলা আক্রমণ করে গৌড় দখল করে নেন।

শের খাঁর এহেন ক্রমোন্নতি দেখেও হুমায়ুন আগ্রাতে বিলাস-ব্যাসনে মত্ত ছিলেন। কিন্তু বাংলা তাঁর করায়ত্ত হলে হুমায়ুন প্রমাদ গোনেন এবং শের খাঁকে দমন করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর ভ্রান্ত রণনীতি, সময়ের অপব্যবহার এবং অলস্য তাঁকে কেবল অন্ধকার আবর্তেই নিক্ষেপ করে। সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করে তিনি কেবল শের খাঁ নামক আলেয়ার পিছনে দৌড়ে বেড়ান এবং শেষ পর্যন্ত চৌসা (১৫৩৯ খ্রীঃ) ও বিল্বগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রীঃ) পরাজিত হয়ে প্রথমে রাজ্যচ্যুত হন এবং পরে দেশত্যাগ করে পারস্যে চলে যেতে বাধ্য হন। দিল্লীর সিংহাসনে বসেন শের খাঁ। তার নতুন উপাধি হয় 'শেরশাহ'।

৭.৩ মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান

দিল্লীর মসনদে আফগান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পর শেরশাহ রাজ্যসীমা বিস্তারে মন দেন। কিছুটা ইচ্ছায় এবং কিছুটা পরিস্থিতির চাপে তাঁকে বার বার রণক্ষেত্রে যেতে হয়। বাংলা, পাঞ্জাব ও গুজরাটের বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁর অধীনে আসে। পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর কলিঞ্জর দুর্গ অবরোধ কালে বারুদের স্তূপে আগুন লাগার দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারান (১৫৪৫ খ্রি)। শেরশাহ-এর পুত্র ইসলাম খান পিতার সাম্রাজ্য অটুট রেখেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই (১৫৫৪ খ্রি) তাঁর মৃত্যু হয়। ইসলামের মৃত্যুর পর আফগান স্বাতন্ত্র্য আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। শেরশাহ-এর আত্মীয়দের মধ্যে আদিলশাহ শূর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। পাঞ্জাবে সিকান্দার শূর এবং গুজরাটের ইব্রাহিম খান প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকে। এদেরও দৃষ্টি ছিল দিল্লীর সিংহাসনের ওপর।

কনৌজ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন সিন্ধু প্রদেশে পালিয়ে যান। সিন্ধু জয় করারও চেষ্টা করেন। কিন্তু

ভাইয়েদের কাছ থেকে কোনওরূপ সাহায্য না পেয়ে ব্যর্থ হন। এরপর কিছুদিন সিন্ধুর মরু অঞ্চলে পালিয়ে বেড়িয়ে অবশেষে ইরানের শাহ তাহমস্প (Shah Tahmasp)-এর আশ্রয় নেন। তাহমস্প তাঁকে কাবুল ও কান্দাহার উদ্ধার করতে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। যুদ্ধে কামরান পরাজিত ও বন্দী হন। কাবুল ও কান্দাহার হুমায়ুনের দখলে আসে। কামরানকে অন্ধ করে মক্কায় পাঠান হয়। পরে আসকারিকেও মক্কায় পাঠানো হয়। ছোট ভাই হিন্দাল হুমায়ুনের পক্ষে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। এইভাবে ভাইদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হুমায়ুন কাবুলে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। ভারতে শূরদের বিবাদের ওপর তাঁর দৃষ্টি ছিল। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে সিকান্দার শূরকে আক্রমণ করলে মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার তৃতীয় ও শেষ পর্যায় শুরু হয়। লাহোরে জয়লাভ করে মুঘল সৈন্য এগিয়ে গিয়ে আবার সিরহিন্দ-এ আফগান বাহিনীকে পরাজিত করে। হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হুমায়ুনের মৃত্যু হয় (জানুয়ারি ১৫৫৬)। হুমায়ুনের নাবালক পুত্র আকবর তখন পাঞ্জাবের কালানোরে। বৈরাম খাঁর অভিভাকত্বে আকবরকে 'বাদশাহ' ঘোষণা করা হয়। দিল্লীর শাসনকর্তা তখন মুঘল প্রতিনিধি তার্দিবেগ। আদিল শূরের হিন্দু সেনাপতি হিমু তার্দিবেগকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করে নেয়, এবং হিমু নিজেকেই দিল্লীর বাদশাহ রূপে ঘোষণা করে। পাঞ্জাব থেকে বৈরাম খাঁ স্বসৈন্যে এসে হিমুকে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) পরাজিত ও নিহত করলে মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭.৪ শেরশাহের প্রশাসনিক সংস্কার সমূহ

শেরশাহ কেন্দ্রীকরণ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য একার পক্ষে শাসন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি স্থানীয় ভিত্তিতে দেশ শাসন প্রচলন করেন। শেরশাহ সমগ্র সাম্রাজ্যকে গ্রাম থেকে প্রদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে এক মসৃণ শাসন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

৭.৪.১ শাসন সংস্কার

সমগ্র শাসনব্যবস্থা শেরশাহ'র নিয়ন্ত্রণে ছিল। কেন্দ্রে শাসনকার্যে শেরশাহকে সাহায্য করতেন চারজন বিশিষ্ট কর্মচারী। কেউ কেউ এদের মন্ত্রী বলে অভিহিত করেছেন। তবে প্রশাসনে শেরশাহের নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকরা এদের মন্ত্রী না বলে আমাত্য বা সচিব বলাই অধিক যুক্তিসংগত মনে করেন। এই চারজন হলেন দেওয়ান-ই-ওয়াজিরাত, দেওয়ান-ই-আরজ দেওয়ান-ই-রিসালত এবং দেওয়ান-ই-শনশা। এরা যথাক্রমে অর্থ, সেনাবাহিনী, কুটনীতিক সম্পর্ক এবং সরকারি দলিল রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসাবিদার কাজ পরিচালনা করতেন। এছাড়া কম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী দপ্তর হিসেবে ছিল দেওয়ান-ই-কাজা, দেওয়ান-ই-বারিদ দপ্তর। প্রথমটি বিচারবিভাগ এবং দ্বিতীয়টি গুপ্তচর-বিভাগের কাজ পরিচালনা করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সকল পদাধিকারী স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। বস্তুত, রাজার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হিসেবে এঁরা রাজ-নির্দেশকে দপ্তর অনুযায়ী কার্য্যকরী করতেন। শেরশাহ নিজেই প্রতিটি বিষয়ে খোঁজখবর এবং সিদ্ধান্ত নিতেন। এজন্য দৈনিক ১২-১৪ ঘন্টা কাজ করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না।

৭.৪.২ বিচার সংস্কার

শেরশাহের বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল ন্যায় ও সাম্য। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি আত্মীয়-পরিজন, অভিজাত বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাথে সাধারণ নাগরিকের কোন প্রভেদ রাখতেন না। সম-অপরাধে সম দণ্ড ছিল তাঁর নীতি। সুতলতান স্বয়ং আপিল বিচার নিষ্পত্তি করতেন। তাঁর পরেই ছিল প্রধান কাজির স্থান। প্রধান কাজি আপিল বিচার নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিচার পর্বের তত্ত্বাবধান করতেন। ফৌজদারি মামলা ও দেওয়ানি মামলা যথাক্রমে সিকদার

ও মুনসেফ নিষ্পত্তি করতেন। পরগণার রাজস্ব-সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি করতেন আমিন। সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রজাদের ধন-সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শেরশাহ প্রধান সিকদার ও সিকদারদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। গ্রামে গ্রাম-পঞ্চায়েত এবং গ্রাম-প্রধান এই দায়িত্ব পালন করতেন।

৭.৪.৩ পরিবহন সংস্কার

ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে সম্ভবত শেরশাহ ব্যাপক যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রথম উদ্যোগ নেন। সামরিক-বাহিনীর দ্রুত চলাচল, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার, গুপ্তচরদের দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান প্রভৃতি একাধিক উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে শেরশাহ সারা দেশব্যাপী রাস্তা-নির্মাণ কর্মসূচি নেন। তাঁর আমলে নির্মিত চারটি সুদীর্ঘ রাস্তা ছিল অন্যতম। এছাড়া রাস্তার পাশে সরাইখানা, ডাকচৌকি ইত্যাদি তিনি নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন।

৭.৪.৪ রাজস্ব সংস্কার

ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের কাজে শেরশাহ বিশেষ আন্তরিকতা ও কৃতিত্ব দেখান। সাসারামে পৈত্রিক জায়গিরের পরিচালক হিসেবে তিনি ভূমি-রাজস্ব প্রশাসন ও কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ভারতের শাসক হিসেবে তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তিনটি মূল লক্ষ্য সামনে রেখে শেরশাহ তাঁর ভূমি-রাজস্ব কর্মসূচি গড়ে তোলেন। এই তিনটি লক্ষ্য হলো — (১) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা, (২) কৃষকদের অবস্থা স্বচ্ছল করা এবং (৩) ভূমি-রাজস্ব খাতে সরকারি আয় বৃদ্ধি করা। এজন্য প্রথমে তিনি আবাদযোগ্য সমস্ত জমি জরিপ করার সিদ্ধান্ত নেন। অমিন, কানুনগো, পাটোয়ারি, মুকদ্দম প্রমুখ রাজস্ব কর্মচারীদের উপর আবাদি জমির সঠিক মাপ ও ভূখণ্ডের উপর কৃষকদের সঠিক অধিকার নির্ধারণের দায়িত্ব দেন।

দিল্লী-সুলতানরা কেউ কেউ (যেমন, আলাউদ্দিন ও মহম্মদ তুঘলক) রাজস্ব আদায়ের জন্য জমি জরিপ করাতেন। কিন্তু শেরশাহই প্রথম সমগ্র রাজ্যের ভূমি জরিপ করিয়ে প্রজাদেরকে পাট্টা দান করেন। প্রজারাও সরকারকে কবুলিয়ত লিখে দিত। পাট্টাতে প্রজাদের জমির বিবরণ এবং খাজনার হার লেখা থাকত আর কবুলিয়তে প্রজারা সরকার নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেওয়ার অঙ্গীকার লিখে দিত।

আপনারা ইতিমধ্যেই শেরশাহের সামরিক সংস্কার সম্বন্ধে জেনেছেন। দিল্লীর মসনদে বসার আগে শেরশাহ যে প্রথায় সৈন্যবাহিনী গঠন করতেন, সেই প্রথার পরে বহাল থাকে। এ লুঠপাট থেকে আর সম্পদ না এলেও ভূমিরাজস্বের দরুন নিয়মিত বিপুল অর্থ রাজকোষে জমা হতে থাকে। ফলে নগদ মাইনে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকে অনুগত, দক্ষ সৈন্য নির্বাচন করতে শেরশাহের অসুবিধা হয়নি।

সবশেষে আপনারা শেরশাহের আর্থিক সংস্কার সম্পর্কে জানুন। শেরশাহ-এর সময়ে সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা ''রুপেয়া''-ই প্রধান মুদ্রা হিসাবে গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে টাঁকশাল স্থাপন করে নির্দিষ্ট ওজনের মুদ্রা তৈরি করা হত। সাধারণ লোকও 'ফি' দিয়ে (charge) তাদের সোনা-রূপা (bullion) মুদ্রায় পরিণত করতে পারত। 'ফি' মারফৎ সরকারের নিয়মিত আয় হত। নির্দিষ্ট ওজনের মুদ্রা ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল। আকবরের সময়েও ''রূপোয়া'' প্রধান মুদ্রা হিসাবে চলে থাকে। শেরশাহ যেখানে সেখানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর আদায় বন্ধ করেন। কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকা পার হওয়ার সময় শুল্ক সংগ্রহ করা হত।

সাময়িক প্রয়োজনে শেরশাহ যে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অসীম। আপনারা সকলেই

জানেন শেরশাহ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁ বন্দর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সুদীর্ঘ নির্মাণ করেছিলেন, যা এখন গ্র্যাণ্ড ট্যাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। এছাড়াও আগ্রা থেকে দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুর পর্যন্ত, আগ্রা থেকে যোধপুর হয়ে চিতোর পর্যন্ত এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে পুরানো রাস্তা মেরামত বা প্রশস্ত করা হয়। রাস্তার ধারে নিয়মিত দূরত্বের ব্যবধানে শেরশাহ ১৭০০ সরাই নির্মাণ করেছিলেন। সরাইগুলিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের থাকার পৃথক ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক সরাই-এর পাশে বাজার বসত এবং এখানে দেশি-বিদেশি বণিকরা কেনা-বেচা করত। সরাইগুলি পোষ্ট-অফিসের মতো ছিল এবং গুপ্তচরেরা এখান থেকে রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাস্তাগুলি নির্মিত হওয়ায় গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের সঙ্গে মুলতান হয়ে কাবুল-কান্দাহার ও মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্য সুগম হয়। বঙ্গদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এতদিন জলপথে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বেশি হত। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় বঙ্গদেশের বিপুল সঞ্চিত সম্পদ উত্তর ভারতের কাছে উন্মুক্ত হয়। এই জন্যই মুঘল সম্রাটরা বঙ্গ দেশকে সব সময় করায়ত্ত রাখতে চেষ্টা করতেন।

শেরশাহ-এর শাসন-সংস্কার, রাজস্ব-সংস্কার, মুদ্রাসংস্কার, হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমভাব নীতি ইত্যাদি অনুসরণ করে মুঘল সম্রাটরা ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন।

৭.৫ উপসংহার

সুলতানি শাসনে প্রথম থেকেই উত্তরাধিকারের সুষ্ঠু নিয়মের অভাব এবং সুলতান ও অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার বন্টনের সমস্যা রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া প্রথম থেকেই দিল্লী সুলতানিকে মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হত। ফিরোজ তুঘলকের সময় সেনাবাহিনীর লোকেদের এবং উচ্চ রাজ-কর্মচারীদের উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব ও পদ ভোগ করার অধিকার দেওয়ায় শাসনব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তুঘলক রাজত্বের শেষের দিকে তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ সাম্রাজ্যে বড় ধরনের ভাঙন সৃষ্টি করে। ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে মুঘল আক্রমণ সুলতানি শাসনের অবসান ঘটায়।

তুর্কিস্তানের ফরগণা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বাবর কাবুল অধিকার করেন। ফরগণার লোকেরা নিজেদের মুঘল বলত। কাবুল থেকে বাবরের নজর ছিল ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। তাঁর কাছে সুবর্ণ সুযোগ আসে যখন বিক্ষুব্ধ আফগান নেতারা তাঁকে দিল্লী আক্রমণের আহ্বান জানায়। বাবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ভারত আক্রমণ করেন এবং পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী-আগ্রা দখল করেন। ভারতে মুঘল অধিকার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হয়নি। ১৫২৬ সলে থেকে ১৫৫৬ সাল পর্যন্ত মুঘল-আফগান ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। বাবরের পুত্র হুমায়ুন ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে আফগান নেতা শেরশাহের কাছে পরাজিত হয়ে সিংহাসন হারান। শেরশাহ দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শেরশাহ খুব অল্পদিন (১৫৪০-১৫৪৫ সাল) রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই অল্পসময়েই নানাবিধ শাসন-সংস্কার করে স্থায়ী কীর্তি রেখে গিয়েছেন। শেরশাহের পুত্র ইসলাম শুরের মৃত্যুর পর (১৫৫৪ খ্রী:) আফগান নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হুমায়ুন তখন কাবুলে। সুযোগ বুঝেই তিনি আফগান সম্রাট আদিল শূরকে সিরহিন্দ-এর যুদ্ধে পরাজিত করে (১৫৫৫ খ্রি) দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। হুমায়ুনের আকস্মাৎ মৃত্যুর পর (১৫৫৬ খ্রি) পুত্র আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ, আদিল শূরের হিন্দু সেনাপতি হিমুকে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রিঃ) পরাজিত ও নিহত করে ভারতে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

৭.৬ প্রশ্নাবলী

১. দিল্লী দখলকে কেন্দ্র করে মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের বিবরণ দিন।

২. শাসক হিসেবে শেরশাহের মূল্যায়ন করুন।

৩. শেরশাহের সংস্কার কর্মসূচি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৪. আপনি কি মনে করেন যে শেরশাহ মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম সফল চরিত্র?

৭.৭ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989.

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750,* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000 -1765,* UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest. War, Environment, and Empire in Mughal North India*, Oxford, 2019.

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

পর্যায় : ৩ □ আকবরের অধীনে মুঘল শাসনের সুপ্রতিষ্ঠা/সুদৃঢ়করণ

একক : ৮ □ সামরিক অভিযান সমূহ এবং জয়ের ধারা: যুদ্ধকৌশল এবং প্রযুক্তি

গঠন

৮.০ **উদ্দেশ্য**

৮.১ **ভূমিকা**

৮.২ **আকবরের সিংহাসন লাভ**

৮.৩ **পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ**

৮.৪ **তত্ত্বাবধান থেকে ক্ষমতা সরাসরি নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করা**

৮.৫ **আকবরের রাজ্যবিস্তার ও তার প্রকৃতি**

৮.৬ **আকবরের রাজ্যবিস্তারের কৌশল**

৮.৭ **দক্ষিণ ভারত জয়ের নীতি**

৮.৮ **আকবেরর রাজপুত নীতি ও হিন্দু নীতি**

৮.৯ **উপসংহার**

৮.১০ **প্রশ্নাবলী**

৮.১১ **গ্রন্থপঞ্জি**

৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনার আকবরের

- সিংহাসন লাভের সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়ী কাঠামো ও বিস্তৃতি কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৮.১ ভূমিকা

এই এককটি থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় প্রজন্ম আকবর সম্পর্কে জানাতে পারা যায়। তিনি পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত আগ্রা ও দিল্লীর শিথিল রাজ্যখণ্ডকে এক বিশাল ভূখণ্ডে রূপান্তরিত করেছিলেন। তার বিস্তৃতি ছিল হিমালয় থেকে নর্মদা আর হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তরাঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্যের বেশকিছু অংশ। বাবর কিংবা হুমায়ুন মুঘল শাসনের কোনও স্থায়ী কাঠামো গড়ে তুলতে পারেননি। বহুবিধ সমস্যায় আকীর্ণ দুর্বল মুঘল সাম্রাজ্য আকবরের সুযোগ্য নেতৃত্বে এমনই রূপ ধারণ করে যার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল যুগ একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হতে পেরেছে।

৮.২ আকবরের সিংহাসন লাভ

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে পাঞ্জাবের কলানৌর নামক স্থানে আকবর সিংহাসনে বসেন। হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধু বৈরম খান বালক আকবরের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। আকবরের অভিষেক শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলেও দিল্লীর সিংহাসন সম্পূর্ণ নিষ্কন্টক ছিল না। ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং দিল্লী ও আগ্রার দুর্ভিক্ষ সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল; সর্বোপরি হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয়ে নানা দেশ ঘোরা এবং ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী অধিকারের এক বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর জন্য তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা ও শাসন ব্যবস্থাকে কোন সুসংবদ্ধ রূপ দিতে পারেননি। ফলে এই অবস্থায় বালক আকবরের সিংহাসন লাভ খুব সহজ ছিল না। সৌভাগ্যবশত তাঁর অবিভাবক বৈরাম খান একজন সুচতুর সেনানায়ক এবং অভিভাবক ছিলেন। অভিভাবকের সাহায্যে আকবর শুধু তাঁর সিংহাসন নিষ্কন্টক করলেন না, বরং উত্তোরোত্তর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। শ্রীঘ্রই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দূর হল এবং শান্তি স্থাপিত হল।

৮.৩ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

আকবরের নাবালকত্বের সুযোগে পুনরায় ভারতবর্ষে মুঘলবিরোধী শক্তিগুলি মাথা তুলে দাঁড়ায়। আফগানরা ছিল অন্যতম প্রধান বিরোধী শত্রুগোষ্ঠী, তাদের অন্যতম ছিলেন হিমু। হিমু দিল্লী অধিকারের পর আকবেরর অবস্থা সঙ্গিন হয়ে ওঠে। কিন্তু বৈরাম খানের সুযোগ্য নেতৃত্ব ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর পানিপথের যুদ্ধে হিমু পরাজিত হন। প্রথম পর্যায়ে হিমু অবশ্য মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে হিমু তীরবিদ্ধ হন। পরবর্তী পর্বে বৈরাম খাঁর নির্দেশে হিমুকে হত্যা করা হয়। ফলে আফগান বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুঘল শাসনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিমুর মৃত্যু মুঘলদের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বীর শেষ বলে গণ্য করা হয়। হিমুর মৃত্যুর পরে আফগানের নেতৃত্ব দিতে আর কেউ এগিয়ে আসতে পারেননি। অন্যান্য আফগান নেতারা যেমন সিকান্দার শাহ, আদিল শাহ এবং ইব্রাহিম শূর ক্রমে পরাজিত ও নিহত হন। ফলে আফগানদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আকবরকে আর তেমন কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। বাবর আফগানদের পরাস্ত করে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে যে মুঘল শাসনের সুত্রপাত করেছিলেন ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেই আফগান শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

৮.৪ তত্ত্বাবধান থেকে ক্ষমতা সরাসরি নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করা

১৫৫৬ থেকে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আকবরকে সাম্রাজ্য পরিচালনার সাহায্য করেন বৈরাম খাঁ। কিন্তু আকবর দীর্ঘদিন বৈরাম খাঁর নির্দেশে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না — যদিও হুমায়ুন ও তাঁর পরিবারের প্রতি বৈরাম খাঁর আনুগত্য ছিল সকল সন্দেহের উর্ধ্বে বৈরাম খাঁর সময়োচিত পরামর্শ আকবরকে সাম্রাজ্য শত্রুমুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে বৈরাম খাঁ ছিলেন স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত। প্রশাসনে তিনি সর্বেসর্বা হতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন আকবর শুধুমাত্র তাঁর অনুগত থাকবেন। স্বাভাবিকভাবেই বৈরাম খাঁ ও আকবরের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত শুরু হয়। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে এক 'ফরমান' বা রাজকীয় নির্দেশ জারী করে আকবার বৈরাম খাঁকে অভিভাবকত্বের পদ থেকে সরিয়ে দেন। বৈরাম খাঁ মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যাত্রাপথে জনৈক আফগান আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৫৬০ থেকে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আকবরের শাসনকালকে 'অন্তঃপুরিকার শাসনকাল' বলে অভিহিত করা

হয়। আকবরের ধাত্রীমাতা মহাম আনাঘা আকবরের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। প্রশাসনে মহাম অনাঘা ও তাঁর পুত্র আধম খাঁ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। স্বভাবতই আকবর পুনরায় এই চক্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হন। মহাম আনাঘাকে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিতে বাধ্য করেন এবং আধম খাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। অতঃপর আকবর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন।

৮.৫ আকবরের রাজ্যবিস্তার ও তার প্রকৃতি

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে যুদ্ধবিগ্রহ ও বিভিন্ন কৌশলে আকবর এক বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মুঘল শাসক, যিনি ভারতবর্ষে এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়বে না। অর্থাৎ সামরিক শক্তির ওপর আশ্রয় করে রাজ্যসীমা বিস্তার করলেও তার গঠন হয় সুদৃঢ় ও সুসংহত। এবং তার জন্য দরকার প্রজাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। এইখানেই ছিল আকবরের বিশেষত্ব। তিনি একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আরো একজন দুরদর্শী বাস্তবমুখী চরিত্রের সন্ধান পাই। ফলে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুঘল শাসন গড়ে তুলতে হলে, তার জন্য প্রয়োজন ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সখ্যতা, সহযোগিতা ও বিশ্বাস। আকবর এই লক্ষ্যে অনেকটাই অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। এটাই তাঁর চরম কৃতিত্ব; আর তার ফলে ভারতবর্ষে এমন এক প্রশাসন গড়ে উঠল যার ব্যাপ্তি ছিল কমবেশি তিনশ বছর। শুধু তাই নয় — এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমাজের বিভিন্ন স্তরে পারস্পরিক লেনদেনে গভীরভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তার ফলে মধ্যযুগে ভারতবর্ষে একটি মিশ্র শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে।

৮.৬ আকবরের রাজ্যবিস্তারের কৌশল

ভারতে আকবরের রাজ্যবিস্তার নীতির মূল সূত্র ছিল চারটি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে পারস্পরিক বিবাদমান রাজ্যগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র যথাযোগ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া আকবরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আকবর তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতাকে প্রশাসনের মূল নীতি করেছিলেন। অন্যথায় হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত ভারতে কোনও একক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যে সম্ভব নয় সে কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

আকবর তাঁর শাসক জীবনের প্রাথমিক পর্বে আজমীর, গোয়ালিয়র, লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আফগানদের উচ্ছেদ করে নিজের আধিপত্যাধীনে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি মালব দখল করেন। এরপর আকবর মধ্যভারতের গন্ডোয়ানা রাজ্যে তার ক্ষমতা বিস্তার করেন। গন্ডোয়ানা ও মালব অধিকারে আকবরের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রটিই ছিল প্রবল। সম্ভবত এই দুই রাজ্যের অর্থসম্পদ আকবরকে রাজ্য দুটি অধিকারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নচেৎ মালব বা গন্ডোয়ানার সাথে মুঘল রাজশক্তির কোন বিরোধ ছিল না।

রাজপুতানা সম্পর্কে আকবরের রাজ্যবিস্তার নীতিতে প্রগতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি সাম্রাজ্য গঠনের জন্য রাজপুতদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। যেখানে তাদের মধ্যে যারা আনুগত্য স্বীকার করেননি একমাত্র আকবর সেখানে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। উপরন্তু পরাজিত রাজার আনুগত্য লাভের পর তাঁকে নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অম্বরের রাজা বিহারীমল আকবরের আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। উপরন্তু বিহারীমালের কন্যা মনিবাঈ আকবরের প্রধানা মহিষী হন।

মেবারের সঙ্গে আকবরের সংগ্রাম সুদীর্ঘকাল চলে। হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় আকবরকে অবশেষে মেবার লাভ করতে সাহায্য করে। রণথম্ভোর, যোধপুর, বিকানীর এবং জয়সলমীরও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তবে প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ পুনরায় আকবরের বিরোধিতা শুরু করেন। আকবর অমর সিংহের বিরুদ্ধে মেবার আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবে হয়ে ওঠেনি।

রাজপুতনার পরে আকবর গুজরাট ও বঙ্গদেশ বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ইতিপূর্বে হুমায়ুন গুজরাট আক্রমণ ও জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ বিজয় ছিল সাময়িক। তাঁর মৃত্যুর পর গুজরাট পুনরায় বিভিন্ন কারণে মুঘল শাসন নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসে। সম্ভবত ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আকবর গুজরাট সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গুজরাটের সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে প্রভৃতি বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলির বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অথচ সেই সময়ের গুজরাটের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আকবরকে গুজরাট জয়ে কিছুটা উৎসাহিত করেছিল। সেখানকার শাসক তৃতীয় মুজফ্‌ফর শাহ ছিলেন অযোগ্য এবং অপদার্থ। ফলে গুজরাটের 'মির্জা' অভিজাতরা অনেকটা গুজরাটের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। আকবর এই পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার উদ্যোগী হন। অরাজকতায় পূর্ণ এই সমৃদ্ধশালী প্রদেশটি অধিকার করে রাজ্যসীমা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও তিনি বিবেচনা করেছিলেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর অনায়াসে মুজফ্‌ফর শাহ'র আনুগত্য লাভ করেন। কিন্তু 'মির্জা' অভিজাতরা এতো সহজে আকবরের বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পুরনায় আকবর গুজরাট আসেন এবং গুজরাটকে সরাসরি মুঘল সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে একটি পৃথক সুবায় পরিণত করেন।

গুজরাট অভিযান আকবরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গুজরাট মুঘল সুবায় পরিণত হওয়ার ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ মুঘলদের হাতে চলে আসে। ফলে মুঘল অর্থনীতি আরও মজবুত হয়ে উঠেছিল। আরব সাগরে পর্তুগিজদের আনাগোনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল। আকবর তাদের মুখোমুখি হন। উপরন্তু গুজরাট বিজয়ের ফলে তার মধ্যে দিয়ে দাক্ষিণাত্য অভিযানের সহজতম পথটি গড়ে উঠে।

গুজরাট বিজয়ের পর আকবর বাংলার আফগান শাসক দাউদ কররাণীর বিদ্রোহ দমন করতে প্রস্তুত হন। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে তুকরাই বা তুর্কার যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হয়ে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু পুনরায় তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দেন। অতঃপর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে অকবরের নির্দেশে মুজফ্‌ফর খান, খান-ই-জাহান ও টোডরমল দাউদকে পরাজিত ও নিহত করেন।

দাউদের মৃত্যু বাংলাদেশের সুদীর্ঘকালের সুলতানি শাসনের অবসান ঘটায়। আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও আকবর কখনই এখানে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কারণ বাংলার বারো ভুঁইয়ারা সহজে আকবরের কাছে নতিস্বীকার করতে চাননি। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরের আমলেও বারো ভুঁইয়ারা নিজ নিজ এলাকায় ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। তবে আকবর যথেষ্ট পরিশ্রম করে তাঁদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন।

গুজরাট ও বাংলা জয়ের পর আকবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজ্যবিস্তারে নজর দেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক চিত্রটি এই সময়ে অত্যন্ত অস্থির ছিল। একজন মুঘল হিসাবে কাবুলের ওপর তাঁর দুর্বলতা ছিল। উপরন্তু আকবরের বৈমাত্রের ভাই মীর্জা হাকিম এবং সেখানকার গোঁড়া মুসলমানরা আকবরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তবে মীর্জা হাকিমের জীবদ্দশায় আকবর কাবুল অধিকার করেননি। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে মীর্জা হাকিমের মৃত্যুর পর আকবর আনুষ্ঠানিকভাবে কাবুল দখল করেন।

কাশ্মীরের শাসক ইউসুফ শাহ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতেন। এই কারণে রাজপুতনার অম্বরের রাজা ভগবান দাসের নেতৃত্বে আকবর কাশ্মীরে অভিযান পাঠান। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ইত্যবসরে সিন্ধুপ্রদেশেও মুঘল নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সিন্ধুপ্রদেশের গুরুত্ব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার দিক দিয়ে ছিল অসীম। এর ফলে কান্দাহার সহজেই আকবরের অধীনে চলে আসে। কান্দাহারের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়া ও পারস্যের সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বিদ্রোহী উজবেগ-উপজাতিরাও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

৮.৭ দক্ষিণ ভারত জয়ের নীতি

আকবরের দক্ষিণ ভারত অভিযান তাঁর ভারতবর্ষব্যাপী অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনের অভিলাষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত ছিল। তাঁর দক্ষিণভারত অভিযান বিশ্লেষণ করলে সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও কিছু প্রগতিমূলক চিন্তাধারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তালিকোটা যুদ্ধের পর থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে চরম অব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, সর্বক্ষেত্রে এখানকার রাজ্যগুলি পারস্পরিক কলহ ও অন্তর্দন্দ্বে লিপ্ত থেকে নিজেদের ধ্বংস করে চলেছিল। এই অবসরে আরব সাগরে পর্তুগিজদের প্রাধান্য ও ঔদ্ধত্য বেড়ে চলে। আরব সাগরের ভারতীয় বণিক ও মক্কাগামী তীর্থযাত্রীদের ওপর পর্তুগিজদের উৎপীড়নের সীমা ছিল না। দক্ষিণী রাজ্যগুলি পর্তুগিজদের এই ঔদ্ধত্য দমনে ব্যর্থ হয়। কারণ দক্ষিণ ভারত তখন দক্ষিণী ও পরদেশী এবং আফাকি এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিরোধে জর্জরিত। শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বও তখন দক্ষিণকে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি এনে ফেলেছিলেন। এই সুযোগে গোয়া পর্তুগিজদের দখলে চলে আসে। এমতাবস্থায় আকবর নিশ্চয় সাম্রাজ্যবাদের আকাঙ্ক্ষায় দাক্ষিণাত্য অভিযানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। দক্ষিণের ধর্মীয় বিভেদ বা জাতিগত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব উত্তর ভারতকে স্পর্শ করতে পারার সংশয় সম্ভবত আকবরের মধ্যে কাজ করেছিল। স্বাভাবতই প্রগতিশীল আকবর এই ধরনের সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। উপরন্তু ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজদের আধিপত্য মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতির পক্ষেও বিপজ্জনক। কাজেই তাদের দমন করতে হলে দক্ষিণ ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা আশু কর্তব্য ছিল। ফলে দাক্ষিণাত্য অভিযান আকবরের পক্ষে জরুরি ছিল।

বাহমনি সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর যে পাঁচটি সুলতানি রাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে উল্লেখযোগ্য ছিল — বিজাপুর, গোলকুন্ডা, আহম্মদনগর ও খান্দেশ। আকবর প্রথমেই এই রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করতে চাননি। এদের সহযোগিতাই তাঁর কাম্য ছিল। কিন্তু খান্দেশ ব্যতীত আর কোনও রাজ্য আকবরের মৈত্রী আহ্বানে সাড়া দেননি।

এই সময়ে আহম্মদনগর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার সুযোগে আকবর দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসেন। আহম্মদনগরের শাসক বুরহান নিজাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভগ্নী ও বিজাপুরের আদিল শাহ'র বিধবা পত্নী চাঁদবিবির নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারে রাজি হননি। মুঘলদের সঙ্গে সংগ্রামে চাঁদবিবি জয়ী হন এবং ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে এক সন্ধিতে মুঘলরা বাহাদুর শাহকে আহম্মদনগরের সুলতান হিসাবে মেনে নেন ও পরিবর্তে চাঁদবিবি মুঘলদের অনুগত্য স্বীকার করেন। সন্ধির শর্ত হিসাবে বেরার প্রদেশটি আহম্মদনগর মুঘলদের দিয়ে দেয়। কিন্তু অভিজাতদের একাংশ এ সন্ধি মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাঁরা চাঁদবিবিকে ক্ষমতাচ্যুত করে মুঘলদের বিরোধিতা করে এবং বেরার থেকে মুঘলদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৫৯৭

খ্রিস্টাব্দে অস্তির যুদ্ধে মুঘল বাহিনী আহম্মদনগরকে পরাস্ত করে। তবে এই যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে আকবরের প্রাধান্য বিশেষ বিস্তৃত করতে পারেনি। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের আগে, অর্থাৎ চাঁদবিবি নিহত হওয়ার পর মুঘলরা আহম্মদনগরের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বিজাপুর ও গোলকোন্ডা এরপর আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে খান্দেশের অন্তর্গত দুর্ভেদ্য আসিরগড় দুর্গটি দখল করে আকবর তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযান সমাপ্ত করেন। অনুমান করা হয় আকবর সরাসরি এই দুর্গ দখল করতে অসমর্থ হওয়ায়, কিছুটা শঠতার আশ্রয় নিয়ে আসিরগড় দুর্গ দখল করেন।

আকবর দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্যগুলি জয় করেছিলেন, তার ফলে মুঘল সীমানা দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তবে আকবর দক্ষিণ ভারতে তাঁর অধিকারকে বিশেষ সুদৃঢ় করে যেতে পারেননি। দক্ষিণ ভারত থেকে দিল্লীর অবস্থান ছিল বহুদূরে। কাজেই দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় কর্মচারীদের আনুগত্য লাভ করা মুঘল সম্রাটের পক্ষে অসম্ভব ব্যপার ছিল বলা যেতে পারে। তাছাড়া দাক্ষিণাত্য অভিযান সুদৃঢ় করার পর্যাপ্ত সময় আকবর পাননি। আসিরগড় দুর্গ জয়ের কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

৮.৮ আকবরের রাজপুত নীতি ও হিন্দু নীতি

আকবর সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন এ কথা যেমন সত্য, তেমনই এটা অনস্বীকার্য্য যে নিছক বাহুবলে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। আকবরের বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞা তাঁকে উপলব্ধি করিয়েছিল যে ভারতবর্ষে মুঘলদের স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হলে হিন্দু তথা রাজপুতদের সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট ভাবনাচিন্তা করা প্রয়োজন। আকবর বুঝতে পেরেছিলেন যে, এককভাবে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন ও বাহুবলের ওপর নির্ভর করে হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কোনও সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায় না। তাই হিন্দু এবং রাজপুতদের সম্পর্কে আকবরের পদক্ষেপ ছিল উদার এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ। একজন যথার্থ সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে আকবরের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বোধহয় এইখানে।

আকবর সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে সব বিরোধিতা, চক্রান্ত ও অবিশ্বস্ততার পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। ফলে ভারতবর্ষের হিন্দু জনগোষ্ঠীর সহায়তা লাভের কথা তাঁকে চিন্তা করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছিল আকবরের হিন্দুনীতি তথা রাজপুতনীতি।

আকবর রাজপুতদের মৈত্রীলাভের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমত, রাজপুত পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। অম্বরের রাণা বিহারীমলের কন্যা মনিবাঈকে আকবর বিবাহ করেন। বিকানীর ও জয়পুরের সাথেও আকবরের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আকবর তাঁর পুত্র সেলিমের সাথে উদয় সিংহের কন্যা যোধাবাঈয়ের বিবাহ দেন। ফলে যোধপুরের সাথেও আকবরের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আকবরের পূর্বেও মুসলমান শাসকের সাথে রাজপুত পরিবারের বিবাহ সম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়। কিন্তু এই ধরনের বিবাহের পশ্চাতে কোনও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কাজ করেনি। ফলে ভারতের রাজনীতিতে তার কোন স্থায়ী প্রভাবও পড়েনি। কিন্তু আকবরের রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক নীতি গড়ে তোলার পশ্চাতে সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা ছিল। ফলে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়েছিল। বিবাহের ফলে রাজপুত রাণাদের সখ্যতা ছাড়াও আকবর লাভ করেছিলেন মানসিংহ, বিহারীমল, টোডরমলের মতো দক্ষ রাজপুত রাজকর্মচারী যাঁদের অনলস পরিশ্রমের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমে এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

সকল রাজপুত রাজারা যে নিঃশর্তভাবে আকবরের অনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল এ কথা বলা যায় না। তাদের কারুর কারুর বিরুদ্ধে আকবরকে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। মালব, রণথম্ভোর, বিকানীর এবং জয়সলমীরের বিরুদ্ধে আকবরকে যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু আকবর যুদ্ধ করলেও পরাজিত রাজাদের সঙ্গে কখনও অসম্মানজনক ব্যবহার করেননি। তাদের ব্যক্তিগত ধর্মেও তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। ফলে রাজপুতরা পরাজিত হলেও তাঁরা আকবরের উদার ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহারে অনুগত হয়ে পড়েন। এইসব অনুগত রাজারা আকবরের কাছ থেকে বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে নিজ নিজ রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি রাজপুত রাণাদের এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন যা এতদিন পর্যন্ত একচেটিয়াভাবে কেবলমাত্র মুসলিম অভিজাতরাই ভোগ করত। উদাহরণস্বরূপ অম্বরের ভগবান দাসকে লাহোরের যুগ্ম শাসকরূপে নিযুক্ত করা হয়। মানসিংহ প্রথমে কাবুল এবং পরে বাংলা-বিহারের দায়িত্বে আসেন। অন্যান্য সুদক্ষ রাজপুত কর্মচারীদের ওপর গুজরাট, আজমীর, আগ্রা প্রভৃতি প্রদেশের প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এমনকি তাদের বংশগত জায়গির ছাড়াও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জায়গিরদারি লাভ করার ফলে রাজপুতদের অর্থ ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা সমকালীন মুঘল অভিজাতদের থেকে প্রতিপত্তি ও মর্যাদায় কোন অংশে কম ছিলেন না। এইভাবে মুঘল রাজনীতিতে রাজপুতদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গড়ে ওঠে।

একমাত্র মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ ব্যতিরেকে সমগ্র রাজপুতানা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ সিংহ মুঘলদের কাছে পরাজিত হন। প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমর সিংহ আকবরের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যান। রাজপুত নীতির বন্ধনে আকবর মেবারকে আবদ্ধ করতে অসমর্থ হন।

প্রকৃতপক্ষে আকবরের রাজপুতনীতি এবং হিন্দুনীতির মূল কথা ছিল বিজেতা ও বিজিতের সম অধিকার। তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে 'জিজিয়া' কর তুলে দেন। আকবর এই কর রহিত করে প্রমাণ করেন যে ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই। হিন্দু যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস করার প্রথা আকবর নিষিদ্ধ করেন এবং হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করাও আকবর পছন্দ করতেন না। এইভাবে আকবর মধ্যযুগে একটি সমদর্শী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে হিন্দু সমাজ আকবরের অনুগত হয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার ভিত্তিতে সাম্রাজ্য গড়ে তোলায় আকবর একজন জাতীয় সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

আকবর যে শুধু হিন্দু রাজনীতিক ও সৈনিকদের উচ্চ মর্যাদা দিতেন তা নয়, তিনি হিন্দু কবি, পণ্ডিত, গায়ক, চিত্রকর ইত্যাদি সকল রকমের প্রতিভার যোগ্য মর্যাদা দিতেন। আকবর হিন্দু-মুসলমান এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ তুলে দিয়ে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

৮.৯ উপসংহার

আকবর শুধু মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে নয়, সামগ্রিক ভাবে ভারতের ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। একদিকে তিনি ছিলেন এই বিস্তীর্ণ উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর তৈরি করা রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-সামরিক কাঠামো ১৭০৭ সাল পর্যন্ত নিরঙ্কুশ ভাবে টিকে ছিল। সামরিক বিজয় আকবরের খুব বড়ো কৃতিত্ব ছিল, কিন্তু তার চাইতে অনেক বড়ো কৃতিত্ব ছিল ভারতের বৈচিত্রকে অনুধাবন করা। ভারতবর্ষ যে অনুপম বৈচিত্রে ভরা এক ভূখণ্ড তা মধ্যযুগে আকবরের থেকে কেউ ভালো করে বুঝতে পারেননি। যুগের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে যতদূর সম্ভব এক সমদর্শী নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য আকবর ইতিহাসে সমাদৃত।

৮.১০ প্রশ্নাবলী

১. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকে আকবর কীভাবে নিজেকে ক্ষমতার প্রকৃত কেন্দ্রে পরিণত করেন?

২. আকবরের সময়কালে মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের পরিচয় দিন।

৩. আকবরের দক্ষিণ ভারত অভিযান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৪. আকবর কীভাবে গুজরাটে মুঘল আধিপত্য স্থাপন করেন?

৫. আকবরের সময় মুঘলদের বাংলা অভিযান সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৬. আকবরের হিন্দু ও রাজপুত নীতি বিশ্লেষণ করুন।

৮.১১ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989.

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750,* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000 -1765.* UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest. War, Environment, and Empire in Mughal North India*, Oxford, 2019.

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

একক : ৯ □ প্রশাসনিক বিধি সমূহের বিবর্তন: জাবতি, মনসব, জায়গির এবং মাদাদ-ই-মাস

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ ভূমিকা

৯.২ প্রশাসনিক সংস্কার

৯.২.১ ভূমি-রাজস্ব নীতি

৯.২.২ মনসবদারি নীতি

৯.২.৩ জায়গিরদারি প্রথা

৯.২.৩.১ তনখা জায়গির

৯.২.৩.২ ওয়াতন জায়গির

৯.৩ মাদাদ-ই-মাস

৯.৪ জমিদার

৯.৫ উপসংহার

৯.৬ প্রশ্নাবলী

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনারা মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতিতে আকবরের পদক্ষেপগুলি বিশেষ করে

- জাবতি প্রথা ও মনসবদারি প্রথার প্রচলন ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন।
- জায়গিরদারি ও জমিদারি প্রথার সম্পর্কে জানবেন।
- মাদাদ-ই-মাস সম্পর্কে অবহিত হবেন।

৯.১ ভূমিকা

মুঘল সম্রাট হিসাবে আকবরই সর্বপ্রথম শাসন-ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করেন এবং তাঁর অর্দশতাব্দীর রাজত্বকালে তিনি শাসন-ব্যবস্থাকে পূর্ণ রূপ দেন। এই শাসন-ব্যবস্থা শুধু তরবারি বা জোরজবরদস্তিমূলক ছিল না, বরং সকল শ্রেণির লোকের সহযোগিতার উপর নির্ভর করত। শাসন-ব্যবস্থায় সম্রাট সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

৯.২ প্রশাসনিক সংস্কার

প্রশাসন বলতে এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান বোঝায় যার মাধ্যমে রাষ্ট্র কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে

পৌঁছতে চেষ্টা করে। ইংরেজ ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড আকবরের শাসন ব্যবস্থাকে একান্তভাবে বাস্তব বলে মনে করেন। আকবর নিজেই এই শাসন-ব্যবস্থার জন্মদাতা, উজীররাও তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। সম্রাটের নীচে ভকিল ছিলেন সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। তারপর দিওয়ান, বখশী, কাজী, দারোগা ইত্যাদি ছিল।

৯.২.১ ভূমি-রাজস্ব নীতি

ভূমি-রাজস্ব বিভাগ ও নীতি সম্রাট আকবরের সময় সুষ্ঠু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে মুঘলদের আয়ের সূত্র ছিল — ভূমি রাজস্ব এবং বাণিজ্য শুল্ক। আকবরের প্রশাসনিক সংস্কারের মূল কাঠামো ছিল ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা। যদিও সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা তথা ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাতে শেরশাহের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তথাপি আকবরই প্রথম মুঘল সম্রাট যিনি ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে শেরশাহ প্রবর্তিত পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে রাজস্ব-ব্যবস্থাকে উন্নততর ও যুক্তগ্রাহ্য করে তোলার জন্য চেষ্টা করেন। প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেবার পরিবর্তে আকবর পরাজিত রাজাদের মর্যাদা ও স্বায়ত্বশাসনের অধিকার মেনে নিতেন। আবার তিনি রাষ্ট্রের সঙ্গে রায়তদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনেও উৎসাহী ছিলেন। অর্থাৎ রাজস্ব-ব্যবস্থার লাগাম সরাসরিভাবে সম্রাটের হাতে ছিল।

আকবরের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যের বিস্তার, সংহতি রক্ষা এবং নিরাপত্তাসাধন। জনকল্যাণের বিষয়টি-ও তিনি কখনও উপেক্ষা করেননি। রাজস্ব বিষয়ক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। আকবর যদিও শেরশাহকে অনুসরণ করেছিলেন, কারণ মুসলমান শাসকদের মধ্যে শেরশাহ সর্বপ্রথম রাজস্বনীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও শেরশাহ নীতিতে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। প্রথমত, দেয় রাজস্বকে নগদ মূল্যে রূপান্তরিত করতে অনেক সময় লাগতো। যার ফলে রাজকোষে অর্থাগম হতো দেরি করে। দ্বিতীয়ত, ফসলের পরিমাণ নগদ মূল্যে রূপান্তরিত করার সময়ে বাজারদর একটা সমস্যা ছিল। কারণ দেশের নানা অংশে বাজারদরের তারতম্য ছিল। উপরন্তু দিল্লীর বাজারদরের সঙ্গে দূরবর্তী অঞ্চলের বাজারদরের অনেক পার্থক্য ছিল। এছাড়া জমির যথার্থ মাপ এবং প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তির ব্যাপারটি বিবেচনা সাপেক্ষ ছিল।

আকবর প্রথমে বাৎসরিক রাজস্ব নিরুপণের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে দেওয়ান নিযুক্ত হন খাজা আব্দুল মজিদ। আকবর বিভিন্ন 'সরকার'-এর খালিসা জমির উৎপাদনের গড় নির্ধারণ করেন এবং তৎকালীন বাজার নিরীক্ষণ করে উৎপাদিত ফসলের ওপর বার্ষিক রাজস্ব বসান। এই কাজের জন্য তিনি কানুনগোদের নিযুক্ত করেন। এদের ওপর নিজ নিজ এলাকার জমির প্রকৃত উৎপাদন এবং ফসলে স্থানীয় বাজারদর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রকে ওয়াকিবহাল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ কানুনগোই নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। কাজেই আকবরের এই ব্যবস্থা ফলপ্রসু হতে পারেনি।

আকবরের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বৎসরে দেওয়ান নিযুক্ত হন মুজফ্‌ফর তুরাবর্তী। তুরাবর্তীর তত্ত্বাবধানে মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অনেকটা কার্যকরী হয়ে ওঠে। তিনি প্রথমে দশজন কানুনগোর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। স্থির হয় এই কমিটি সমগ্র দেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে উপযুক্ত কার্যবিধি জানিয়ে কেন্দ্রকে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেবেন। কিন্তু এখানেও সততার প্রশ্নটি আবার ঘুরে-ফিরে চলে আসে। বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত তথ্যের অভাবে আকবরের প্রচেষ্টা পুনরায় ব্যর্থ হয়।

১৫৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল রাজস্ব সম্পর্কে একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করেন। বাংলা, বিহার ও গুজরাট বাদ দিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যকে খালিসা জমিতে পরিণত করা হয় এবং জায়গির প্রথা তুলে দেওয়া হয়। ক্রোরি নামে একদল

রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীর ওপর ১৮২টি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়। টোডরমল আশা করেছিলেন, যে প্রতিটি পরগণা থেকে এক কোটি 'দাম' অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আদায় করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু ক্রোরিও ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে টোডরমল ক্রোরিদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বন্ধ করে দেন।

আকবরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় পরবর্তী পদক্ষেপ তাঁর বিখ্যাত 'দহশালা'র (Ten years assessment) প্রবর্তন। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণের ফসলের দশ বৎসরের গড় হিসাবে ধরা হতো। এবং আকবর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উৎপাদনের গড়ের এক-দশমাংশকে বাৎসরিক উৎপাদন হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তার এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হবে। সেই আমলে রাজস্ব আদায়ে ফসলের পরিবর্তে নগদ অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হতো বলে সরাসরি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা বাজার দরের গড়পরতা ভিত্তি অনুযায়ী ফসলের নগদ মূল্য নির্ধারণ করতেন। অকবর প্রবর্তিত 'দহশালা' ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অস্থায়ী তাই তাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হবে না। তবে আকবর প্রবর্তিত এ বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্ধারণ সরল করে দেওয়ার ফলে সরকার ও কৃষক উভয়পক্ষের সুবিধা হয়। যেটুকু জমি চাষ করা হতো তার ওপর রাজস্ব নির্ধারিত হতো বলে কৃষক সম্প্রদায়ের বিশেষ অসুবিধা হতো না। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সরকার থেকে কৃষকদের কর রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল।

আকবরের 'দহসালা' ব্যবস্থা মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার মূল কাঠামো হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল তাঁর রাজস্ব সংক্রান্ত নির্দেশনামা জারী করেন। একে বলা হতো 'দস্তুর-অলআমল'। এটিকে সাধারণ্যে টোডরমলের বন্দোবস্তও বলা হয়ে থাকে। টোডরমলের বন্দোবস্তের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল — (১) জমি জরিপ, (২) জমির গুণগত মান নির্ণয়, (৩) দেয় রাজস্ব পরিমাণ নির্ধারণের ব্যবস্থা করা। টোডরমলের রাজস্ব-সংক্রান্ত নির্ধারণ ব্যবস্থা জাবতপদ্ধতি নামে সমধিক পরিচিত। সম্ভবত জরি-এর সমার্থক জাবত শব্দটি থেকে জাবতি প্রথার প্রচলন। যার মূল ভিত্তি ছিল জমি জরিপ করা।

টোডরমল জমির উৎপাদন ও উর্বরতার ওপর ভিত্তি করে জমিকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন — পোলজ, পরৌতি, চাচর এবং বঞ্জর। যে জমিতে প্রতিবছর চাষ হত তাকে বলা হত পোলজ। মাঝে মাঝে যে জমি পতিত পড়ে থাকে তাকে বলা হতো পরৌতি। তিন বা চার বৎসর পতিত রাখা জমির নাম ছিল চাচর। যে জমিকে পাঁচ বৎসর বা আরো বেশি সময়ের জন্য ফেলে রাখতে হতো তাকে বলা হতো বঞ্জর। পোলজ ও পরৌতি শ্রেণিভুক্ত জমিকে আবার উর্বরতা অনুযায়ী উৎকৃষ্ট, ভালো, নিকৃষ্ট এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করে আনুমানিক উৎপাদনের গড় হিসাব করা হতো এবং তার এক-তৃতীয়াংশকে রাজস্ব হিসাবে ধরা হতো।

আকবরের সমকালীন রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে এক ধরণের রাজস্ব নীতি প্রচলিত ছিল না। টোডরমলের রাজপুত জাবত পদ্ধতি ব্যতীত সাম্রাজ্যে আর যে দু-ধরণের রাজস্ব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা হলো গাল্লা বখশী বা বাটাঈ অথবা ভাওলি, দ্বিতীয়টি হলো নসক। অনেকে মনে করেন কানকূত বা দানাবন্দী নসক ব্যবস্থাই ইঙ্গিত করে।

গাল্লা বখশী মূলত ফারসি শব্দ। ভারতবর্ষে ভাগচাষ অর্থে অব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে তিনভাবে উৎপাদন ও সরকারের প্রাপ্য স্থির করা হতো। (১) করার — দাদ পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার ও কৃষকের উপস্থিতিতে খামারে চুক্তি অনুযায়ী শস্য ভাগ করা হতো। (২) ক্ষেত — কাটাঈ ব্যবস্থায় শস্য কাটার আগেই শস্য ভাগ করে নেওয়া হতো। (৩) লাঙ্গা বটাঈ পদ্ধতি ছিল শস্য কাটার পর মাঠে স্তূপাকারে রাখা হতো এবং তারপর ভাগের ব্যবস্থা হতো। গাল্লা বখশী রাজস্ব আদয়ের যথাসম্ভব ন্যায্য পদ্ধতি বলা যেতে পারে। তবে এর উপযোগিতা নির্ভর করত সরাসরি রাজস্ব বিভাগের

কর্মচারীদের সততার উপর। এই পদ্ধতি সিন্ধু, কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর অঞ্চল প্রচলিত ছিল।

আকবরের আমলে প্রচিলত নসক পদ্ধতি সম্পর্কে সবিস্তারে কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিক ব্লখম্যানের মতে, নসক এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে রায়ত ও রাজস্ব আদায়কারীরা ভূমি রাজস্ব স্থির করে। মনে করা হয় যে, নসক বলতে পৃথক কোনও রাজস্ব পদ্ধতি বোঝায় না। বরং এটা কৃষক ও রাজস্ব সংগ্রহকারীদের রাজস্ব হিসাব করার একটি সরকার পদ্ধতি। বাংলা, কাথিয়াবাড় এবং গুজরাটের বেশকিছু অঞ্চলে নাসক পদ্ধতিরে প্রচলন ছিল।

কানকূত বা দানাবন্দী ব্যবস্থা বলে আর একটি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার কথা জানতে পারা যায়, যাকে অনেকেই মনে করেন নসক ব্যবস্থার অভিন্ন। এই ব্যবস্থায় দড়ি বা পা ফেলে জমি মাপ করা হতো। তারপর সেই অঞ্চলের উৎপাদনী ক্ষমতা থেকে বিচার-বিবেচানা করে রাজস্বের হার নির্ধারণ করা হতো। এই ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, রাজস্ব নগদ অর্থে দেওয়া আবশ্যক ছিল না। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে, কানকূত ব্যবস্থা অনেক দক্ষ ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। এতে প্রশাসনিক দুর্নীতির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল।

আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব-ত্রুটিহীন বলা যেতে পারে। আকবর চাষের জমি সম্প্রসারণের জন্য চাষীদের উৎসাহ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য মনে করেছিলেন। সরকারি উদ্যোগে সেচখাল খনন বা অন্যান্য সংস্কারের কার্যেও আকবর উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। আকবর এ কথাও বুঝেছিলেন যে চাপ সৃষ্টি করে কৃষকদের কাছ থেকে কিছু আদায় কার উচিত নয়। এর ফল ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো নয়। প্রয়োজনের সময়ে কৃষকদের তকাভী বা কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও আকবরের আমলে প্রচলিত হয়ছিল। সম্ভবত এই ঋণের জন্য কোনও সুদ দিতে হতো না। যে জমিতে নতুন চাষ করা হতো সেখানে আকবরের নির্দেশে প্রচলিত হারের চেয়ে কম রাজস্ব আদায় করা হতো। জমিতে ভোগ্য শস্যের (ধান, বাজরা, গম) পরিবর্তে অর্থকরী শস্যের উৎপাদন হলে, যেমন — তুলো, পাট, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কম হারে রাজস্ব নেওয়ার রীতি ছিল। ঋণ মকুব করে দেওয়ার কথাও জানতে পারা যায়। অর্থাৎ আকবরের রাজস্ব নীতিতে প্রয়োজনের তাগিদ থাকলেও তার জনকল্যাণমুখী দিকটিকে অস্বীকার করা যায় না। অনেকের মতে, আকবরের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি-রাজস্ব আদায় একটু বেশি ছিল। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, তিনি জিজিয়া, জাকাত, তীর্থকর এবং অন্যান্য বহু ধরণের শুল্ক রদ করে সাধারণ লোককে স্বস্তি দিয়েছিলেন। রাজস্ব ব্যতিরেকে অন্যান্য অতিরিক্ত কর আদায় যাতে না হয় তার প্রতি তিনি যত্নবান ছিলেন। সার্বিকভাবে প্রাক-ব্রিটিশ যুগে আকবরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট আধুনিক ও কার্যকরী ছিল বলা যেতে পারে।

৯.২.২ মনসবদারি নীতি

স্থিতিশীল আমলাতান্ত্রিক সরকার গঠন ব্যতীত আকবরের অপর একটি কীর্তি হল মনসবদারি সংগঠন। মুঘল রাজস্বকালে সামরিক ও বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল এই মনসবদারি প্রথা। এঁরাই ছিলেন মুঘল আমলের প্রধান শাসকগোষ্ঠী।

অনুমান করা হয় পারস্য দেশে মনসবদারি প্রথা বহু পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল। আকবর এই অনুকরণ করেছিলেন মাত্র। মুঘল প্রশাসনিক সংগঠনের মূল ভিত্তি ছিল সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। আকবরের পূর্বে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা বিশেষ হয়নি বললে চলে। উপরন্তু শেরশাহ প্রবর্তিত জায়গিরদারি প্রথাতেই কিছু কুফল দেখা গিয়েছিল। আমিররা বিশাল জায়গির লাভ করার ফলে এবং সামরিক প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ার সুবাদে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন। আমিররা দুর্নীতিগ্রস্থ ও অর্থলোভী হয়ে পড়েন। অথচ এদের ওপরেই সামরিক প্রয়োজনে সম্রাটকে

নির্ভর করতে হতো। যথেচ্ছভাবে জায়গির বিতরণ করার জন্য সরকারি খালিসা ভূমি কমে এসেছিল। রাজকোষে এর ফলে অর্থাগম কমতে থাকে। জায়গিরদাররা সাধারণত দক্ষ সৈন্য ও উন্নতমানের ঘোড়া রাখতেন না। ফলে যুদ্ধের সময়ে নিম্নমানের ঘোড়া ও অপদার্থ সৈন্য সম্রাটের প্রয়োজনে পাঠিয়ে রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া হতো। আকবর এই ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কাজেই সেনাবাহিনীকে এইসব ত্রুটি থেকে মুক্ত করে তিনি একটা সুদক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

'মনবস' শব্দটির অর্থ পদমর্যাদা। অধ্যাপক আতাহার আলি 'মনসব' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে 'মনসব' হল কোনও ব্যক্তির পদমর্যাদা এবং একই সঙ্গে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তি। মনসবদারি ব্যবস্থা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। অধ্যাপক কুরেশী বলেছেন যে, সামরিক ও বে-সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই 'মনসব' প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কাউকে সামরিক ও বে-সামরিক দু-ধরনের কাজেই দেখতে হতো আবার কেউ নির্দিষ্ট কোনও কাজের দায়িত্বে থাকতেন। কিন্তু মনসবদাররা কে কী ধরনের কাজ করবেন তা স্থির করতেন সম্রাট স্বয়ং। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ও বলেছেন যে, মনসবদারদের ক্ষেত্রে সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হতো এ কথা ঠিক নয়।

১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে আকবর তাঁর প্রিয় মীরবক্সী শাহবাজ খানের সাহায্যে মনসবদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা মীরবক্সী প্রস্তুত করে সম্রাটের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতেন। সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানসবদারের সাক্ষাৎ নিতেন এবং তাদের পদমর্যাদা যোগ্যতা অনুযায়ী স্থির করতেন। বদাউনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কর্তব্য পালনে গাফিলতি হলে মনসবদারদের পদের অবনতি ঘটতে পারত। আবার মনসবদারদের দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতিও ঘটত।

মুঘল আমলে, আকবরের রাজত্বকালে সম্রাট জাতি-ধর্ম বা বর্ণকে কখনই মনসবদার নিয়োগের সময়ে গুরুত্ব দিতেন না। সতীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মুঘল সম্রাটরা এই ধরনের সংকীর্ণতা মানসবদার নিয়োগের সময়ে কখনই দেখাননি। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, অভিজাতদের পক্ষে উচ্চপদস্থ মনসবদার রূপে নির্বাচিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

পদমর্যাদা অনুযায়ী মনসবদাররা বহু ভাগে বিভক্ত ছিলেন। *আইন-ই-আকবরি*তে আবুল ফজল বলেছেন যে, মনসবদাররা ৬৬টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। অধ্যাপক অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, সম্ভবত আকবর ৬৬টি শ্রেণিতে মসবদারদের বিভাজনের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ৩৩টি শ্রেণি গঠন করা সম্ভবপর হয়েছিল। বলা হয় যে, সর্বনিম্ন মনসবদারের অধীনে দশজন এবং সর্বোচ্চ মনসবদারের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য থাকত। আরও বেশি সংখ্যক সৈন্যের দায়িত্বে থাকতেন যে সব মনসবদাররা তাঁরা সাধারণত রাজপরিবারের সদস্য হতেন। যেমন, মানসিংহ বা টোডরমল সাত হাজারি মনসবদার ছিলেন।

বলা হয় যে, এক হাজারি ও তার বেশি মনসবদাররা 'ওমরাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। বার্ণিয়ে বলেছেন যে, মুঘল প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিলেন ওই ওমরাহরা।

মনসবদারি ব্যবস্থার সাথে সাথে 'জাট' ও 'সওয়ার' এ দুটি শ্রেণির কথা চলে আসে। ব্লখম্যান বলেছেন যে, 'জাট' শব্দটির অর্থ একজন মনসবদারের অধীনে কত সৈন্য রয়েছে। 'সওয়ার' শব্দটি বলতে বোঝায় পদমর্যাদার অতিরিক্ত সেনা। ড. ত্রিপাঠী মনে করেন যে, 'সওয়ার' ছিল মনসবদারদের পদের অতিরিক্ত মর্যাদার ইঙ্গিত এবং এর

জন্য তাঁরা রাজকোষ থেকে অতিরিক্ত অর্থ পেতে পারতেন। ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, আকবরের মনসবদারি ব্যবস্থা একদিনে গড়ে ওঠেনি। তাঁর সুদীর্ঘকালের চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল এই মনসবদারি প্রথা। প্রথম কুড়ি বছর মনসবদারদের মধ্যে 'সওয়ার' পদটি ছিল না। আকবর খেয়াল করেন যে, মনসবদাররা যতটা সৈন্য রাখা প্রয়োজন তা রাখেন না, তখনই তিনি 'সওয়ার' পদটির কথা চিন্তা করেন। তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন যে, 'সওয়ার' পদ অনুযায়ী সৈন্য পোষণ করতে মনসবদাররা বাধ্য এবং এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হবে। তবে সকল মনসবদারই যে 'সওয়ার' পদের অধিকারী হবেন তা নয়। কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, আকবরের রাজত্বকালের শেষ পর্বে প্রায় সব মনসবদারই 'জাট' ও 'সওয়ার' দুটি পদেরই অধিকারী ছিলেন।

'জাট' ও 'সওয়ার' সংখ্যার ওপর নির্ভর করে মনসবদাররা তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণির মনসবদার তাঁকেই বলা হতো যিনি সমসংখ্যক 'জাট' ও 'সওয়ার' রাখতেন। 'সওয়ারের সংখ্যা যদি 'জাটের' অর্ধেক হয়, তবে সেই মনসবদাররা দ্বিতীয় শ্রেণির বলে গণ্য হতেন। যে সব মনসবদারদের অধীনে কোনও 'সওয়ার' থাকত না, অথবা 'সওয়ার' সংখ্যা যদি 'জাট' সংখ্যার অর্ধেকেরও কম থাকত তবে তাঁরা তৃতীয় শ্রেণির মনসবদার বলে বিবেচিত হতেন।

মনসবদারদের বেতন দেওয়া হতো নগদে কিংবা জমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে। যাঁরা সরকার থেকে বেতন পেতেন তাঁদের বলা হতো মনসবদার-ই-নগদি। আর যাঁরা সরকার থেকে নির্দিষ্ট জমি লাভ করতেন নিজের ও সৈন্যদের খরচ চালানোর জন্য তাঁদের বলা হতো 'জাগিরদার'। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রখতে হবে যে, প্রথম দিকে মনসবদারি প্রথা আদৌ বংশানুক্রমিক ছিল না। মনসবদারের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সরকার রাজেয়াপ্ত করতেন। ফলে মনসবদাররা অমিতব্যয়ী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়তেন। যদিও আকবর চেয়েছিলেন যে মনসবদাররা উত্তরাধিকারীর জন্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে উৎপীড়ন করতে যাতে না পারেন, সেইজন্য মনসবদারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পত্তি সম্রাট বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে নিতেন — কার্যত ফল হয়েছিল বিপরীত। উপরন্তু এই ব্যবস্থার ফলে স্বনির্ভর কোনও অভিজাত সম্প্রদায় মুঘল আমলে গড়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার ফলে এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। সেই যুগে রাজ্য রক্ষার জন্য বা শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কোনও শক্তিশালী অনুগত রাজকর্মচারীর দল এগিয়ে আসেনি।

আকবর মনসবদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোর ভিতরে এক বিরাট সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তবে আকবরের আমলে মনসবদারি ব্যবস্থা মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারের পক্ষে সহায়ক হলেও কালক্রমে এই ব্যবস্থার মধ্যে নানা অসুবিধার উদ্ভব হয়। ঐতিহাসিকদের একাংশ মনে করেন যে, মানসবদারি ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি তার সংগঠন ব্যবস্থার সঙ্গেই যুক্ত ছিল, তবে আকবরের সহজাত ব্যক্তিত্বের জন্য সেগুলি সেইযুগে তেমনভাবে প্রতীয়মান হয়নি। মনসবদাররা যে সকলেই সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিলেন তা নয়। দক্ষ প্রশাসক মনসবদারদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে এদের বিদ্রোহ করার সুযোগ ছিল সর্বাধিক। কারণ তাদের অধীনে সৈন্য থাকত, তেমনই তাদের আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সাধারণ লোক সম্রাটের সম্পর্কে যতটা না অনুগত ছিল তার থেকে বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তারা মনসবদারদের সম্পর্কে বলে মনে করা হয় — কারণ তারা ছিল স্থানীয় প্রভু। মনসবদারদের এই ধরনের স্থানীয় প্রতিপত্তি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। আবুল ফজল নিজেও লিখে গিয়েছেন যে, মনসবদারদের একটি বিরাট অংশ ছিলেন অসৎ এবং সুযোগসন্ধানী। তারা তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সৈন্য বা ঘোড়া সব সময়ে রাখতেন না। আকবর যদিও 'সওয়ার' ব্যবস্থার মাধ্যমে এ দুর্নীতি রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং 'দাগ' (Branding) ও 'চেহারা' (Descriptive roll) প্রথা চালু করেছিলেন।

অর্থাৎ ঘোড়ার গায়ে চিহ্ন দেওয়া হতো, এবং প্রতিটি সৈনিক সম্পর্কে প্রশাসন বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখত — তা সত্ত্বেও মনসবদারদের দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে মনসবদারি ব্যবস্থা মুঘল সেনাবাহিনীর ঐক্য ক্ষুণ্ণ করে তুলেছিল। কারণ মনসবদারদের অধীনস্থ সৈন্যদের সাথে মনসবদারদের যে সংযোগ ও আনুগত্যের বন্ধন ছিল তা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। কারণ মুঘল সেনাপতিদের আঞ্চলিক সৈন্যদলের ওপর কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। ফলে মুঘল সেনাবাহিনীর সামগ্রিক সংহতিতে ফাটল দেখা যায়। আকবর তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে মনসবদারি প্রথাকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রে পরিণত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মনসবদারি প্রথার সহজাত ত্রুটিগুলি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ে মসবদারদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতেও দেখা গিয়েছিল।

৯.২.৩ জায়গিরদারি প্রথা

জায়গির শব্দের অর্থ জমি। মনসবদারি প্রথায় যে সমস্ত মনসবদার তাদের বেতনের নির্দিষ্ট অর্থ আদায়ের জন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে একটি অঞ্চলের খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেতেন তাদের বলা হত জায়গিরদার এবং ঐ অঞ্চলটিকে বলা হত জায়গির।

৯.২.৩.১ তনখা জায়গির

জায়গির জমির প্রাপক বা জায়গিরদারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগ ছিল সরকারি আধিকারিক। মুঘল সম্রাটের আধিকারিকদের দ্বৈত-অঙ্কের পদ বা 'মনসব' দেওয়া হত — 'জাট' ও 'সওয়ার'। 'জাট' পদ অনুসারে মনসবদারের ব্যক্তিগত বেতন নির্দিষ্ট হত, অন্যদিকে 'সওয়ার' পদ অনুযায়ী মনসবদার সম্রাটকে সেবাদানের জন্য যে অশ্বারোহী বাহিনী পোষণ করতেন তার ব্যয়ভার মেটানোর খরচ নির্ধারিত হত। 'জাট' ও 'সওয়ার' উভয়ের জন্য মঞ্জুরিকৃত অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী মনসবদারের বেতনকাঠামো (তলব) নির্দিষ্ট হত। সরকারি কোষাগার থেকে নগদ অর্থে সেই বেতন দেওয়া হত অথবা বেতনের সমপরিমাণ ভূমিরাজস্ব (জমা দামী) আদায়ের জমা নির্দিষ্ট জমি 'জায়গির' হিসেবে দেওয়া হত। এই ধরনের জায়গিরকে বলা হত 'তনখা জায়গির'। জায়গির হস্তান্তরের আদেশগুলিতে প্রথমে প্রাপকের পদমর্যাদা বর্ণনা করা হত। পরে পদমর্যাদা অনুসারে বেতনক্রমের নির্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করা হত। একে বলা হত 'মুকাররারা তলব' বা মঞ্জুরীকৃত দাবি। সাধারণভাবে একজন মনসবদারকে একই পরগণার মধ্যে জায়গির বন্দোবস্ত দেবার চেষ্টা করা হত। তা সম্ভব না হলে তার মঞ্জুরীপত্রে বিভিন্ন পরগণার পৃথক গ্রামের অংশ (কিসমত্) উল্লেখ করা থাকত।

৯.২.৩.২ ওয়াতন জায়গির

তনখা জায়গিরের বাইরে আরো কয়েক প্রকার জায়গির চালু ছিল। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে একটি বিশেষ পদে নিয়োগের সময় শর্তসাপেক্ষে জায়গির প্রদান করা হত। এই ধরণের জায়গিরকে বলা হত 'মসরুৎ জায়গির'। এছাড়া মুঘল সম্রাটরা বিদ্বান ব্যক্তি, ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত বা অসাধারণ ব্যক্তিদের কিছু জায়গির দিতেন। এই জায়গিরের সাথে চাকুরির শর্ত বা পদমর্যাদার কোন সম্পর্ক ছিল না। এগুলিকে বলা হত 'ইনাম জায়গির'। এই ধরনের অনুদানমূলক বন্দোবস্ত 'মদদ-ই-মাস', 'আলতামখা' ইত্যাদি নামেও অভিহিত হত। এই ধরণের জায়গির-প্রাপকরা সারাজীবন এগুলি ভোগ করতেন। এজন্য তাঁদের কোন সেবা (Service) দিতে হত না। মুঘল আমলে প্রচলিত আর একটি জায়গির ছিল, যা 'ওয়াতন জায়গির' নামে পরিচিত। এদেশের স্থানীয় কিছু জমিদাররা সামন্ত রাজা মুঘলের নিকট চাকুরী নিলে তাঁদের পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করা জমিগুলিকে তাদের বেতনের সমতুল্য বিবেচনা করে বংশানুক্রমিক অধিকার

মেনে নেওয়া হত। তবে এই সকল অঞ্চলে ভোক্তার স্বশাসন কায়েম ছিল, তাই জমা বা হাসিলের হিসেব ছিল অপ্রাসঙ্গিক।

৯.৩ মাদাদ-ই-মাস

মুঘল সরকার কিছু লোক বা সংস্থাকে নিষ্কর জমির খাজনা ভোগ করার অনুমতি দিয়েছিল ধর্মের ব্যাপক প্রসারের জন্য। এই ধরনের দানকে মাদাদ-ই-মাস বা সয়ূরঘুল বলা হল। সাধারণত এই দান ছিল কোনো লোকের নামে তার সারাজীবনের জন্য। কতকগুলি শর্ত-সাপেক্ষে এই ধরণের দান উত্তরাধিকারীদেরও দেওয়া হত। প্রধানত ধর্মীয় মুসলমানদের দিলেও, বৃদ্ধ আমলা বা উচ্চ পরিবারের বিধবাদেরও এটি দেওয়া হত। মাদ্রাসা বা মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও এই ধরণের দান করা হত যেটা যুগ যুগে ধরে চলতে থাকে।

৯.৪ জমিদার

ফারসি শব্দ জমিদার বলতে বোঝায় এমন একজনকে যে জমি অধিকার করে আছে। বলা প্রয়োজন যে সে জমির মালিক নয়। মুঘল যুগে আকবরের সময় থেকেই জমিদার শব্দটি সচরাচর ব্যবহার করা হয়েছে। তখন এই শব্দটি এমন একজন লোককে বোঝাত যে উত্তরাধিকার সূত্রে অধিকার পেয়েছে কৃষকের কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহ করে কোষাগারে জমা দেবার। জমিদার হল কৃষকের থেকে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণি।

৯.৫ উপসংহার

এই একক থেকে আমরা জানতে পারলাম যে মনসবদারি ব্যবস্থা মুঘল সামাজ্যের মৌলিক ভিত্তি রূপে বিকশিত হয়েছিল। আকবর ছিলেন এই প্রথার স্রষ্টা ও প্রধান রূপকার। মনে রাখা দরকার যে এই ব্যবস্থা ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত ও বিবর্তিত হয়েছিল। এটি কোনো অনড় বা পরিবর্তনহীন পদ্ধতি ছিল না। আকবর ও তাঁর পরের মুঘল শাসকরা এই ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না তাও নয়। তাঁরা চেষ্টা করতেন এই প্রথাকে যথাসাধ্য ত্রুটিমুক্ত করার। সকল মুঘল সম্রাটই মনসবদারি ব্যবস্থাকে নানা ভাবে সংশোধন ও পরিমার্জনের চেষ্টা করেছেন। মুঘল শাসকদের লক্ষ্য ছিল পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত যোদ্ধা ও অভিজাতদের সাম্রাজ্যের মধ্যে অঙ্গীভূত করতে, অন্যদিকে ভারতীয় অভিজাত শ্রেণি, বিশেষ করে, রাজপুতদের কাছে টানতে। সর্বোপরি, মনসবদারি ব্যবস্থা সাম্রাজ্যকে কাঠামোগত ভাবে বলিষ্ঠ করে। যুদ্ধের সময় সেনা ও ঘোড়া সরবরাহ বহুলাংশে নিশ্চিত হয়েছিল এই ব্যবস্থার মাধ্যমে। মনসবদারদের একটি অংশ জায়গিরদার রূপে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। অর্থাৎ এটি এমন একটি ব্যবস্থা যে এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি ও রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা অনেকাংশে সফল হয়েছিল।

৯.৬ প্রশ্নাবলী

১. আকবরের প্রশাসনিক সংস্কার নীতি বিশ্লেষণ করুন।

২. জায়গিরদারি প্রথার বৈশিষ্ট্য কী কী ছিল?

৩. মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে জায়গিরদারি প্রথার সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৪. মাদাদ-ই-মাস সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৫. জমিদার শ্রেণি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989.

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750,* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000 -1765,* UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest. War, Environment and Empire in Mughal North India*, Oxford, 2019.

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707,* OUP, 2013

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগের কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, কলকাতা, ১৯৬৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

একক : ১০ □ বিদ্রোহ সমূহ এবং তার প্রতিরোধ

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ ভূমিকা

১০.২ বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ

১০.২.১ কৃষক বিদ্রোহ

১০.২.২ কৃষক বিদ্রোহ ও জমিদার শ্রেণি

১০.২.৩ বিদ্রোহ প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ

১০.৬ উপসংহার

১০.৭ প্রশ্নাবলী

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ উদ্দেশ্য

এই অঞ্চলটি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনারা জানতে পারবেন

- মুঘল যুগে আকবরের সুশাসন সত্ত্বেও প্রজাদের, বিশেষ করে কৃষকদের, বিভিন্ন বিদ্রোহ সম্পর্কে।
- বিদ্রোহ প্রশমনে রাষ্ট্রের উদ্যোগ সম্পর্কে।

১০.১ ভূমিকা

আকবরের রাজত্বকালে তাঁর সামরিক অভিযানের ঘটনাবলীর দিকে এক ঝলক তাকালে তিনি যে কত বড় মাপের বিজেতা ছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। ১৫৬৮ সালে চিতোর-এর পতন হলে তিনি রাজস্থানের উপর তাঁর দখল কায়েম করেন। এরপর তিনি একে একে গুজরাট (১৫৭২-৭৩), বাংলা (১৫৭৬), কাবুল (১৫৮৫), কাশ্মীর (১৫৮৬), সিন্ধু (১৫৯১), উড়িষ্যা (১৫৯২) এবং কান্দাহার (১৫৯৫) দখল করে হিন্দুকুশ পর্বতের সীমারেখা পর্যন্ত সাম্রাজ্য সীমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি দক্ষিণভারত অভিযান করেন এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আকবরের এই সফলতা সত্ত্বেও তাঁর এই সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি যেমন বিভিন্ন মানুষকে তাঁর প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল, তেমনি তাঁর প্রশাসনিক ও আর্থিক নীতির কারণে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র বিরোধী ভাবনা দানা বাধতে থাকে যা থেকে রাষ্ট্রবিরোধী বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ইত্যাদি জন্মলাভ করতে শুরু করে যার প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের কাছে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

১০.২ বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ

আপনারা ইতিপূর্বেই জেনেছেন যে, আকবরের শাসনে ভারতবর্ষের ক্রমিক উন্নতির চিত্র ফুটে উঠেছিল। তাঁর এই সুশাসনেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের খবর যেমন পাওয়া যায় তেমনি আমির, ওমরাহ ও অভিজাতদের মধ্যেও ক্ষোভ-বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়।

১০.২.১ কৃষক বিদ্রোহ

মুঘল শাসনের শুরু থেকেই এদেশে কৃষক ও জমিদারদের বিদ্রোহ ঘটত। তবে সব বিদ্রোহের চরিত্র এক ছিল না। স্থান-কালের তারতম্য অনুযায়ী বিদ্রোহের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। কখনো অর্থনৈতিক শোষণ, কখনো সামাজিক মর্যাদাবোধ, কখনো ধর্মীয় উন্মাদনা-বিদ্রোহের উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। মুঘল যুগে একাধিক কৃষক-বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও, কৃষক-সমাজের রাজনৈতিক চেতনায় শ্রেণিচেতনা বিদ্রোহগুলির প্রধান চালিকা শক্তি ছিল না। মুঘল প্রশাসনের শোষণ, বাঁচার জন্য ন্যূনতম সংস্থানের প্রয়োজন, স্থানীয় জমিদারদের প্রেরণা ইত্যাদি নানা বিষয় কৃষকদের বিদ্রোহী করেছিলেন। কিন্তু এ ছাড়াও দুটি সামাজিক শক্তি সেকালের কৃষক-বিদ্রোহগুলিকে প্রসারিত করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। এই দুটি শক্তি হল বর্ণ বা জাতপাত এবং ধর্ম। কৃষক-বিদ্রোহে বর্ণ ও ধর্মের প্রভাব কতটা ছিল এবং তার পরিণতি কি হয়েছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের গবেষণা এখনও চলছে। আপাতপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিশ্লেষণ থেকে এ কথা বলা যায় যে, বিভিন্ন বিদ্রোহের সংগঠন ও প্রসারে বর্ণ বা জাতিগত মিল এবং বিশেষত, ধর্মবিশ্বাস যথেষ্ট সক্রিয় ছিল।

দেশের কোন একটি অংশে কোন বিশেষ জাত বা বর্ণের লোক বিদ্রোহী হলে অন্যান্য অংশের সমবর্ণের লোকেরাও বিদ্রোহীদের সমর্থনে এগিয়ে আসত। কৃষক-আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা এবং সামাজিক বর্ণব্যবস্থার উচ্চক্রম লাভ করার মানসিকতা মারাঠা-সর্দার শিবাজী কিংবা জাঠ-সর্দার ঠাকুর বদন সিংহের আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে, অতি সাধারণ বা নিম্নস্তরের মানুষের বর্ণসচেতনতা বা জাতে-ওঠার প্রচেষ্টা ততটা তীব্র ছিল না। কারণ তাদের কাছে জাতপাত ছিল গৌণ, মুখ্য ছিল বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করা। এবং এই কাজে প্রধান উদ্যোগী ছিল সর্দার বা জমিদার। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা গোষ্ঠীর, বর্ণের দোহাই দিত।

বর্ণ বা জাতের বন্ধন কৃষক অভ্যুত্থানগুলিকে সমগোত্রীয় লোকেদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আন্দোলনগুলির লক্ষ্য অস্পষ্ট হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতার বীজ রোপিত হয়েছে। যেমন জাতি বা ধর্মচিন্তায় আচ্ছন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্য জাতি বা বর্ণের কৃষকদের উদাসীনতা এমনকি বিরোধিতা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। তাই দেখা যায়, জাঠদের বিচারে মারাঠা-নেতা সদাশিব রাও এবং আফগান আহম্মদ শাহ আবদালির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই মারাঠা-আফগান যুদ্ধে তারা ছিল সচেতনভাবে নিস্পৃহ। আবার শিখ-বিদ্রোহ দমনে মুঘলের সহযোগী হতে চূড়ামন জাঠ বা ছত্রশাল বুন্দেলা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। দ্বিতীয়ত, বর্ণভিত্তিক আন্দোলনে জাত-বর্ণ কাঠামোর উচ্ছেদ সাধন মূল লক্ষ্য ছিল না। কিছু বর্ণ থাকবন্দি সমাজের উপরে উঠতে চাইত। তাই উৎপাদন-ব্যবস্থা বা সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে এইসব আন্দোলন মিশে যেতে পারে।

মুঘল যুগের কৃষক বিদ্রোহে বর্ণের মত ধর্মেরও অনুরূপ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগে সাধারণ কৃষকদের চিন্তায় ধর্মের পরিবর্তে নতুন ধর্মমত বা প্রতিবাদী ধর্মের প্রতি সমাজের অবহেলিত শ্রেণির আস্থা ছিল বেশি গভীর। কারণ প্রচলিত ধর্মে ধনী-নির্ধনের মধ্যে একটা সীমারেখা টানা যেত। কিন্তু নতুন ধর্মে সামাজিক সাম্যের তত্ত্ব জোরের সাথে প্রচার করা হয়।

১০.২.২ কৃষক বিদ্রোহ ও জমিদার শ্রেণি

আপনারা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছেন মুঘল যুগের প্রারম্ভিক পর্বের কৃষক বিদ্রোহগুলিতে কৃষক ও জমিদার

যৌথভাবে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এর কারণ হল অধিকাংশ জমিদারের ছিল 'কিলাচা' বা দুর্গ এবং সশস্ত্র বহিনী। ফলে তা সে যত কম শক্তিশালীই হোক মুঘল শক্তিকে প্রতিহত করার একটা বাহিনী তাদের আছে, এই বিশ্বাস অত্যাচারিত কৃষকদের জমিদারের পতাকাতলে সমবেত হতে সাহায্য করেছিল।

মুঘল যুগে বাংলাদেশের এমন কোনও বড় মাপের কৃষক বিদ্রোহ হয়নি যার প্রভাবে — অন্তত আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে মুঘল শাসন ধাক্কা খেতে পারে যা হয়েছিল—শোভা সিংহ বা সীতারাম রায়ের বিদ্রোহে। গৌতম ভদ্র মুঘল যুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কোচবিহার ও আসাম সীমান্ত জুড়ে পাইক বিদ্রোহের কথা বলেছেন। ১৫১৫-১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলের পাইকরা তাদের নেতা পাইক সর্দার সনাতনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। তখন সবে মুঘল শাসন এইসব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই অস্থির পরিবেশে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে ও বর্তমান গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত "খুন্তাঘাট পরগণার ক্রোরি জামান তব্রিজি কৃষকদের ওপর অত্যাচার করতে লাগলেন এবং তাদের সুন্দরী স্ত্রীদের নিজের হারেমে পুরতে লাগলেন।" ফলে কৃষকরা রুখে দাঁড়াল। পাইকরা ছিল আসলে কৃষক। সশস্ত্র ছিল বলে তারা কৃষকদের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই বিদ্রোহকে দমন করা হলেও কৃষক পাইকদের মুঘল বিরোধিতা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে মীরজুমলা যখন কোচবিহার — যা মুঘল অধিকারের বাইরে চলে গিয়েছিল — তাকে পুনরায় অধিকার করার জন্য অভিযান করেন তখন তার সৈন্যবাহিনীর পেছনে কোচ রায়তরা আবার বিদ্রোহ করেছিল। এ বিদ্রোহগুলো ছিল বাংলার প্রান্তভাগের বিদ্রোহ। বাংলার মূল ভূ-ভাগে ব্যাপক হারে যেমন জমিদার বিদ্রোহও হয়নি তেমনি কৃষক বিদ্রোহও হয় নি। গৌতম ভদ্র সম্রাট আকবরের আমলে অনুষ্ঠিত 'বিশুদ্ধ কৃষক-বিদ্রোহ' হিসেবে ১৫৬২ ও ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে আগ্রার কৃষকদের বিদ্রোহ দুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথম ক্ষেত্রে সাকেত নামক একটি অঞ্চলের ৮টি গ্রামের কৃষকেরা রাজকীয় বাহিনীর হাতে কয়েকজন গ্রামবাসীকে সমর্পণ করতে অস্বীকৃত হয়। আকবর স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে আগ্রার কৃষকেরা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে এবং বিদ্রোহী হয়। অবশ্য এটিও খুব সহজে দমন করা হয়। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সুবাদার কাশিম খান বিগত বছরের রাজস্ব জমা দেবার নির্দেশ দিলে সমস্য দেখা দেয়। চাষীরা দাবি করে যে, ঐ রাজস্ব তারা পূর্ববর্তী শাসককে (ইয়াকুব খান) আগেই প্রদান করেছেন। তাছাড়া রাজস্বের হার বৃদ্ধি এবং ফসলের পরিবর্তে নগদ অর্থে রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টাও কৃষকদের ক্ষোভ সৃষ্টি করে। আকবর শেষ পর্যন্ত দুটি সিদ্ধান্তই পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও আগ্রার চাষীরা একাধিকবার বিদ্রোহ সংগঠিত করেছে।

১০.২.৩ বিদ্রোহ প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ

মুঘল শাসনের শুরু থেকেই এদেশে কৃষক ও জমিদারের বিদ্রোহ ঘটত। তবে সকল বিদ্রোহের চরিত্র এক ছিল না। স্থান-কালের তারতম্য অনুযায়ী বিদ্রোহের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। কখনো অর্থনৈতিক শোষণ, কখনো সামাজিক মর্যাদাবোধ, কখনো ধর্মীয় উন্মাদনা — এই সকল বিদ্রোহের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। তবে সব বিদ্রোহের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এর প্রতিবাদী চরিত্র, এবং তা মুঘল সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে। ফলে মুঘল প্রশাসনও কেবলমাত্র সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে এই সকল বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা না করে বিদ্রোহীদের সমস্যাকে অনুধাবন করে তা প্রশমনের জন্য কৃষকদের তকাভি (taqavi) ঋণ দেওয়া, তাদের জমিতে আল বেঁধে দেওয়া, জমিতে তাদের দখলি স্বত্বকে মেনে নেওয়া, গ্রামাঞ্চলে দস্যু-তস্করের উপদ্রবকে যতখানি সম্ভব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, কিছু কিছু জমিকে খাজনা-মুক্ত (rent-free) বলে স্বীকার করে নেওয়া ইত্যাদি ছিল জমিদারদের কাজের স্বীকৃত অংশ। এইসব

কাজের প্রতিপালনে বা তার অভাবে জমিদাররা সরকারের কাছ থেকে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত দুই-ই হত।

১০.৩ উপসংহার

কৃষক ও সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক ভিত্তি ছিল শোষণ, - যা ভূমি রাজস্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করত। এই আদায় করার পদ্ধতি ছিল নিপীড়ণমূলক। কৃষকরা সর্বদা চেষ্টা করত রাজস্ব আদায়ের প্রশাসনিক চাপ-কে প্রতিহত করতে। মুঘল রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল তার নিয়ম অনুসারে রাজস্ব আদায় করা। আধিপত্য ও প্রতিরোধের এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নানা স্তরভেদ ছিল: জায়গিরদার ছিল বাইরের লোক, জমিদার গ্রামের নিজস্ব মানুষ। গ্রামীণ কৃষক শ্রেণির সঙ্গে, বিশেষ করে সম্পন্ন খুদকস্থ কৃষকদের সঙ্গে, বর্ণ বা ধর্মীয় সাযুজ্যতার কারণে, জমিদার শ্রেণির একাত্মতা লক্ষণীয় ছিল। সুযোগ পেলেই এরা একযোগে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক জায়গিরদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। সাধারণ কৃষক, ভূমিহীন কৃষিমজুর শ্রেণিও এই বিদ্রোহে সামিল হত। কৌমগত সামাজিক বন্ধন বিদ্রোহী কৃষক শ্রেণির চৈতন্য ও সংহতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই বিচারে বলা যায় মুঘল যুগের কৃষক বিদ্রোহকে ব্যাখ্যা করতে গেলে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

১০.৪ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল আমলের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২. কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গে জমিদার শ্রেণির সম্পর্ক কী ছিল?

৩. মুঘল শক্তি কীভাবে কৃষক বিদ্রোহ দমন করত?

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989.

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delh, 2007

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State*, *1526-1750,* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000-1765,* UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest. War, Environment and Empire in Mughal North India,* Oxford, 2019.

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India*, *1556-1707,* OUP, 2013

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগের কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, কলকাতা, ১৯৮৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

পর্যায় : ৪ ◻ সম্প্রসারণ ও একীকরণ

একক : ১১ ◻ মুঘল অভিজাত সম্প্রদায়ের সাথে রাজপুত ও অন্যান্য দেশীয় সম্প্রদায়ের সংযোগসাধন

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ ভূমিকা

১১.২ মুঘল-রাজপুত সম্পর্ক

১১.২.১ আকবরের রাজপুত নীতি

১১.২.২ রাজপুতদের মুঘল প্রশাসনে সংযুক্তকরণ

১১.৩ উপসংহার

১১.৪ প্রশ্নাবলী

১১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনারা জানতে পারেন

- কীভাবে আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটান।
- রাজপুত ও অন্যান্য ভারতীয়দের সাথে কীভাবে তিনি সমন্বয় সাধন ঘটান।

১০.১ ভূমিকা

আকবর যখন সিংহাসনে বসেন তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল ছিল এবং দিল্লী ও আগ্রা দুর্ভিক্ষ কবলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ, বেরার, বিদর, আহমদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডায়ও স্বাধীন সুলতানরা রাজত্ব করছিলেন। দিল্লীর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। আরও দক্ষিণে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত অঞ্চলে বিজয়নগরের হিন্দু রাজা রাজত্ব করেছিলেন। অন্যদিকে পর্তুগিজরা পশ্চিম উপকূলে গোয়া ও দিউ বন্দর অধিকার করেছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন বৈরাম খাঁয়ের অভিভাবকত্বে আকবর সিংহাসনে বসেন। প্রথমে তিনি তাঁর অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে এবং পরবর্তীতে নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা বলে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও ঐক্যবদ্ধ রূপ দান করেন।

১১.২ মুঘল-রাজপুত সম্পর্ক

সিংহাসনে বসে আকবর দেখলেন যে, তাঁর সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোক হিন্দু ধর্মাবলম্বী, ফলে তিনি হিন্দুদের

প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করেন। হিন্দুদের মধ্যে রাজপুতদের শৌর্য-বীর্যের কথাও আকবর জানতেন। এই কারণে আকবর রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১১.২.১ আকবরের রাজপুত নীতি

আকবরের রাজত্বকালে মুঘল রাজপুত সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট চরিত্র পেয়েছিল। রাজপুতদের প্রতি অস্বাভাবিক আবেগসম্পন্ন হয়েই আকবর রাজপুত নীতি নির্ধারণ করেননি অথবা রাজপুতদের শৌর্য, দেশাত্মবোধ বা মহানুভবতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাও আকবরকে রাজপুত-নীতি নির্ধারণে সহায়তা করেনি। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিদীপ্ত স্বার্থবোধ, চিন্তাপ্রসূত দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক সচেতনতা আকবরকে রাজপুত নীতি নির্ধারণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

আকবর মসনদে বসার পর থেকেই বুঝেছিলেন যে, কেবলমাত্র মুসলমান কর্মচারীগণ এবং অন্যান্য বহিরাগত বিশেষ ব্যক্তিগণের উপর সর্বতোভাবে বিশ্বাস রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। শাসনকালের প্রারম্ভেই আকবরকে রাজদরবারে এবং বাইরে নানা প্রকার বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শাহ আব্দুল মালিকের ঔদ্ধত্য, শাহ মনসুর খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, বৈরাম খাঁর বিদ্রোহ, মাহম অনাঘার সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা, উজবেগ বিদ্রোহ প্রভৃতি আকবরকে যথেষ্ট চিন্তান্বিত করেছিল। সুতরাং, যে সকল ব্যক্তিদের উপর মুঘল-কর্তৃত্ব নির্ভর করত এবং যাদের সাহায্যে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য স্থায়ী হতে পারত তাদের নিয়েই আকবরের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। আত্মীয় কর্মচারীদের ক্রমাগত বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে আকবর ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর সাহায্য নেওয়ার কথা চিন্তা করতেন। আকবরের সময়ে আফগান বিরোধিতাও উল্লেখযোগ্য ছিল। আফগানরা তাদের ক্ষমতা থেকে বিচ্যুতির জন্য মুঘলদেরই দায়ী করত। আফগান শাসকরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রভাব বজায় রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করছিল। সুলতান আদিল শাহের পুত্র শের খাঁ বর্তমান উত্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে মুঘল-কর্তৃত্ব বিনাশ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই সময় ভারতবর্ষীয় আফগানদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুলেমান কররাণ।

রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনের ব্যাপারে আকবর তাঁর পূর্বসূরিদের অপেক্ষা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, আকবর রাজপুতদের বেছে নিয়েছিলেন কেন? এর উত্তর পাওয়া যায় রাজপুতদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। রাজপুতগণ শৌর্য-বীর্যে ছিল অদ্বিতীয়।

পার্সিভ্যাল স্পীয়ার-এর ভাষায়: "ব্রাহ্মণরা যদি হিন্দুধর্মের মানসিক শক্তি হয়, তাহলে রাজপুতরা ছিল তাদের দৈহিক শক্তি।" মূলত এই কারণেই তিনি রাজপুতদের বন্ধুত্ব বেছে নেন। রাজপুতদের সাহায্যে নিয়ে তিনি মুঘল, পারসি, উজবেগ ও আফগান অভিজাত এবং অন্যান্য উদ্ধত রাজকর্মচারীদের প্রভাব খর্ব করতে চেষ্টা করেন। ড এ. সি. ব্যানার্জী লিখেছেন: "দিল্লীর সুলতানদের মত এদের ধ্বংস করার পরিবর্তে এই মহান ও দূরদর্শী সম্রাট রাজপুতদের মুঘল সাম্রাজ্যের শক্ত ভিতে রূপান্তরিত করেন।" ("*Instead of trying to crush them as the Sultans of Delhi and done this great and farsighted Emperor converted them into strong pillers of his empire.*")।

১১.২.২ রাজপুতদের মুঘল প্রশাসনে সংযুক্তকরণ

আকবর রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। রাজপুতদের সাথে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে আকবরের প্রধান অস্ত্র ছিল বৈবাহিক সম্পর্ক-স্থাপন। আজমীর যাত্রার সময় (১৫৬২

খ্রীঃ) আকবর অম্বরের রাজপুত রাজা বিহারীমল্লের অনুগত্য ও মিত্রতা লাভ করেন। মৈত্রীবন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি বিহারীমল্লের কন্যা মানবাঈকে বিবাহ করেন। এর দ্বারা ভারতীয় রাজনীতিতে এক নবযুগের ভূমিকা ঘটে। ড. বেণীপ্রসাদের ভাষায়: "It symbolised the dawn of a new era in Indian politics." বিকানীর ও জয়পুরের রাজকন্যাকেও তিনি বিবাহ করেন। মণিবাঈ-এর গর্ভজাত সন্তান সেলিমের সাথে উদয় সিংহের কন্যা যোধাবাঈ-এর বিবাহ দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরও প্রসারিত ও সুদৃঢ় করেন। এইসব সম্পর্কের পরিণাম হিসেবে তিনি বিহারীমল্ল, টোডরমল, মানসিংহ প্রমুখ রাজপুত বীরের যে সহায়তা ও সেবা লাভ করেছিলেন, তা তাঁর সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ভিত্তিকে যথেষ্ট দৃঢ় করেছিল। রাজপুত রাজ্য মারওয়াড় দখল করার ফলে যোধপুরের মধ্য দিয়ে গুজরাটের সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছিল। এর ফলে অল্পব্যয়ে মুঘল-বাহিনী গুজরাট অভিযান শুরু করতে পেরেছিল। অধিকাংশ রাজপুত রাজ্য মুঘলদের মিত্র থাকার ফলে, মুঘল-বাহিনী দেশের অন্যান্য অংশে সর্বশক্তিসহ অভিযান চালাতে সক্ষম হয়েছিল।

তবে তিনি যে, সকল ক্ষেত্রেই বিনা যুদ্ধে রাজপুতদের বিষয়ে সফলকাম হযেছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ১৫৬২ খ্রী: মালব, ১৫৬৮ খ্রী: রণথম্ভোর, ১৫৭০ খ্রী: মাড়োয়ার, বিকানীর এবং জয়সলমীর রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁকে অস্ত্রধারণ করতে হয়। এইভাবে বেশ কিছু রাজপুত-রাজ্য আকবরের অধীনে আসে। তবে মেবার দীর্ঘকাল আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা চালিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য একদিন মেবারের রাজধানী চিতোরের পতন হয়। অপরাপর অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রতাপগড় ডুঙ্গারপুর ক্রমে আকবরের অধীনে আসে। তবে কখনোই সংকীর্ণ প্রতিহিংসাপরায়ণতা আকবরের মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করেনি। তাই আকবর ঐ সকল রাজপুতদের বিরোধিতার কথা ভুলে মহানুভবতার পরিচয় দেন এবং তাদের অনেককেই প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করেন। তবে কোন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আকবর রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা করেননি। পূর্বসূরিদের মত আকবর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজপুতদের রাজনৈতিক ঐক্যকে বিচার করেননি। তাই রাজপুত রাজ্যগুলি আক্রমণ করলেও তিনি কখনোই রাজপুতদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেননি। তাছাড়া আকবর রাজপুতদের তাঁর সাম্রাজ্যের অংশীদার করে নেওয়ার ফলে সকল হিন্দু-সম্প্রদায়ই মুঘল সাম্রাজ্যের অনুগত হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক টড (Tod) যথার্থই বলেছেন: "আকবর ছিলেন রাজপুতানার প্রথম সফল বিজেতা, যিনি সোনার শিকল দিয়ে গর্বিত রাজপুতদের বাঁধতে পেরেছিলেন।"

রাজপুতদের প্রতি আকবরের এই সহজ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক উভয়ের পক্ষেই ইতিবাচক ফল প্রসব করেছিল। ভারতবর্ষে মুঘলদের রাজনৈতিক শত্রুর অভাব ছিল না। বিশেষত, আফগান জাতি তাদের ক্ষমতাচ্যুতির জন্য মুঘলদেরই দায়ী করত এবং সুযোগ আসা মাত্রই তারা হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় ভারতের যোদ্ধাজাতি রাজপুতদের মিত্রতা এবং সহযোগিতা মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। ভারতর অন্যতম শক্তিশালী এই জনগোষ্ঠী মুঘলের স্বপক্ষে থাকার ফলে মুঘল প্রশাসন ও সামরিক বিভাগ কিছুটা ভারমুক্ত মনে অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে দমন করার কাজে অধিক সময় ও শক্তি ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছিল। রাজপুত অশ্বারোহী-বাহিনী মুঘল সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে মুঘল-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল কয়েকগুণ বেশি।

আকবরের সঙ্গে রাজপুতদের যে সহজ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাতে মুঘলদের মত রাজপুতদের লাভও নিতান্ত কম ছিল না। আকবরের অনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ার ফলে রাজপুত রানারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রাজ্যের শাসনকাজ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাদের কর্মদক্ষতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি হিসেবে রাজপুতদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক-পদে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যেমন, অম্বরের ভগবান দাসকে লাহোরের যুগ্ম-শাসক হিসেবে

নিয়োগ করা হয়। মানসিংহ প্রথমে কাবুল এবং পরে বাংলা-বিহারের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। এইভাবে অন্যান্য রাজপুতদের আগ্রা, গুজরাট, আজমীর প্রভৃতি প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করা হয়। বংশগত জায়গির ছাড়াও সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্তে জায়গির প্রাপ্ত হওয়ার ফলে রাজপুত রানাদের অনেকেই বহু অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন।

সর্বোপরি, সম্রাটের প্রিয়পাত্র ও আত্মীয়তার সূত্রে রাজপুতগণ মুঘল দরবারে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হতে পেরেছিলেন। ফলে মুসলমান শাসনেও তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভগবান দাস, টোডরমল, মানসিংহ, জয়সিংহ প্রমুখ উচ্চ রাজকর্মচারী হিসেবে তাদের দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে রাজপুতদের যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন, তা আকবরের রাজপুত-নীতির ফল ছিল বলা যায়।

রাজপুতদের পাশাপাশি আকবর বিভিন্ন হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও হিসাবরক্ষক জাতিদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। এছাড়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলমান যারা শেখজাদা নামে পরিচিত ছিল তাদেরও উচ্চ পদাভিষিক্ত করা হয়।

১১.৩ উপসংহার

আকবরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রসারণ, সংহতিকরণ ও নায্যতা প্রদান করা। শুধুমাত্র মুঘল রাজবংশীয় বা মধ্য এশিয়া থেকে আগত যোদ্ধাশ্রেণিদের নিয়ে যে ভারতের মতন দেশে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা যাবে না তা আকবরের বুঝতে সময় লাগেনি। ভারতের ন্যায় বিপুল বৈচিত্র্য সম্পন্ন দেশে রাজকীয় নীতি সুষ্ঠ ভাবে প্রণয়ন করতে গেলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাহায্য প্রয়োজন: আকবরের বিচারে রাজপুতরা ছিল সেই জনগোষ্ঠী। ধর্মীয় উদারতা, বাস্তববোধ, যুক্তিবাদী স্বচ্ছ চিন্তা আকবরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল যে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রসারণের সময় রাজপুত জনগোষ্ঠী সব চাইতে বড়ো মিত্র রূপে পরিগণিত হতে পারে। কাবুল-কান্দাহার থেকে বাংলা-বিহার সর্বত্র তিনি রাজপুত শক্তিকে ব্যবহার করেছেন, যার সুফল মুঘল সাম্রাজ্য পেয়েছে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে।

১১.৪ প্রশ্নাবলী

১. রাজপুতদের প্রতি আকবরের নীতি কী ছিল?

২. মুঘল-আফগান সম্পর্ক কীভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতকে কে শক্তিশালী করেছিল?

৩. আকবর কীভাবে রাজপুতদের মুঘল প্রশাসনে সংযুক্ত করেছিলেন?

১১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989.

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Satish Chandra, *Medieval India- From Sultanat to the Mughals, 1526-1748,* Part-II, 2019

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750.* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000-1765*, UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest. War, Environment and Empire in Mughal North India*, Oxford, 2019.

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707*, OUP, 2013

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

একক : ১২ □ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্য

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য

১২.১ ভূমিকা

১২.২ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

১২.৩ গুজরাট দখল

১২.৪ দাক্ষিণাত্য নীতি

১২.৫ উপসংহার

১২.৬ প্রশ্নাবলী

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনারা আকবরের

- উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সর্বভারতীয় মানচিত্রে মুঘল প্রশাসনের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১২.১ ভূমিকা

আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আকবর সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য আক্রমণকে কীভাবে প্রতিহত করেছিলেন। এরপর আকবর সাম্রাজ্যের প্রসারের জন্য বিভিন্ন অভিযান প্রেরণ করেন। আকবরের এই অভিযানগুলি একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটিয়েছে, তেমনি বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের পথ পেশ করেছে।

১২.২ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতির প্রশ্নে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আকবরও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে সাবধানি ও কার্যকরী নীতি রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালার অবস্থান এই দেশকে নিঃসন্দেহে এক নিরাপত্তার স্থায়ী আশ্বাস দেয়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ঘেঁষা পর্বতমালাগুলির স্বল্প-উচ্চতা এবং অসংখ্য

গিরিপথ বহুলাংশে মধ্য-এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারত-ভূখণ্ডের যোগসূত্র হিসেবে থেকে গেছে। ভারতে আর্যদের অভিযানের কাল থেকে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার বা তুর্কি ও মুঘলদের অভিযান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এ সকল গিরিপথ ধরেই। স্বভাবতই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথের গুরুত্ব সম্পর্কে ভারতীয় শাসকেরা চিরকালই ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়েছেন। বলবন, আলাউদ্দিন খলজী প্রমুখ দিল্লী সুলতানি শাসকেরা নানা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি দ্বারা এই সীমান্তপথকে নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তবে আকবরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও তুর্কি-আফগানদের সীমান্ত-নীতির কিছু মৌলিক প্রভেদ ছিল। দিল্লীর সুলতানি শাসকেরা মূলত সীমান্তদেশে নতুন দুর্গ নির্মাণ করে কিংবা পুরানো দুর্গগুলির সংস্কার করে এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী মোতায়েন করে ঐ পথ ধরে গজনী বা কাবুল থেকে ভারতের অভ্যন্তরে কোনো রাজনৈতিক অভিযান প্রতিহত করার মধ্যে কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। সীমান্তপারের উপজাতিগুলির কার্যধারা সম্পর্কে তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মুঘলের সীমান্ত-নীতিতে কিছুটা নতুনত্ব আনা হয়। কারণ আফগানিস্তান ও ভারতে মুঘলের রাজ্যসীমা ছড়িয়ে থাকার ফলে সীমান্তবর্তী সুলেমান, কির্থর পর্বতমালার পাদদেশে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীর সাথে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। লক্ষণীয় যে, এই অঞ্চল এতকাল কিছু 'উন্মুক্তভূমি' হিসেবেই অবস্থান করছিল। এখানে বসবাসকারী আধা-মেষপালক উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা ছিল প্রচণ্ড স্বাধীনতাকামী এবং উগ্রমনা।

ক্রমে এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও কোন রাজকীয় শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়ে এরা ছিল বিরোধী। ভারত ও মধ্য-এশিয়ার মধ্যে স্থলপথে চলাচলকারী বাণিজ্য কাফেলাগুলি আক্রমণ করে লুঠপাট করাই ছিল এদের প্রধান উপজীবিকা। লাহোর ও কাবুলের মধ্যে মুঘল বাহিনীর চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতেও এরা দ্বিধা করত না। বস্তুত, আধুনিক আইনকানুন, আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি, যুক্তি বা ন্যায়বোধ ইত্যাদি যে-কোন বন্ধনই এদের কাছে অমর্যাদাকর মনে হত। কাবুলের শাসক মীর্জামহম্মদ হাকিমের মৃত্যুর পর কাবুলকে ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনার পর (১৫৮৫ খ্রীঃ) এ অঞ্চলের সাথে আকবরের প্রশাসন সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। আকবর এই পার্বত্যদেশের অধিবাসীদের দমন বা নিয়ন্ত্রণ করে আইনের অধীনে আনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

আকবর কাবুল প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন তাঁর সেনাপতি মানসিংহকে। একই সময়ে আকবর সোয়াট এবং বাজাউর এলাকায় পাঠান উপজাতিকে দমন করার জন্য উপযুক্ত সৈন্যদল পাঠান। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রৌশনিয়াদের সর্দার জালালকে হত্যা করে ঐ অঞ্চলটি মুঘলরা দখল করে।

আফগান এবং রৌশনিয়ারা সম্পূর্ণ পরাজিত হলে আকবর কাশ্মীর জয়ের পরিকল্পনা করেন। কাশ্মীরের সুলতান ইউসুফের বিরুদ্ধে ভগবান দাস ও কাসিম খানের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সৈন্য কাশ্মীর আক্রমণ করে এবং কাশ্মীরকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করে কাবুল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উত্তর-ভারতের সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান এলাকা তখনও মুঘল সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। সম্রাট আকবর এবার কান্দাহার আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এই আক্রমণ সফল করতে গেলে সিন্ধু দখল করা প্রয়োজন। ফলে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে আকবর সিন্ধু ও কান্দাহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

১২.৩ গুজরাট দখল

রাজপুতানা বিজয় সম্পন্ন করে আকবর গুজরাটের দিকে মুখ ফেরান। ইতিপূর্বে হুমায়ুন গুজরাট আক্রমণ ও জয় করলেও সেই জয়কে স্থায়ী করার চেষ্টা করেননি। ইতিমধ্যে গুজরাট একপ্রকার স্বাধীন ও বিশৃঙ্খল রাজ্য হিসেবে অবস্থান করছিল। আকবর গুজরাটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা দখলের সিদ্ধান্ত নেন। ব্রোচ, ক্যাম্বে, সুরাট

প্রভৃতি ব্যস্ততম বন্দর-সমৃদ্ধ সমুদ্র উপকূলবর্তী এ রাজ্য ছিল পশ্চিমী জগতের সাথে প্রাচ্যের বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। তাছাড়া গুজরাটের জমি ছিল উর্বরা। ঈশ্বরীপ্রসাদের ভাষায়: "Gujrat was a land of plenty whose prosperity– fertility and wealth had deeply impressed all European and Asiatic travellers who had visited it." এদিকে গুজরাটের তৎকালীন শাসক তৃতীয় মুজফ্‌ফর শাহ ছিলেন অপদার্থ এবং 'মির্জা' অভিজাতদের হাতের পুতুল মাত্র। এমতাবস্থায় আকবর সসৈন্যে গুজরাট অভিযান করেন এবং বিনা প্রতিরোধে মুজফ্‌ফর শাহের অনুগত্য লাভ করে (১৫৭৩ খ্রীঃ) রাজধানীতে ফিরে যান। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই গুজরাটে বিদ্রোহী মীর্জাদের মুঘল-বিরোধী কাজের সংবাদ পেয়ে আকবর আবার গুজরাটে আসেন এবং বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করে ফিরে যান। গুজরাট একটি মুঘল সুবায় পরিণত হয়। কিন্তু সুলতান মুজফফর শাহের উৎপাত চলতে থাকে ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অবশেষে তিনি ধৃত হন এবং নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেন। গুজরাটে মুঘল বাহিনীর খবর পেয়ে সম্রাট আনন্দিত হন এবং তাঁর কর্মচারীদের পুরস্কৃত করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা হিসাবে আবদুর রহিম, আজিজে কোকা এবং যুবরাজ মুরাদ ক্রমান্বয়ে নিযুক্ত হন।

১২.৪ দাক্ষিণাত্য নীতি

সারা উত্তর-ভারত এবং কাবুল ও কান্দাহার জয় করে আকবর দক্ষিণ ভারত জয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় শাসকদের মধ্যে সম্ভবত আকবরই প্রথম সফলভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতকে একই শাসনের অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুত ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণী রাজ্যদখলের এক দশক আগে থেকেই আকবর দক্ষিণী রাজ্যগুলির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কিছু কিছু উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। যে দুটি মূল বিষয় দক্ষিণ-ভারত সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল তা হল (১) উত্তর-ভারত বিজয় সম্পন্ন করার পর দক্ষিণ-ভারত থেকে পর্তুগিজ বণিক তথা জলদস্যুদের উৎখাত করার প্রয়োজনীয়তা। প্রথম কারণটির প্রেরণা এসেছে ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহ্য থেকে। মৌর্য, গুপ্ত, খলজী ও তুঘলক বংশীর রাজারা উত্তর-ভারতে কর্তৃত্ব স্থাপন করার পর দক্ষিণে অভিযান চালিয়েছেন। তাদের কেউ ব্যর্থ হয়েছেন, কারও সাফল্য এসেছে আংশিক এবং স্থায়িত্ব হয়েছে স্বল্প। তাই আকবরও উত্তরের সাফল্যের পর স্বাভাবিক কারণে এবং প্রচলিত ধারা অনুযায়ী দক্ষিণ-ভারতের ব্যাপারে অগ্রসর হন। দ্বিতীয় কারণটি আরও জরুরী। শক, হুন, পাঠান, মুঘল সবাই ভারতে এসেছে স্থলপথে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়ে। কিন্তু ইউরোপীয়রা ভারতে ঢুকছে দক্ষিণদিকে সমুদ্রপথ দিয়ে উত্তরে যখন মুঘল আধিপত্যের জন্য লড়াই চলছে, তখন দক্ষিণে প্রায় নীরবে পর্তুগিজরা তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে ফেলেছে। গুজরাট অভিযানের সময় আকবর প্রথম পর্তুগিজদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের নৌ-শক্তি দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও চিন্তিত হন। ক্রমে তারা আরব সাগরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং ভারতীয় বণিকদের ও মুসলিম হজ যাত্রীদের উপর নানা ধরনের উৎপীড়ন শুরু করে। দুর্বল দক্ষিণী রাজ্যগুলো প্রথমদিকে পর্তুগিজদের অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের হাত থেকে গোয়া পর্তুগিজদের দখলে চলে আসে। দুরদর্শী, বিচক্ষণ এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত সাম্রাজ্যের প্রকল্প কথা যিনি ভেবেছিলেন সেই আকবরের পক্ষে পর্তুগিজদের অগ্রগতি রোধ করার গুরুত্ব বুঝতে স্বভাবতই দেরি হয়নি।

আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় সেখানকার মুসলমান রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের সুযোগ নিয়ে আকবর আব্দুর রহিম খান (খান-খানান) এবং যুবরাজ মুরাদকে দাক্ষিণাত্য অভিযানের দায়িত্ব দেন। মুঘল-বাহিনী আহম্মদনগর অবরোধ করে। কিন্তু মুরাদ ও আব্দুর রহিমের মতভেদের জন্য আক্রমণের গতি কিছু শ্লথ হয়ে পড়ে।

এই সময় সুতলান দ্বিতীয় নিজাম শাহ'র মৃত্যু ঘটলে (১৫৯৪ খ্রীঃ) আহম্মদনগরের অবস্থা জটিল হয়ে উঠে।

নিজাম শাহ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিম শাহ সুলতান হন। কিন্তু বিজাপুরীদের আকস্মিক আক্রমণে তিনি নিহত হন। এ অবস্থায় আহম্মদনগর দরবারের তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসে পড়ে। বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজ নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাতে তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে রাজ্যে প্রায় গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি দেখা দেয়। আহম্মদনগরের প্রধানমন্ত্রী (পেশোয়া) মিঞা মঞ্জু (Mian Manju) ইব্রাহিমের নাবালক পুত্র বাহাদুর শাহকে সিংহাসনের বৈধ অধিকারী বলে দাবি করেন। প্রাক্তন সুলতান নিজাম শাহের ভগ্নী চাঁদবিবিও বাহাদুর শাহের পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু দরবারের অন্তত তিন বিরোধী গোষ্ঠী এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে থাকে। এই সময় মিঞা মঞ্জু একটা ভুল করে বসেন। তিনি দরবারের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার আশায় মুঘলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আকবর এই আহ্বানে দ্রুত সাড়া দেন। তাঁর নির্দেশে শাহজাদা মুরাদ এবং খাই-ই খানান যথাক্রমে গুজরাট ও মালব থেকে নিজ নিজ বাহিনীসহ আহম্মদনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১৫৯৫-এর নভেম্বরে মুঘল বাহিনী আহম্মদনগরের সীমান্তে উপস্থিত হয়। কিন্তু মুঘল বাহিনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিঞা মঞ্জু সন্দিহান হয়ে পড়েন। বস্তুত, মুঘল বাহিনী মিত্র হিসেবে এখানে উপস্থিত হয়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আহম্মদনগর দখল করা। ফেরিস্তা লিখেছেন: "instead of coming as allies–they came as invadors."

মুঘলের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে মিঞা মঞ্জু তাঁর বাহিনী ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে বিজাপুর সীমান্তের দিকে সরে যান। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিজাপুরের সাহায্য গ্রহণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চাঁদবিবি ছিলেন বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহের বিধবা পত্নী। দুঃসাহসিক এই মহিলা আহম্মদনগর দুর্গ রক্ষার তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। তিনিও বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় দূত পাঠিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুঘল বাহিনী দুর্গ অবরোধ করে নানাভাবে আক্রমণ চালাতে থাকে। চাঁদবিবিও সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে মুঘলের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করতে থাকেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি এই সময় থেকে 'চাঁদ সুলতানা' নামে প্রশংসিত হতে থাকেন। এদিকে মিঞা মঞ্জু বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সাহায্য নিয়ে আহম্মদনগর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সংবাদে মুরাদ কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়েন এবং সন্ধি স্থাপন করাই উপযুক্ত বিবেচনা করে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে এক সন্ধি দ্বারা মুঘলগণ বাহাদুর শাহকে 'বৈধ সুলতান' বলে স্বীকার করে নেয়। চাঁদবিবি ও বাহাদুর শাহ মুঘলের আনুগত্য মেনে নেন এবং বেরার প্রদেশটি মুঘলদের ছেড়ে দেন। কিন্তু এই সন্ধিতে অসন্তুষ্ট কিছু অভিজাত চাঁদবিবিকে ক্ষমতাচ্যুত করে মুঘলদের আনুগত্য অস্বীকার করে এবং বেরার থেকে মুঘল-কর্তৃত্ব হটাতে উদ্যোগ নেয়। আব্দুর রহিম খানের নেতৃত্বে মুঘল-বাহিনী আহম্মদনগর আক্রমণ করে এবং অস্তির যুদ্ধে (১৫৯৭ খ্রীঃ) বিজয়ী হয়। কিন্তু এই বিজয় দাক্ষিণাত্যে মুঘল আধিপত্য প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়নি। এই সময় মুরাদ মারা গেলে অপর শাহজাদা দানিয়েল দাক্ষিণাত্য অভিযানের পরিচালনার দায়িত্ব নেন। শেষ পর্যন্ত ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে আকবর স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন। কিন্তু আকস্মাৎ খান্দেশ মুঘলের মিত্রতা অস্বীকার করে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। খান্দেশের সুলতান রাজা আলি খাঁ মুঘলের মিত্র ছিলেন। এমনকি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল-বাহিনীর সপক্ষে আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি প্রাণ দেন। কিন্তু তাঁর পুত্র মীরন বাহাদুর শাহ খান্দেশের সিংহাসনে বসে মুঘলের বশ্যতা অস্বীকার করেন। ফলে মুঘল-বাহিনী দু-ভাগে বিভক্ত হয়। একই সাথে আহম্মদনগর ও খান্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আহম্মদনগর ও ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে খান্দেশের অসিরগড় দুর্গ মুঘলের হস্তগত হয়। অবশ্য অসিরগড় দুর্গের পতন ঘটানোর জন্য তিনি কিছুটা শঠতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু আকবর এখানেই তাঁর লোভ সংবরণ করেন। বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়) এবং গোলকুণ্ডার সুলতান কুতুব শাহকে শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন এবং শাহজাদা দানিয়েলের সাথে অদিল শাহের কন্যার বিবাহ স্থির করেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে রাজধানীতে ফিরে যান। দানিয়েলের সাথে বিজাপুর রাজকন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয় (১৬০৪ খ্রীঃ)। অসিরগড় দখল ছিল আকবরের যুদ্ধনীতির শেষ দৃষ্টান্ত।

১২.৫ উপসংহার

আকবর সাম্রাজ্য প্রসারণের সময় থেকেই এই সত্য অনুধাবন করেন যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, গুজরাট, বাংলা ও দাক্ষিণাত্য জয় করতে না পারলে তাঁর সাম্রাজ্য কখনই সর্বভারতীয় চরিত্র লাভ করবে না। অন্য একটি বড়ো চিন্তা ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কারণ অতীতে বারংবার উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথগুলি দিয়ে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতকে আক্রমণ করা হয়েছে। আকবর এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করেন এবং কাবুল-কান্দাহার পর্যন্ত মুঘল আধিপত্য স্থাপিত হয়। গুজরাট ছিল অত্যন্ত সম্পদশালী। তিনি গুজরাট দখল করে মুঘল সাম্রাজ্যের গরিমা ও সম্পদ দুই-ই বৃদ্ধি করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি মুঘল আধিপত্য স্থাপন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মুঘল শক্তি প্রথম আকবরের সময় দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়। পর্তুগিজ শক্তির বিপদ সম্পর্কে তিনি যে অসচেতন ছিলেন তা নয়। সাম্রাজ্য বিস্তারে আকবরের এই বিবিধ উদ্যোগ পরবর্তীকালের মুঘল শাসকদের সামনে উদাহরণ রূপে স্থাপিত হয়।

১২.৬ প্রশ্নাবলী

১. উত্তর-পশ্চিম ভারত সম্পর্কে আকবরের নীতি পর্যালোচনা করুন।
২. আকবর কীভাবে গুজরাটে মুঘল আধিপত্য কায়েম করেছিলেন?
৩. আকবর কি দাক্ষিণাত্যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন?

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989.

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Satish Chandra, *Medieval India, From Sultanat to the Mughals, 1526-1748*, Part-II, 2019

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750,* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000 - 1765,* UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest. War, Environment and Empire in Mughal North India, Oxford, 2019.*

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707,* OUP, 2013

Iswari Prasad, *The Mughal Empire. Allahabad*, Chugh Publications, 1974

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

একক : ১৩ ❐ মুঘল শাসনে বাংলাদেশ

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ ভূমিকা

১৩.২ মুঘল শাসনে বাংলাদেশ : প্রারম্ভিক কথা

১৩.৩ মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা; বারো ভুঁইঞাদের আত্মসমর্পণ; মানসিংহ ও ইসলাম খাঁর শাসনকাল

১৩.৪ বাংলাদেশে মুঘল রাজত্বের প্রকৃতি

১৩.৫ মুঘল শাসনে বাংলার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

১৩.৭ উপসংহার

১৩.৮ প্রশ্নাবলী

১৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন —

- বাংলাদেশে মুঘল শাসনের প্রকৃতি
- বারো ভুঁইঞাদের আত্মসমর্পণ
- মুঘল বাংলায় বিদ্রোহ
- মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা
- মুঘল শাসনে বাংলার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

১৩.১ ভূমিকা

বাংলাদেশে মুঘল শক্তির আবির্ভাব ও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একটি বড় ঘটনা। ষোড়শ শতকে বাংলাদেশ বলতে বোঝাত ছোট-বড় নানা সামন্তশক্তিদের দ্বারা বিজিত রাজ্য বা রাজ্যাংশের সমাহার — যাকে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে একটি ভৌগোলিক প্রকাশ (geographical expression)। মুঘল শাসকরা এই বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট ভৌগোলিকভাবে অস্তিত্বশীল রাজনৈতিক এককগুলিকে একটি অখণ্ড সুদৃঢ় রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত এবং একটি অবিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ঐক্যের মধ্যে বিধৃত সাম্রাজ্যের অঙ্গরাজ্যরূপে গড়ে তুললেন। কীভাবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব একটি রাজনৈতিক ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল তা জানার জন্যই আমাদের এই পাঠ্য ঔপনিবেশিক যুগ আরম্ভ হবার আগেই যে বাংলাদেশ একটি সমর্থ রাজনীতি এবং একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা মুঘল বাংলার ইতিহাস পড়লে বোঝা যায়। আকবরের শাসনকালে সুবাবাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৯টি সরকার। *আইন-ই-আকবরি*তে উল্লেখিত ১৯টি সরকারের প্রাকৃতিক সীমার সর্বত্র আকবরের সময়ে মুঘল শাসনাধীনে আনা সম্ভবপর হয়নি। মুঘল শাসন

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় বণিক ও তার ছদ্মবেশে আসা নতুন সাম্রাজ্যবাদী পশ্চাত্য শক্তিদের আটকাতে পারেনি। এই ব্যর্থতার কারণ জানাও আমাদের লক্ষ্য। তবে আমরা জোর দেব মুঘল যুগের উন্নয়নশীল সমাজ ও অর্থনীতির ওপর। বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ করলে অনেক সময়ে একটা বিকৃত ধারণা হয় যে আমাদের যাবতীয় উন্নতি হয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগে। বাংলাদেশে মুঘল শাসনের ইতিহাস পড়লে এ ধারণা যে ভুল তা প্রতিপন্ন হয়। বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য, দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তি, বস্ত্রশিল্পের হাত ধরে সাধারণভাবে শিল্পের উন্নয়ন, ব্যবসার ব্যাপ্তি, বহির্বাণিজ্যের ভূমিকা, সেই বাণিজ্যের রথে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি, তার ফলে প্রচুর সোনা-রূপার (bullion) আমদানি, স্থিতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থা — এ সবই হয়েছিল মুঘল যুগে। এ পরিবর্তনের ছবিটি যত ব্যাপক ততই গভীর। আমরা সংক্ষেপে তার ইতিহাস পড়ব। মনে রাখতে হবে যে, এ ইতিহাস একটা রূপান্তরের ইতিহাস, একটা পরিবর্তনের ইতিহাস। এ পরিবর্তনের অন্তর্পটে যে সৃষ্টিশীলতার দিক তার দিকেই আমাদের দৃষ্টি মূলত নিবদ্ধ থাকবে। পরিবর্তনশীলতার প্রসারিত দিগন্তকে তা না হলে আমরা আমাদের পাঠ্যসীমার মধ্যে ধরে রাখতে পারব না। রূপান্তরের ইতিবাচক দিকগুলিই হবে সাধারণভাবে আমাদের পাঠ্য।

১৩.২ মুঘল শাসনে বাংলাদেশ : প্রারম্ভিক কথা

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ সম্রাট আকবরের সেনাপতি মুনিম খান তুকারোয়ের যুদ্ধে (Battle of Tukaroi) বাংলার সুলতান দাউদ কররাণীকে পরাজিত করেন। এটি ছিল আইনগতভাবে মুঘলদের প্রথম বাংলা বিজয়। এই বিজয়ের ফলে মুঘলরা বাংলার সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, কিন্তু বাংলায় আফগান শাসনকে নির্মূল করে সেখানে নিজের আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররাণী দ্বিতীয়বার মুঘলদের হাতে পরাজিত হন। মুঘলরা তাঁকে হত্যা করে। বাংলাদেশে মুঘল শাসন কায়েম করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা অপসারিত হয়।

বলা হয়ে থাকে যে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম যুদ্ধ বিজয় থেকে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর মুঘল সম্রাট নূর-উদ-দিন জাহাঙ্গিরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত যে কিঞ্চিৎ-অধিক অর্ধশতাব্দীকাল তার মধ্যেই বাংলাদেশে মুঘল শাসন কায়েম হয়েছিল। তারপর থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি মাসে ঔরংজেবের বাংলার নবাব শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুঘলদের বাংলার ভূ-ভাগের রাজ্য জয়ের জন্য বড়ো লড়াই করতে হয়নি। দু-একটি বড় বিদ্রোহ দমনের কাজকে বাদ দিলে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের পর চল্লিশ বছর ছিল বাংলাদেশে মুঘলদের প্রান্তিক যুদ্ধের কাল। কোচবিহার রাজ্য, আহোম রাজ্য, আসাম, চট্টগ্রাম, সন্দীপ, আরাকান রাজ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের মগ-পর্তুগিজ জলদস্যু ইত্যাদির বিরুদ্ধে মুঘলদের নিরন্তর লড়তে হয়েছে। বাংলাদেশের মূল ভূ-ভাগ দখল হয়ে গেছে আকবর-জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালের মধ্যেই।

সুলতানি যুগের বাংলার রাজধানী ছিল তাণ্ডা। বর্তমান মালদহ শহরের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ছিল এই শহর। সুলতান দাউদ কররাণীর পিতা সুলতান সুলেমান কররাণী গৌড় থেকে রাজধানী সরিয়ে এখানে এনেছিলেন, ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি মুনিম খাঁ এবং রাজা টোডরমল তান্ডা জয় করেন। স্বয়ং সম্রাট আকবর এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাটনা পর্যন্ত এসেছিলেন। সেখান থেকে মুনিম খাঁ ২০,০০০-এরও বেশি সৈন্য নিয়ে তাণ্ডা জয় করেন। মুঘলবাহিনীর চাপে হাজার হাজার আফগান, যারা মুঘল বিরোধী ছিল তারা বাংলার অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। মুঘলবাহিনী আফগানদের চারটি দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল — উত্তরে ঘোড়াঘাটের, দক্ষিণে সাতগাঁর, পূর্বে সোনরগাঁর এবং দক্ষিণ-পূর্ব ফতেহবাদের (ফরিদপুর শহর) দিকে। ১৫৭৯ থেকে ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই আফগানরা সশস্ত্রভাবে মুঘলদের

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ১৫৮০ থেকে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুঘল মনসবদারদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৫৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভাটি (Bhati) বা পূর্ববঙ্গের সামন্ত জমিদাররা ইশা খানের নেতৃত্বে নিজেদের কর্তৃত্বকে জারি রাখার চেষ্টা করে। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাণ্ডা জয়ের পর থেকে প্রায় বারো বছর বাংলাদেশে অরাজকতা চলেছিল। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত সুবাগুলির জন্য একই প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেন (introduction of uniform Subah administration)। একজন নাজিম বা নবাব, একজন দেওয়ান এবং একজন বকশিকে নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রেরণ করা হল।

বাংলাদেশে মুঘল বিজয়ের প্রথম কুড়ি বছর — ১৫৭৪-১৫৯৪ ছিল অশান্ত পরিবেশকে দমন করার কাল। এই সময় প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশ ছিল অসংখ্য ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যের সমাহার। এইভাবে ছড়ানো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষমতার ঘাঁটিগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়ার কাজ শুরু হয় ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে। সেই বছর রাজা মানসিংহ কাচ্ছাওয়াকে বাংলার শাসক করা হয়। তিনি বাংলায় এলেন সম্রাটের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিরূপে, সর্বোচ্চ আঞ্চলিক শাসনের ক্ষমতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে এসেছিল বিপুল সৈন্যবাহিনী, কারণ এই সময়ে যুবরাজ সেলিমের অধীনে ৫০০০ সৈন্য-প্রধানকে বাংলায় জায়গির দেওয়া হল। এরপর থেকে আরম্ভ হল বাংলায় অভ্যন্তরে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রকৃত প্রচেষ্টা।

১৩.৩ মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা; বারো ভুঁইঞাদের আত্মসমর্পণ, মানসিংহ ও ইসলাম খাঁর শাসনকাল

মানসিংহ বাংলার শাসক হয়ে প্রথমে 'ভাটি' অঞ্চল দখল করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজমহলে নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। সেখান থেকে তিনি অভিযান চালিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিকের ছোট ছোট আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের কর্তৃত্ব ভেঙ্গে দিলেন। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যকেও সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত করা হয়। মানসিংহের এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান পরবর্তী শাসক ইসলাম খাঁ (মে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট ১৬১৩)। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমি, প্যাচেট ও হিজলির জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। এরূপ শুরু হয় বারো ভুঁইঞাদের দমন। ১৬০৯ — ভূষণার রাজ সত্রাজিৎ, ১৬১১ — বাংলার প্রধান জমিদার ইশা খানের পুত্র মুসা খান, ১৬২২ — যশোহর ও বাকলার (বরিশাল) জমিদাররা আত্মসমর্পণ করেন। তারপরেই শ্রীহট্টের বিদ্রোহী আফগানরা মুঘল পরাক্রমের কাছে নতজানু হল। তপন রায়চৌধুরী বলেছেন, এই প্রথম ভৌগোলিকভাবে বাংলার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত মুঘলদের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে গেল। রিচার্ড ইটন বলেছেন যে, ইসলাম খানের রাজত্বকাল থেকে বাংলার ইতিহাসে মুঘল যুগ প্রকৃত অর্থে শুরু হল। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা জয় করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম জয় করার দুটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আহোম রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করে সেখানে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও সফল হয়নি। এই তিনটি ব্যর্থ অভিযান বাংলার অর্থনীতি ও স্থিতিশীলতার ওপর তীব্র আঘাত হেনেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও একটি আঘাত। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান বিদ্রোহ করেন এবং সুবে বাংলার ওপর সাময়িকভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন মগ ও পর্তুগিজ দস্যুরা তাঁর সাথে হাত মিলিয়েছিল। বাংলাদেশে পরিণত হয়েছিল একটি গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ফিদাই খান (Fidai Khan) নামক এক সেনাপ্রধানকে বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠালেন। তিনিই প্রথম শাসক যিনি প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে সম্রাটকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা নগদে বা মূল্যবান উপহারে প্রেরণ করার অঙ্গীকার করেন। সম্রাটের প্রিয়তমা নূরজাহানকে সমপরিমাণ উপঢৌকন দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এইভাবে বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের করদ অঙ্গরাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। শুরু হল বাংলা থেকে সম্পদের বহির্নিষ্কাশন (Drain of wealth)। এরপর থেকে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল এই অর্থে যে, সেখান থেকে অরাজকতা নির্বাসিত

হল, বাংলায় একটি দৃঢ় প্রশাসন চালু হল এবং দেশময় ছড়ানো আঞ্চলিক ঔদ্ধত্যের ঘাঁটিগুলি বিনষ্ট হল।

শাহজাহান ও ঔরঙজেবের রাজত্বকালে নতুন করে বাংলার অভ্যন্তরে ভূ-ভাগ দখল করার প্রয়োজন হয়নি। কখনও কখনও বিদ্রোহের ফলে কোনও কোনও অঞ্চলে সাময়িকভাবে অশান্তি হলেও রাজ্য বিস্তারের জন্য মূল ভূ-ভাগে কোনও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ করতে হয়নি। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যুদ্ধ (সীমান্ত সংরক্ষণ ও মুঘলদের ভৌমিক অধিকার বিস্তার) করতে হয়েছিল শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনটি পর্যায়ে — ১৬১৬-১৬৩৬, ১৬৩৬-১৬৩৮, ১৬৩৯-১৬৫৮। উত্তর-পূর্বে আহোম রাজ্যের সঙ্গে মুঘলদের বিরোধ হয়েছিল এবং দ্বিতীয় মুঘল-আহোম যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে মুঘল অর্থনীতির ক্ষতিও হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহজাহানের সময়ে মুঘল শক্তি আহোম রাজ্যের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। তা হয়েছিল ঔরঙ্গজেবের সময়ে যখন তাঁর সেনাপতি মীরজুমলা বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে নতুন নৌবহর তৈরি করে আহোম রাজ্যের ওপর মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট শাহজাহানের সময়ে পূর্বদিকে মুঘল সীমান্তনীতি আগ্রাসনশীল ছিল না যেমন তা কখনও সম্মুখপ্রসারীও হতে পারেনি। বাংলার অভ্যন্তরভাগে মুঘল সম্রাজ্যের অখণ্ডতাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিল এই সীমান্তনীতির মূল লক্ষ্য। তবুও শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা পূর্ণভাবে প্রশমিত হয়নি। তার প্রভাব ঔরংজেবের রাজত্বকালেও পড়েছিল। কিন্তু বাংলার রাজ্যগত অখণ্ডতা তার দ্বারা বিঘ্নিত হয়নি। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্ত হয়ে বাংলার নদীমাতৃক সমতলভূমিতে শান্তি ও সমৃদ্ধি এসেছিল। এই সুরক্ষিত প্রশান্তি বাংলাদেশে মুঘল শাসনের সবচেয়ে বড় দান।

১৩.৪ বাংলাদেশে মুঘল রাজত্বের প্রকৃতি

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের সরকারি ঐতিহাসিক আবুল ফজল (Abul Fazl) মনে করতেন যে, মুঘল রাজ্যজয়ের প্রতিটি ঘটনাই হচ্ছে পরাজিত রাজ্য ও বিজিত মানবগোষ্ঠীর ওপর তাঁর প্রভুর স্নেহসিক্ত করুণা বর্ষণ মাত্র। তাই *আকবরনামা* গ্রন্থে তিনি লিখলেন যে, সম্রাট আকবর বাংলাদেশ জয় করেছেন কারণ সেখানে কৃষকরা অত্যাচার ও নিষ্পেষণে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছিল। কথাটি সত্য হলে বলতে হবে যে, বাংলাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কৃষকত্রাণের লক্ষ্য নিয়ে। এটি অবশ্য প্রশস্তিকারের বলা কথা। আকবর একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সুলেমান কররানীর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদের দাবিদারদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল তাতে বাংলাদেশে সাময়িকভাবে একটা শক্তিশূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার শাসকগোষ্ঠীর এই আত্মসংহারক দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে বাংলার সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেওয়াই আকবরের লক্ষ্য ছিল। একজন সাম্রাজ্যবাদীর রাজ্যলিপ্সাকে তাঁর প্রশাসনিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির আবরণে ঢেকে দিয়েছেন — বলেছেন যে সুলতান সুলেমান সম্রাটকে মেনে নিয়ে 'আনুগত্যের যে বাহ্যিক পোশাকটি' ('an outer garment of submission') পরিধান করতেন সেই ভণ্ডামির আবরণটুকুও ('scarf of hypocrecy) তাঁর পুত্র দাউদ পরিহার করেছিলেন। অর্থাৎ দাউদ নামক আফগান শাসকটি আকবর নামক মুঘল শাসকটিকে অস্বীকার করে নিজের নামে মুদ্রা ছাপা ও খুতবা পড়া শুরু করে দিয়েছেন। এই অবাধ্যকে শাস্তি দেবার জন্যেই আকবর বাংলাদেশে এসেছিলেন। অর্থাৎ মুঘল দরবারি ইতিহাসের বয়ান অনুসারে বাংলায় আকবরের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল অশান্তি দূর করে সমৃদ্ধির পথে এই অঞ্চলকে নিয়ে যাওয়া।

কৃষকত্রাণ আর অবাধ্যের শাস্তিবিধান এ দুই লক্ষ্য নিয়ে যে শক্তি বাংলাদেশে এসেছিল তাকে বাংলার রাজারা — বারো ভুঁইঞারা প্রতিরোধ জানিয়ছিলেন। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে বারো ভুঁইঞাদের প্রতিরোধকে রোমান্টিকৃত করা হয়েছে, ফলে তথ্য ও যুক্তির নির্মোহ প্রেক্ষিতের বাইরে তাদের অবস্থান হয়ে পড়েছে

অনৈতিহাসিক। একথা বলেছেন আচার্য্য যদুনাথ সরকার। তিনি লিখলেন: "একটি ভুয়ো প্রাদেশিক স্বদেশপ্রীতির বশীভূত হয়ে বাঙালি লেখকরা বাংলাদেশের বারো ভুঁইঞাদের বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিভূ মনে করে থাকেন। তাঁরা এসবের কিছুই ছিলেন না।" —"A false provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the Bara Bhuiyas of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort." এ কথার অর্থই হল যদুনাথ সরকার মুঘল সাম্রাজ্যকে বিদেশি সাম্রাজ্য বলতে অস্বীকার করেছেন। বারো ভুঁইঞাদের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, তাঁরা সবাই ছিলেন 'উঠতি মানুষ' (upstarts) যাঁরা নিজেদের সময়ে বা এক প্রজন্ম আগে ভেঙ্গেপড়া কররাণী রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকার করে দেশের এখানে সেখানে 'প্রভুহীন রাজা' ('Masterless Rajas') রূপে বিরাজ করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খুলনা ও বাখরগঞ্জের দুর্গম সমুদ্রোপকূলে, কেউবা শক্তিশালী ব্রহ্মপুত্রের আড়ালে ঢাকায়, কেউ বা মৈমনসিংহ এবং শ্রীহট্টে জঙ্গলের কোণে তাঁদের রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের তুলনা করা হয়েছে রাজপুতানার সেইসব শিশোদিয়া ও রাঠোর জাতির পুরুষানুক্রমিক রাজাদের সঙ্গে যাঁরা বহু শতাব্দী ধরে পিতৃপুরুষের রক্তরঞ্জিত সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত নিজেদের আবাসভূমিকে রক্ষা করার জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এই ভুল দৃষ্টিকোণ শীর্ষে পৌঁছেছিল যখন জনৈক বাঙালি নাট্যকার যশোরের প্রতাপাদিত্যকে মেবারের রাণা প্রতাপের সঙ্গে তুলনা করলেন। বারো ভুঁইঞাদের মধ্যে কেউই ত্রিপুরা, কামরূপ এবং কোচবিহারের রাজাদের মতন ঐতিহ্যশালী ছিলেন না। ফলে তাঁদের প্রতিরোধ দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যকে 'বিদেশি' (foreign) বলতে যুদনাথ সরকার রাজি ছিলেন না। তিনি দৃপ্তভাবে বললেন "যদি ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসা মুঘলরা বিদেশি আক্রমণকারী হয় তবে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে আসা কররাণীরা এবং কররাণীদের দাস লোহর্ণিরাও তাই ছিলেন।"

আসলে যে বিরাট শক্তি আর দক্ষতা নিয়ে মুঘলরা বাংলাদেশের নৈরাজ্য দূর করছিলেন তাকে অস্বীকার করা যায় না। বিদেশি পর্যটকদের বিবরণী আর রাজস্বের দলিল দস্তাবেজ থেকে এ কথা এখন প্রমাণিত যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ভাগীরথী-পদ্মার জলবিধৌত ব-দ্বীপ বাংলায় (Bengal Delta) মুঘল সাম্রাজ্য একটি প্রতিষ্ঠিত শাসন হিসাবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল। দুটি কারণে তা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, মুঘলদের সঙ্গে হিন্দু বাণিজ্যিক মহাজন শ্রেণিদের সঙ্গে সহযোগিতা বা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক — একটি Collaboration তৈরি হয়েছিল। মুঘলরা এদের দিয়েছিল নিরাপত্তা যার ছত্রতলে মহাজনরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারবে। এর পরিবর্তে মহাজন শ্রেণি যুগিয়েছিল অর্থ, পুঁজি ও রসদ, যা মুঘলরা ব্যবহার করেছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে। এই কথা বলেছেন রিচার্ড ইটন। সারা দেশে হিন্দু বাণিজ্যিক মহাজন শ্রেণিদের স্ব-জাতির ('fellow caste-members') মানুষ ছড়িয়ে ছিল। তারাই মুঘলদের যোগাত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ। রিচার্ড ইটনের এই তথ্য প্রমাণ করে যে, প্রথম থেকেই মুঘল রাষ্ট্র ছিল একটি সহযোগিতার রাষ্ট্র। হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের সহযোগিতার ওপর তা দাঁড়িয়েছিল।

বাংলাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বড় কারণ ছিল তার প্রায় অপরাজেয় সামরিক যন্ত্র। মুঘলরা বারুদ শস্ত্র —'Gunpowder weaponry'— যেভাবে ব্যবহার করেছে সেভাবে এর আগে তা ব্যবহৃত হয়নি। এজন্য অনেকেই মনে করেন যে মুঘল সাম্রাজ্যকে 'বারুদ-সাম্রাজ্য' —'Gunpowders Empire' বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, অশ্বারোহী তীরন্দাজ বাহিনী (mounted archers) এবং পরবর্তীকালে গড়ে তোলা নৌবহর মুঘল গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিল বলে মুঘল শক্তি এক অপরাজেয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। অনেকাংশে মুঘল রাষ্ট্র যে একটি সামরিক রাষ্ট্র ছিল এ কথা অস্বীকার করা

যায় না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাকে সামরিক রাষ্ট্র বললে ভুল বলা হবে। মুঘল সাম্রাজ্যের আগে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত যে কোনও রাজ্য থেকে মুঘলরাজ্য ভিন্ন ছিল। রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে মুঘলরা ভিন্নতর একটা কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছিল। যেহেতু উত্তর ভারত থেকে আসা মুঘল সৈন্যরা রণক্লান্ত ছিল, যেহেতু নদীমাতৃক দেশের গতিবিধির বিজ্ঞান তাদের জানা ছিল না এবং যেহেতু বাংলার অস্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ায় তাদের আয়ুক্ষয় হত সেহেতু তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল ছিল। মুঘলরা তাই উৎকোচ, উপঢৌকন, স্তুতি, তর্জন-গর্জন, বন্ধুত্ব, সংযম ইত্যাদির সাথে মিলিয়েছিল সন্ত্রাস, শাসন, অত্যাচার, নির্মমতা, নৃশংসতার নীতি। এমন প্রলোভন আর ত্রাসের নীতি এর পূর্বে এত ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়নি। মুঘলরা বাংলায় স্থানীয় সামন্তদের সামনে দুটি বিকল্পকে হাজির করেছিল — হয় মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে মুঘল-আনুগত্য-কাঠামোর মধ্যে পুরস্কার আর স্বস্তি নিয়ে রাজ্যসুখ উপভোগ করা, না হয় মুঘল-বিরোধিতা করে ধ্বংস হওয়া। বাংলার জমিদার আর রাজারাও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলেন যে, মুঘল শাসনের আর্বিভাব কোন শীর্ষদেশের একজন শাসকের পরিবর্তন নয়, শাসনের ওপরতলে ব্যক্তির বাইরে এক শাসক-শ্রেণির বদলে আরেক শাসক-শ্রেণির অভ্যুদয় নয়, এমনকি শুধু গৌড় বা তাণ্ডার স্থানে রাজমহল বা ঢাকায় রাজধানী পরিবর্তন নয়। প্রথম পর্বে বাংলার বারো ভুঁইঞাদের লড়াই এবং তাদের বাইরে কারও কারও সংগ্রাম দেখে কোনও কোনও মানুষ হয়ত মনে করে থাকবেন যে, স্থান থেকে স্থানান্তরে মুঘল বিজয় ছিল হয়ত সামরিক দখলদারি যার মাত্রা ছিল ভিন্ন — বড় কামান, জৌলুসময় দরবার, বৃহত্তম অট্টালিকা আর স্মৃতিসৌধ এইসব নিয়ে চলমান মুসলিম শাসনের রূপান্তরিত আবির্ভাব যার মধ্যে মাত্রার বিবর্তন ছিল (change of scales) কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তন ছিল না। আমরা পরে দেখব ঘটনা তা নয়। যদুনাথ সরকার, জগদীশ নারায়ণ সরকার, তপন রায়চৌধুরী, রিচার্ড ইটন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশ মুঘল শাসনের আগমন ও ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল যার তুলনা বাংলাদেশের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক যুগের ভূমিকা পূর্বে বিরল। রাজদরবার থেকে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের কুটির পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই পরিবর্তন একমাত্র একটি দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় রাষ্ট্রেই সম্ভব। বাংলাদেশে মুঘলরাজ্য এ ইতিবাচক পরিবর্তনের অভিজ্ঞানকে বহন করে একটি স্বীকৃত দেশজ রাষ্ট্রে (indigenous state) পরিণত হয়েছিল।

১৩.৫ মুঘল শাসনে বাংলার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

মুঘল শাসন বাংলাদেশে শান্তি ও প্রগতির নতুন অধ্যায়ের ভূমিকা করেছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের সংযোগ নতুন করে স্থাপিত হয়েছিল এই সময়ে। উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে স্থলপথে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গেও বাংলাদেশের সংযোগ পুনঃস্থাপিত হল। বৌদ্ধধর্ম যেমন তার জন্মস্থান ভারতবর্ষে আর সক্রিয় শক্তিরূপে রইল না এবং যখন বাংলাদেশের শাসকরা — মুসলিম প্রাদেশিক শাসনকর্তারা — দিল্লিশ্বরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করল তখন থেকেই বাংলাদেশ বৃহত্তর উত্তর ভারত ও তার পর বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়েছিল। এই যোগাযোগ আবার ফিরে এল মুঘল যুগে। এইভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝির সময় থেকে বাংলাদেশ যে "সংকীর্ণ একাকীত্বের" ('Narrow isolation') মধ্যে তালিয়ে গিয়েছিল তার থেকে সে মুক্ত হল। কখনও মালয় থেকে কখনও বা সুদূর জাঞ্জিবার (Zanzibar) থেকে, আবার কখনও কখনও বহির্বিশ্বের অন্য কোনও মুসলিম দেশ থেকে বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে বিদেশি বাণিকের জাহাজ বাংলার কূলে ভিড়তে লাগল। বাংলার নিঃসঙ্গতা ঘুচল, বহির্বাণিজ্যের দ্বারও তার সাথে সাথে খুলে গেল।

জলপথের বিশাল বিস্তার, সামুদ্রিক বণিজ্যের নতুন ভূমিকা, এ সবের সাথে বাংলাদেশে এসেছিল পাশ্চাত্যের বণিক ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্য। বণিক ও বাণিজ্যের আড়ালে এসেছিল পাশ্চাত্যের জলদস্যুতা (piracy)। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ভারত ও বাংলার সমুদ্রাঞ্চলে এই দস্যুতার প্রথম আবির্ভাব। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে গোয়ায় এবং গোয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের মাটিতে পর্তুগিজ বণিক ও ইউরোপীয় সামুদ্রিক শক্তির ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অচিরেই পর্তুগিজ নৌবহর ভারত মহাসগরে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতবর্ষ, আরব, আফ্রিকা, মালয় প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যপোত এই পর্তুগিজ আধিপত্যের ছায়ায় তলিয়ে গেল। গোয়ায় পর্তুগিজ ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একশত বছরের মধ্যে দেখা গেল সেখানকার নাবিক ও বণিকরা কেউই লিসবনের (Lisbon) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য ও নির্দেশ না মেনে নিজেদের লাভের জন্য জলদস্যুতা শুরু করে দিয়েছে। এক সময়ে এমন হল যে, মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণে প্রায় সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঠিক এইরকম এক দুর্ভাগ্যের সন্ধিমুহূর্তে বাংলাদেশে এসে পড়েছিল মুঘলশক্তি। দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের আধিপত্য নিয়ে মুঘল শক্তি, আরাকানরাজ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হয়েছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে যখন মুঘলরা চট্টগ্রাম দখল করল তখন এই জলদস্যুদের ঘাঁটি ভেঙ্গে যায়। এর আগেই ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে পর্তুগিজ শক্তিকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম দখলের পর দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে মুঘল কর্তৃক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

এইভাবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের দুটি অক্ষরেখা তৈরি হল। প্রথমটি হল উত্তর ভারতের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে। এই পথ দিয়ে এসেছিল পন্ডিত, ধর্মপ্রচারক, বণিক, কারিগর, সৈন্য এবং প্রশাসক। দীর্ঘদিন উত্তর ভারতের সম্ভ্রান্ত প্রশাসকরা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি। তারা এসে এদেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে নিজেদের দেশে ফিরে গেছে। তার ফলে বাংলাদেশ থেকে অনেক দিন পর্যন্ত বিপুল ধননিষ্কাশন ঘটেছিল। যোগাযোগের দ্বিতীয় অক্ষরেখা তৈরি হয়েছিল জলপথে। এ পথ দিয়ে এসেছিল বণিক, ভবঘুরে ভাগ্যান্বেষী, হার্মাদ জলদস্যু এবং বাণিজ্যের হাত ধরে পণ্য আর সোনা-রূপা। যেহেতু শক্তিশালী নৌবহরের অভাবে সমুদ্রশাসন মুঘলরা করত পারেনি সেহেতু পরবর্তীকালে এই পথ দিয়ে এসেছে বণিকের ছদ্মবেশে পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য শক্তির দল।

১৩.৭ উপসংহার

আকবর ও জাহাঙ্গিরের সময় বাংলার মতন সম্পদশালী প্রদেশে মুঘল আধিপত্য ধীর কিন্তু অপ্রতিহত গতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুঘল বিজয়ের পশ্চাতে অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত, মুঘল সামরিক শক্তি আড়ে-বহরে বাংলার ছোট ছোট শাসক বা আফগান গোষ্ঠীপতিদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বারুদের ব্যবহার। দ্বিতীয়ত, হিন্দু বণিক মহাজন শ্রেণির সহায়তা মুঘলরা লাভ করেছিল — এর ফলে যুদ্ধের সময় অর্থ ও রসদের অভাব মুঘলদের হয়নি। তৃতীয়ত, বাংলার মুঘল বিরোধী শক্তি কখনও ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেনি। বাংলায় বিজয় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে একটি বৃত্ত সম্পন্ন করে। মুঘল শাসনে আসার ফলে বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারত ও মধ্য এশিয়ার যোগাযোগ পুনরায় স্থাপিত হয়। সমুদ্রপথে এই সময় আসে ইউরোপীয় বণিকরা। এই টানাপোড়েনে মুঘল বাংলার ইতিহাস এগিয়ে চলে।

১৩.৮ প্রশ্নাবলী

১. বাংলাদেশে মুঘল রাজত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

২. মুঘল শক্তি কীভাবে বাংলাতে কী কী অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এনেছিল?

৩. বাংলায় মুঘল শাসনের প্রভাব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

১৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989.

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Satish Chandra, *Medieval India- From Sultanat to the Mughals*, *1526-1748,* Part-II, 2019

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750,* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age*, *1000-1765,* UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest. War, Environment and Empire in Mughal North India*, Oxford, 2019.

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India*, *1556-1707,* OUP, 2013

Iswari Prasad, *The Mughal Empire, Allahabad*, Chugh Publications, 1974

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

পর্যায় : ৫ ▢ গ্রামীণ সমাজ এবং রাজস্ব ব্যবস্থা

একক ১৪: জমির স্বত্ব ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা; জমিদার ও কৃষক

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য

১৪.১ ভূমিকা

১৪.২ জমির মালিকানাস্বত্ব

১৪.৩ রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়

১৪.৪ রাজস্ব প্রদানের প্রণালী

১৪.৫ রাজস্ব আদায়কারী প্রশাসন

১৪.৬ জমিদার ও কৃষক

১৪.৭ জমিদারদের উত্তরাধিকার

১৪.৮ জমিদারির আয়তন

১৪.৯ জমিদারের প্রাপ্য

১৪.১০ পদমর্যাদা

১৪.১১ জমিদারের কর্তব্য

১৪.১২ কৃষকের অবস্থা ও তার অধিকার

১৪.১৩ উপসংহার

১৪.১৪ প্রশ্নাবলী

১৪.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই পাঠ গ্রহণের উদ্দেশ্য হল মুঘল আমলের জমির মালিকানা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের ধারণা এই এককে স্পষ্ট হবে:

- মুঘল আমলে জমির মালিকানাস্বত্ত্ব কীরূপ ছিল
- রাজস্ব কীভাবে নির্ধারণ করা হত এবং তা আদায়ের প্রণালী কেমন ছিল
- রাজস্ব আদায়ের প্রশাসনিক কাঠামো কেমন ছিল
- জমিদারদের উত্তরাধিকার, জমিদারের কর্তব্য, জমিদারের প্রাপ্য, পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই পাঠে।
- জমিতে কৃষকের অধিকার কতটা ছিল, তাদের অবস্থা কেমন ছিল।

১৪.১ ভূমিকা

যে কোনো প্রাক-আধুনিক প্রাক-পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-শক্তির আয়ের মূল উৎস হল তার ভূমি রাজস্ব। মুঘলরা সারা ভারত ব্যাপী যে সুবৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তার নেপথ্যে ছিল দক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলায় তাদের সাফল্য। রণক্ষেত্রে তারা যেমন সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছিল, তেমনি ভূমি রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থায়ও উদ্ভাবনী শক্তির স্বাক্ষর রেখেছিল। যে সুগঠিত রাজস্ব ব্যবস্থা তারা গড়ে তুলেছিল, তা মুঘল প্রশাসনের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিল। ফলে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সঙ্গতি থাকায় এদেশে তাদের পক্ষে বেশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করা সম্ভব হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে আয়ে-ব্যয়ের এই সঙ্গতি নষ্ট হয়ে গেলে সাম্রাজ্য সংকটের সম্মুখীন হয়।

১৪.২ জমির মালিকানাস্বত্ব

মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার পূর্বে জমির মালিকানাস্বত্ব সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

ষোড়শ শতকের ভারতে জমির মালিক কৃষক ছিল না। জমির মালিকানা কেবল রাজার হাতেই ন্যস্ত ছিল। ইউরোপীয় পর্যটকদের বর্ণনায় এমন কথাই বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রায় সকলেই এই ধারণায় বিশ্বাস করে গেছেন কিন্তু এখন আর এ ধারণা সত্য বলে গ্রাহ্য নয়। বরং স্পষ্ট করে বলা হয় যে, হিন্দু বা মুসলমান প্রচলিত সমকালীন কোন বিধানেই ঐরকম কোন নীতির স্বীকৃতি নেই। মধ্যযুগের ভারতীয় গ্রন্থ প্রণেতাদের রচনা বা বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজে এমন কথা কোথাও লেখা নেই যে, যা থেকে বলা যায় যে সম্রাটই ছিলেন সমস্ত জমির মালিক। বরং আবুল ফজলের রচনায় অন্য ইঙ্গিত মেলে। তিনি চাষি ও ব্যবসায়ীদের ওপর কর বসানোর উদ্যোগকে সমর্থন করতে গিয়ে যুক্তি দেখান যে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে বাদশাহকে যে ব্যবস্থা করতে হয়, তারই বিনিময়েই এই করকে বাদশাহীর পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য করতে হবে। কিন্তু জমির মালিক বলে বাদশাহকে কর প্রদান করতে হবে ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে এমন কোনো ইঙ্গিত কোথাও মেলে না। বরং সেখানে জমির আসল মালিক ছিল চাষি এর সমর্থনে এখন অনেকেই জোরের সাথে বলছেন, যদিও তারা এ বিষয়ে খুব বেশি প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। অধ্যাপক ইরফান হাবিব এমন কিছু প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন যেখানে কৃষককে জমির মালিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, আওরঙ্গজেবের এক ফরমানে 'মালিক' ও 'আরবাব-এ-জমিন' (জমির মালিক) বলতে সাধারণ চাষিকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তথ্যে যা-ই থাকুক না কেন বাস্তবে চাষিরা জমির মালিক বলতে যা বোঝায় চাষিদের কি সেই অধিকার ছিল?

ইরফান হাবিব মনে করেন, মুঘল আমলে চাষি যে জমি চাষ করে সেই জমির উপর তার স্থায়ী ও বংশগত দখলিস্বত্বের ব্যাপারে একটা সাধারণ স্বীকৃতি ছিল। মুহম্মদ হাসিমকে যে ফরমান দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল চাষি বা মালিক যদি জমি চাষ করতে না পারে, বা সম্পূর্ণ ফেলে রাখে তাহলে চাষ করতে রাজি আছে এরকম কোন ব্যক্তিকে ওই জমি দিয়ে দেওয়া হবে যাতে ভূমি রাজস্বে ঘাটতি না পড়ে। কিন্তু কোন সময় মালিক যদি সেই জমি চাষ করার সামর্থ্য ফিরে পায় সেখানে আবার ফিরে আসে তাহলে সেই জমি তাকে আবার ফেরত দিতে হবে। চাষির দখলী স্বত্ব যে অস্বীকার করা যায় না তার স্বীকৃতি রয়েছে আকবর ও জাহাঙ্গিরের আমলে দুটি বিধানে। প্রথমটি পাওয়া যায় *আইন-ই-আকবরি*-তে। রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সেখানে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, তারা যেন চাষিদের মালিকানাকে ('রাইয়ত কাস্তা')-কে 'মাদাদ-ই-মাস' এর অধিকারীদের খুদ-কাস্তা বা নিজ চাষের জমি হিসেবে নথিভুক্ত না করে।

আর একটি প্রমাণ হল জাহাঙ্গির সিংহাসনে বসার পর যে বারোটি আদেশনামা জারি করেন, তার একটি। সেখানে রাজস্ব দপ্তরের কর্মীদের বলা হয়েছে, তারা যেন চাষিদের জমি জোর করে নিজেদের জমিতে পরিণত না করে। তাছাড়া *আইন-ই-আকবরিতে* আছে যে যারা পুরুষানুক্রমিক ভাবে চষা জমির মালিক বাদশাহ তাদের রক্ষা করেন। অর্থাৎ জমিতে চাষিদের অধিকার যে বংশগত (মৌরসি) ছিল তা আবুল ফজলও বলেছেন। চাষিদের এই মৌরসি জমির কথা কাফি খাঁ-ও উল্লেখ করেছেন। মহম্মদ হাসিমকে দেওয়া ফরমানে দেখা যায় যে চাষির জমি বিক্রির অধিকার ছিল সেকালে। কিন্তু মনে রাখতে হবে আধুনিককালে মালিকের ইচ্ছামত জমি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাবার অধিকার মুঘল আমলের কৃষকদের ছিল না। জমি চাষির অধীন হলেও চাষিও আবার জমির অধীন ছিল। উত্তরাধিকারী না থাকার ফলে চাষের পক্ষে জমি ছেড়ে চলে যাওয়া বা চাষ করতে নারাজ হওয়া- এ দুটোর কোনটাই সম্ভব ছিল না। ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক গেলেইসেন পোল্যান্ডের ভূমিদাসদের সঙ্গে ভারতীয় চাষিদের কোন তফাৎ দেখেননি। কারণ ভারতীয় চাষিরা পোলাণ্ডের মত বীজ বুনতে বাধ্য ছিল। মহাম্মদ হাসিমকে দেওয়া ফরমানটিতে বলা হয়েছিল যে, চাষির যদি চাষ করার ক্ষমতা থাকে ও সেচের যদি ব্যবস্থা থাকে, তবুও যদি দেখা যায় তারা কৃষিকার্য করছে না, তাহলে রাজস্ব কর্মচারীদের উচিত তাদের ওপর জুলুম করা, ভয় দেখানো এবং বন্দী করা ও দৈহিক শাস্তির ভয় দেখানো। এসব জবরদস্তি সত্ত্বেও যদি দেখা যায় কোন চাষি চাষ করতে অক্ষম তাহলে অন্তত সাময়িকভাবে সে জমির উপর তার অধিকার হারাবে এবং তা হাত বদল করা যেতে পারে। ঔরঙ্গজেবের আমলে গ্রামের ভারপ্রাপ্ত সরকারি আমলাদের কথা দিতে হতো যে, তারা কোন চাষিকে জমি ছেড়ে যেতে দেবে না। তৎসত্ত্বেও যে সব চাষি ফেরার হয়ে যেত তাদের জমি অন্যান্য বসবাসকারীদের মধ্যে বিলি করার দায়িত্বও ঐ আমালাদেরই ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চাষি জমি ছেড়ে অন্য কোন জমিদারের এলাকায় পালিয়ে গেলে তাদেরকে আবার জোর করে ফিরিয়ে আনা হতো। জমির সাথে কৃষকের এই বাধ্যতামূলক বন্ধনের প্রক্রিয়াকে লক্ষ্য করে ইরফান হাবিব মুঘল কৃষকদের জীবনকে 'আধা-ভূমিদাস জীবন' বলেছেন। চাষিদের দখলিস্বত্ব মেনে নেওয়ায় প্রশাসন যে উৎসাহ দেখিয়েছিল চাষিকে জমির সঙ্গে যুক্ত রাখতে তথা চাষি যাতে জমি ছেড়ে পালিয়ে না যায় সে ব্যাপারে উদ্বেগ দেখিয়েছিল সে যুগে সেটা ছিল খুব স্বাভাবিক। কারণ তখন লোক সংখ্যা ছিল কম। আর জনসংখ্যার তুলনায় কৃষি জমির পরিমাণ ছিল বেশি। মুঘল যুগে অনেক অঞ্চলে মোট জমির অর্ধেকের বেশি চাষ হতো না। ফলে চাষি করতে চাইলে জমির অভাব ছিল না। অন্যদিকে কৃষকের জীবনযাত্রার মান ছিল খুব সাধারণ বা নীচু মানের এবং কুঁড়েঘর ছাড়া তাদের এমন কোনো স্থাবর সম্পত্তি ছিল না যে তাকে ভিটেয় আটকে রাখবে। *বাবরনামা*-য় বাবর লিখেছেন, হিন্দুস্থানে পাড়াগাঁ, গ্রাম এমনকি শহরগুলো মুহূর্তের মধ্যে যেমন জনশূন্য হয়ে যায়, তেমনই আবার গড়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যেই। বছরের পর বছর ধরে বেশ বড় শহরেই বাস করেছেন এমন সব লোক যদি পালায় তারা এমনভাবে পালায় যে এক-দেড় দিন বাদে তাদের বসবাসের কোন চিহ্ন বা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে যে জায়গায় বসবাস করবে ঠিক করে সেখানে তারা না কাটে খাল, না দেয় নদীতে বাঁধ, কারণ সব শস্যই তো হবে বৃষ্টির জলে। ভারতের জনসংখ্যা বিপুল। একসঙ্গে কিছু লোক জড়ো হলেই তারা পুকুরঘাটে কিংবা কূপ খনন করে; আর বাড়ি তৈরি বা দেওয়াল তোলার সমস্যা নেই। চারিদিকে তো অজস্র ঘাস আর অজস্র গাছগাছালি। তা দিয়েই গড়ে ওঠে কোন গ্রাম বা শহর।' সে যুগে চাষির বারংবার বাসস্থান পরিবর্তনের এই ক্ষমতাই সে যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে দুর্ভিক্ষ হলে বা চাষির উপর অত্যাচার হলে তারা স্থান পরিত্যাগ করতো। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় কৃষকদের জমি থেকে পালানোর উপর রাষ্ট্র কেন উদ্যোগী হয়েছিল।

চাষি আইনগতভাবে তার জমি ছেড়ে যেতে পারত না, প্রকৃতপক্ষে সে ছিল ভূমিদাসেরই শামিল। ইরফান হাবিব তাই মনে করেন, জমির প্রকৃত মালিকানা না ছিল রাজার, না ছিল চাষির। জমি ও ফসলের উপর বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল বটে কিন্তু সম্পত্তির অধিকার বলতে কিছু ছিল না। তবে সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়েই যে কৃষক জমি থেকে পালিয়ে যাবে এমন আতঙ্ক ছিল তাও কিন্তু নয়। এমনও জমি ছিল যা অসাধারণ উর্বর। সেচের সুবিধা বর্তমান বা বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত যেখান থেকে সহজেই ফসল নিকটবর্তী শহর অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বিক্রি করা সম্ভব। এরকম স্থানে কৃষক যে কোন শর্তে চাষ করতে রাজি ছিল। সরকারি কর্মী বা জমিদারদের সেক্ষেত্রে ভয় ছিল না যে, চাষিকে উচ্ছেদ করলে ওই জমি চাষের জন্য অন্য চাষি পাওয়া যাবে না।

ইরফান হাবিবের মতে মুঘল ভারতে কৃষি ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হল উদবৃত্ত উৎপাদনের পুরোটাই রাষ্ট্র কর্তৃক আত্মসাৎ করা। বেচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই চাষির হাতে রেখে বাকিটুকু ভূমিরাজস্ব 'মাল' হিসেবে আদায় করা। একই রকমভাবে গুজরাট প্রসঙ্গে গেলেইনসেন যা বলেছেন তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, উচ্চহারে রাজস্ব আদায়ের ফলে মুঘল আমলে জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় করা চাষির পক্ষে সম্ভব ছিল না। উৎপাদনের এত স্বল্পই আর অবশিষ্ট থাকত যে তাদের ভাগের অংশ জোটাবার পূর্বেই তা খাওয়া হয়ে যেত। একই রকম কথা বলেছেন পেলসার্ট। তার বক্তব্য, "চাষিদের কাছ থেকে এত বেশি নিংড়ে নেওয়া হয় যে তাদের পেট ভরানোর জন্য শুকনো রুটিও আর পড়ে থাকে না।" এতো গেল বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বা ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত। কিন্তু মুঘল রাষ্ট্রের এ ব্যাপার দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে। *আইন-ই-আকবরি*-তে তিনি জানিয়েছেন যে, শাসকের প্রতি প্রজার অর্থনৈতিক দায়িত্ব কোন নৈতিকতার সীমারেখা দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। তার প্রাণ ও সম্মানের রক্ষক এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি প্রজাকে সম্পত্তি ছেড়েও দিতে বাধ্য করে, তবুও তার উচিত কৃতজ্ঞ থাকা। তবে সেই সাথে তিনি এও বলেছেন যে, 'ন্যায়পরায়ণ সম্রাটরা' প্রয়োজনের অতিরিক্ত আদায় করেন না। তবে এই পরিমাণ নির্ধারণ অবশ্য তারাই করে থাকেন।

১৪.৩ রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়

বস্তুত মুঘল যুগে উদবৃত্ত উৎপাদন কী হারে রাষ্ট্র কর্তৃক আদায় হতো, তা সঠিক জানা সম্ভব নয়। স্থানভেদে এই উদ্বৃত্ত আদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। এক্ষেত্রে দু'টি সূচক ক্রিয়াশীল ছিল। এক, জমির উৎপাদন ক্ষমতা, স্থানভেদে যার তারতম্য ঘটত। আর দুই হল, সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী জীবনধারণের ন্যূনতম মাত্র। কৃষকের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন বা ফসল রেখে দিয়ে বা যতটা উৎপাদন না নিলে কৃষক বেঁচে থাকতে পারে সে সম্পর্কে স্থানীয় স্তরে নির্দিষ্ট এখানকার শাসনকর্তাদের নিশ্চয় জানা ছিল। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ তাই সম্ভবত সাধারণত উদ্বৃত্ত উৎপাদনের অধিক হত না।

মুঘল যুগে রাজস্ব ব্যবস্থা ভিত্তি নির্মাণ করেন আকবর। এক্ষেত্রে শেরশাহের প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা ইসলামীয় রীতি অনুসরণ করে তৈরি হয়নি। কারণ শরিয়ত-এ উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করার কথা বলা হয়েছে। এই উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশকে 'খরাজ' বলা হয়। মুঘল আমলে অনেক সময়ই উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশি রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হতো। এটা আবার ভূমি-রাজস্ব বা ইংরেজীতে rent বলতে যা বোঝায় তাও নয়, যা ইউরোপীয় সামন্ত ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল। ইংরেজ আমলে ভূমি-রাজস্ব বলতে যা বোঝাতো এটা তাও ছিল না। কারণ ব্রিটিশ আমলে জমির পরিমাণের ওপর কর নেওয়া হতো। কতটা জমি আছে তার হিসেব করে কর ধার্য করা হতো। এই রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল মূলত 'মাল'

প্রধান কর। রাষ্ট্রের তরফে উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ দাবি করাকে বলা হয় 'মাল'। হিন্দিতে 'বাতাই' এবং ফারসিতে 'গল্লা-বখ্‌শী' শব্দের অর্থ এই মাল শব্দের কাছাকাছি অর্থ বহন করে। 'বাতাই' বা 'গাল-বখ্‌শী' উৎপন্ন ফসলের ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়। একটা অংশ নেয় খাজনা আদায়কারী বা সরকার আর বাকিটা নেয় খাজনা প্রদানকারী ব্যক্তি। উৎপাদিত শস্যের কত অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হতো তা কৌতুহলের বিষয়। সর্বত্র একই হারে তা আদায় হতো না। যেমন থাট্টায় উৎপন্ন ফসলের ১/৩ অংশ আদায় করা হতো রাজস্ব হিসাবে। কিন্তু সিন্ধুপ্রদেশের প্রশাসন সংক্রান্ত রচনা *মজহার-এ-শাহজানী*-তে দেখা যায় যে, *আইন-ই-আকবরি* রচনার সময় উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশি নেওয়া হতো না, এবং কোনো কোনো জায়গায় ১/৩ বা ১/৪ অংশও নেওয়া হতো। অর্থাৎ বোঝা যায় যে সাধারণত উৎপন্ন শস্যের ১/২ অংশ বা অর্ধেক রাজস্ব হিসেবে নেওয়া হতো। কখনও আবার কমও নেওয়া হতো। কাশ্মীরে আকবরের আমলে প্রশাসনিক হিসেবে রাজস্ব দাবির হার নির্ধারিত ছিল ১/৩ অংশ। কিন্তু বাস্তবে তা আদায় হতো উৎপাদনের ২/৩ ভাগ। আকবর অবশ্য উৎপাদনের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মরু অধ্যুষিত আজমীর প্রদেশে আবার উৎপন্নের ১/৭ অংশ বা ১/৮ অংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। সপ্তদশ শতকে হিসাবশাস্ত্র সম্পর্কে রচিত এক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। নাম *দস্তুর-আল-আমল-এ নভিসিন্দগী*। রাজস্ব নির্ধারণে যে দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় 'কানকূট' ব্যবস্থায় গম বাদে অন্যান্য সমস্ত রবি শস্যের ক্ষেত্রে যেমন, তুলো, বার্লি, ছোলা, সর্ষেবীজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদনের ১/২ অংশ হারেই রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। গমের বেলায় এই হার ছিল ১/৩ ভাগ। ভাগ-চাষ ব্যবস্থায় চাল, ডাল, রাই, মোধ-এর মতো খরিপ শস্যের ক্ষেত্রে উৎপন্নের ১/৩ অংশ নেওয়া হতো। ঔরঙ্গজেব রসিকদাস কারোরীকে যে ফরমান দিয়েছিলেন তা সম্ভবত সাম্রাজ্যের মধ্যাঞ্চলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। ঐ ফরমানে বলা হয়েছে যে ভাগচাষের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের অনুপাত হবে ১/২ অংশ বা ১/৩ অংশ বা ২/৫ অংশ। অথবা তার কম বা বেশি। ভাগচাষে লিপ্ত চাষিদের দারিদ্র ও রিক্ত অবস্থার কথা ভেবেই এই রাজস্ব হার ধার্য হয়েছিল সম্ভবত। *খুলাসতুস সিয়াক* নামক পুস্তিকাটির রচনাকাল ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিক। ঐ পুস্তিকায় লাহোরের সন্নিকটে অবস্থিত এক গ্রামের ধার্য রাজস্বের হারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানেও দেখা যায় উৎপাদন ও ভাগচাষের ক্ষেত্রে গম ও বার্লির বেলায় উৎপন্নের ১/২ ভাগ রাজস্ব আদায় হতো। মুনহতা নয়নসীর রচিত (১৬৬৪) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আজমীরে উৎপাদনের অর্ধেক (১/২) রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হতো। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে গুজরাটে ও দাক্ষিণাত্যে উৎপন্নের ৩/৪ অংশ আদায় করা হতো। গেলেইনসেন ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন যে, গুজরাটে চাষিকে তার ফসলের ৩/৪ অংশই দিতে হয়। অবশ্য ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের অষ্টম বছরে জারি এক ফরমানে ঐ অঞ্চলের জাগীরদারদের উৎপন্নের অর্ধাংশের বেশি কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছিল। ঐ ফরমানে খেদোক্তি করা হয়েছিল এই বলে যে, "জায়গিরদাররা খাতায় কলমে অর্ধেক দাবি করলেও কার্যত মোট উৎপন্নেরও বেশি আদায় করে তারা। এর কিছুকাল পরে সুরাটের সন্নিকটস্ত অঞ্চলের চাষিরা উৎপন্ন ফসলের ১/৪ অংশ নিজ জিম্মায় রাখতে সক্ষম ছিল বলে ফ্রায়ার জানিয়েছেন। অর্থাৎ উৎপাদনের ৩/৪ অংশ মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হতো।

শাহজাহানের রাজত্বের অন্তিম লগ্নে দক্ষিণে ভাগচাষ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে যখন তখন সেখানে সাধারণ জমির ক্ষেত্রে উৎপাদনের অর্ধেক, কূয়ো দ্বারা সেচ সেবিত জমির ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের ১/৩ অংশ আর উচ্চমানের ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদনের ১/৪ অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত।

তবে সাধারণত ভূমিরাজস্বের হার উৎপাদনের অর্ধাংশ হিসাবে ধার্য করা হতো। ঔরঙ্গজেবের আমলে সমস্ত সরকারি হুকুমনামায় রাজস্বের হার এই হারেই ধার্য করার কথা বলা হয়েছিল। আসলে মুসলিম আইন বা শরিয়ত-এ

ভূমি-কর বা খরাজ হিসাবে উৎপাদনের অর্ধাংশ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। শরিয়ত-এর প্রতি শ্রদ্ধা বা ওই কারণে রাজস্বের হার এ রূপ ধার্য করা হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে সম্রাটের নিষেধ সত্ত্বেও অনেক জায়গায়ই উৎপাদনের অর্ধেকরও বেশি অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হতো। যেমন গুজরাটের যে সব অঞ্চলে ভূমি উর্বর ছিল সেখানে উৎপাদনের অর্ধাংশের বেশি রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হতো।

সর্বোপরি নোমান আহমদ সিদ্দিকির মতামত অনুসারে বলা যেতে পারে যে মুঘল আমলে রাজস্ব নির্ধারণের কতগুলির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল।

এক) বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক অবস্থা ও কৃষির অবস্থা বিবেচনা করে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো। সাধারণত উৎপন্ন শস্যের ১/৪ অংশ থেকে ১/২ অংশ রাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত হতো।

দুই) উৎপন্ন শস্যের এই ১/২ অংশ সর্বক্ষেত্রে রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা হতো না।

তিন) ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করার সময় স্থানীয় কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা ও তাদের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করা হতো। যে সব ক্ষেত্রে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করলে কৃষকের ভূমি ত্যাগের সম্ভাবনা ছিল বা ঐ অঞ্চলের কৃষিকাজ ধ্বংস হবার আশঙ্কা থাকতো, সে ক্ষেত্রে রাজস্ব বৃদ্ধি স্পষ্টতই নিষিদ্ধ ছিল।

মুঘল ভূমিরাজস্ব পদ্ধতির দু'টি পর্যায় ছিল বলা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে তা আদায় করা হতো। রাজস্ব যা নির্ধারিত হতো সরকারি কাগজে যা লিপিবদ্ধ তাকে বলা হতো জমা বা 'তসখিস'। আর বাস্তবে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতো তাকে বলা হতো তহাসল বা তহসীল বা হাসিল। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য প্রথমে রাজস্ব নির্ধারিত হতো। এই নির্ধারণের পর জমির বিবরণ ও প্রদেয় রাজস্বের হার সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করে যে দলিল সরকারি তরফে প্রদান করা হতো, তাকে বলা হতো পাট্টা। বিনিময়ে ঐ রাজস্ব প্রদানের স্বীকৃতি জানাতো কবুলিয়তের মাধ্যমে যাতে লেখা থাকতো কখন কীভাবে চাষি তা প্রদান করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মরসুম ভেদে রাজস্বের তরতম্য হতো। শীতকালীন শস্য বা রবিশস্য এবং শরৎকালীন শস্য বা খারিফ শস্যের উপর ধার্য রাজস্বের হার পৃথক হতো।

মুঘল যুগে রাজস্ব নির্ধারিত ও আদায় হতো বিভিন্ন পদ্ধতিতে। যেমন 'গল্লা-বখ্শী', কানকুট বা দানাবদী, নকস, জবত, হস্ত-ও-বুদ প্রভৃতি। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। গল্লা-বখ্শী হলো এমন এক রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি যাতে পূর্ব থেকে রাজস্ব নির্ধারণ করার প্রয়োজন হতো না। ফার্সী শব্দ গল্লা-বখ্শী। হিন্দীতে একে বলা হতো বাটাই বা ভাওলী। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসল তিনভাবে কৃষক ও সরকারের মধ্যে ভাগ করা হতো।

(i) 'করার-দাদ' এই পদ্ধতিতে উভয়পক্ষের লোকের উপস্থিতিতে খামারে 'করার-দাদ' বা চুক্তি অনুযায়ী শস্য ভাগাভাগি করা হতো।

(ii) ক্ষেত বাটাই এই পদ্ধতিতে মাঠে ফসল কাটবার আগে জমি ভাগ করে নেওয়া হতো। এবং কৃষক ও সরকার জমির কোন অংশের ফসল পাবে, তা নির্ধারণ করা হতো।

(iii) লাঈ বটাঈ এই পদ্ধতিতে শস্য কাটার পর তা স্তূপাকারে রাখা হতো, তারপর তা ভাগ করা হতো। *নিগারনামা-এ-মুনশী*-তে এই পদ্ধতিকে রাজস্ব আদায়ের সবচেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থায় কৃষক বা সরকার উভয়পক্ষেরই ঝুঁকি (Risk) কম ছিল। যখন যেমন ফসল হতো, তখন সেই ফসলেরই ভাগ হতো। এর দ্বারা কৃষক অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি বা ফসল কম হবার ঝুঁকি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারত। দুর্দশাগ্রস্থ গ্রাম বা কৃষকদের কাছে এই পদ্ধতিতে রাজস্ব প্রদানই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক। আবার বাজারে যখন শস্যের দাম চড়া থাকতো তখন সরকারি তরফে এই পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায়ও লাভজনক ছিল।

তবে আবুল ফজল এই ব্যবস্থার এক অসুবিধার কথা বলেছেন। ফসলের সঠিক সরকারি অংশ পেতে গেলে রাজস্ব আদায়ের সময় অনেক পাহারাদার নিয়োগ করতে হতো। তিনি লিখেছেন, " নইলে হতভাগারা (চাষি) তছরূপ করে তাদের অসাধু হাত নোংরা করে ফেলে।" হিন্দীতে একটি প্রবাদই ছিল "বাটাই লুটাঈ হৈ।" অর্থাৎ ভাগচাষ করলে লুঠ হবেই। *আদাব-এ আলমগীরী* থেকে জানা যায় যে, এই পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায় করতে সরকারি খরচ বেশি হত। দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের আমলে যখন এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, তখন উৎপাদিত শস্যের উপর নজরদারির জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করতে গিয়ে রাজস্বের চেয়ে দ্বিগুণ খরচ হয়েছিল। বাটাই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো থাট্টা, কাবুল, কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্য থেকে। ইরফান হাবিবের মতে, বাটাই কোনো রাজস্ব নির্ধারণের পদ্ধতি ছিল না। এটি মূলত একটি রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি যেখানে রাজস্ব পূর্ব থেকে ধার্য না করলেও চলে।

মুঘল রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত কার্যসিদ্ধি হতো যে পদ্ধতিতে, তা হলো হস্ত-ও-বূদ এই ব্যবস্থায় ভারপ্রাপ্ত রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারীরা গ্রাম পরিদর্শন করে ভালো ও মন্দ দু'ধরনের জমি দেখে নিয়ে মোট উৎপাদিত ফসলের একটা আনুমানিক হিসাব করতেন ও চৌধুরী, কানুনগোদের চাষ অনুযায়ী তার ওপর রাজস্ব ধার্য করতেন। অনেকক্ষেত্রে গ্রামে লাঙল গুণতি করে এলাকা অনুযায়ী লাঙল প্রতি নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব ধার্য করা হতো। সাদিক খানের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মহম্মদ ইয়াসিনের মতে, মোট জমির পরিমাণের পরিবর্তে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণই এক্ষেত্রে রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। তাছাড়া জমি জরিপে ব্যয়সাপেক্ষ ঝামেলাও এড়ানো যেত।

দস্তুর-উলঅমাল-ই-বেকাস গ্রন্থে থেকে জানা যায় যে, প্রকৃত কতটা জমির ওপর ফসল উৎপন্ন হয়েছে, তা সঠিক নির্ধারণের পর 'জমা'-র পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো হতো। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় গুণ হলো, এটা লোভী ও স্বার্থপর রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারীদের অত্যাচার থেকে কৃষক ও জমিদারদের রক্ষা করেছিল। পরোক্ষে আবার এটি সরকারী স্বার্থও রক্ষা করতো। কারণ কৃষকের অবস্থা ভালো হলে আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে। পরিণামে সরকারের রাজস্বের পরিমাণেও বৃদ্ধি হয়। এই কারণে *দস্তুর-উলআমল-ই-বেকাস*-এর গ্রন্থকার কৃষকদের সুখী ও সমৃদ্ধি যাতে সূচিত হয় সে ব্যাপারে নজর রাখার ভবিষ্যতের আমিলদের নজর রাখার উপদেশ দিয়েছেন। আর তা করতে হস্ত-ও-বুদ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে বলেছেন। কারণ এটাই রাজস্ব ধার্যের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পরগণার রাজস্ব-ধার্য ও তা সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমিল বলা হতো। এছাড়া সমস্ত আবাদি জমি যাতে কৃষিকার্যে নিয়োজিত হয়, তা দেখাও এই আমিলের কাজ ছিল।

কানকূত : অন্য যে উপায়ে রাজস্ব নির্ধারিত হতো, তা হলো কানকূত প্রথা। কৃষক হস্ত-ও-বুদপ্রথা মানতে রাজি না হলে সেক্ষেত্রে এই প্রথা অনুসরণ করা হতো। এই প্রথায় যে পরিমাণ জমিতে ফসল উৎপাদিত হয়েছে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে সেই অনুপাতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হতো। 'জবই-কানকূত'-এর খসড়ায় কতগুলি বিষয় উল্লিখিত থাকতো কৃষকের নাম, জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, কৃষিতে নিযুক্ত মোট জমির আয়তন, ক্ষতিগ্রস্ত শস্য

সম্বলিত জমির আয়তন, প্রকৃত ফলন হয়েছে যে জমিতে, তার পরিমাণ; বিভিন্ন শস্য উৎপাদিত জমির আয়তন। মোট কত পরিমাণ জমিতে ফসল হয়েছে এবং স্থানীয় বিঘা প্রতি ফলনের পরিমাণ হিসাব করে একজন কৃষকের ব্যক্তিগত জোতজমির উৎপাদন কত তা অনুমান করা হতো। যে সব ক্ষেত্রে 'জমা' অন্যায়ভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠতো, সে সব ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের কিছু নমুনা ওজন করে তাতে কী পরিমাণ শস্য আছে তা দেখা হতো। ফলনশীল জমির এক 'বিশা' (বিঘা) 'আমিল'কে এবং অপর এক বিশা কৃষককে বেছে নিতে হতো। এই দুই বিশা থেকে উৎপন্ন শস্য কেটে তা মারাই করা হতো। পরে এই শস্য ওজন করা হতো এবং নির্ধারিত ফলনশীল জমির মোট উৎপাদনও হিসাব করা হতো। এ ভাবে মোট উৎপাদনের যে হিসাব মিলত তার ভিত্তিতেই রাজস্ব-এর পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা হতো। শস্যের হিসাবে যে 'জমা' ধার্য হতো তা প্রচলিত মুদ্রার হারে নগদে রূপান্তরিত হতো। লক্ষণীয় যে জব ও কানকূত উভয় প্রথাতেই ফলনশীল জমির জরিপ ও জমাবন্দি তৈরি করবার সময় রাজস্বের পরিমাণ নগদ হারে দেখানো হতো। এ দুই প্রথার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। তা হলো কানকূত প্রথায় জমির মালিক ও রাজস্ব আদায়কারীর মধ্যে বিঘাপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছাতেন। অর্থাৎ কানকূত প্রথায় প্রকৃত উৎপন্ন ফসলের ওপর রাজস্ব নির্ধারিত হতো এবং শস্যহানি ঘটলে রাষ্ট্র ও কৃষক উভয়েই সেই ক্ষতির অংশীদার হতেন, কিন্তু জব প্রথায় বিঘা প্রতি গড় উৎপাদনের ভিত্তিতে আনুমানিক ও সম্ভাব্য ফসলের উপর রাজস্ব ধার্য করা হতো, যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে নির্ধারিত রাজস্ব থেকে কিছু ছাড় দেওয়া হতো। তবে সেচের অভাবে নিম্নমানের বীজ বা বেশি নিরস জমি-র কারণে গড় ফলনের তুলনায় যথেষ্ট কম ফলন হলে এই প্রথায় রাজস্ব হার দেবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অতএব কানকূত প্রথায় কৃষকদের সুবিধা ছিল বেশি। সম্ভবত জব না কানকূত কোন প্রথা প্রচলিত হবে তা নিরূপণের রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারী ও জমিদার বা তার কর্মচারীদের মধ্যে যথেষ্ট দর কষাকষি চলতো। 'গল্লা-বখ্‌শী' ও 'হস্ত-ও-বুদ পদ্ধতির চেয়ে কানকূত ব্যবস্থা অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ। কেননা এতে শস্যকাটা ও ঝাড়াইয়ের ওপর কোনো নজরদারি পড়ে না।

জবৎ: 'জবৎ' বলতে বোঝায় পরিমাপ ও তার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ। 'জরিব' বা 'আমল-এ-জরিব' শব্দ এর সমর্থক বলে মনে হয়। জব হচ্ছে মুঘল আমলে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে জবৎ ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটেছিল মুঘল আমলে। *আইন-ই-আকবরি*-তে বলা হয়েছে, শেরশাহ ও ইসলাম শাহ হিন্দুস্থানকে জবৎ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে এসেছিলেন। যে সব জমি একাধারে চাষ করা হতো (পোলান) বা মাঝে মাঝে পতিত পড়ে থাকতো ('পরৌতী') শেরশাহ সেখানে 'রাই' বা শস্য চালু করেন। 'রাই' শব্দের অর্থ চাষ করে যা 'পাওয়া যায় বা চাষ থেকে রাজার প্রাপ্য রাজস্ব'। উৎপন্ন ফসলকে ভালো, মাঝারি ও খারাপ এই তিন ভাগে ভাগ করে সেগুলির সাধারণ গড় করা হতো।

সেই গড়ের এক-তৃতীয়াংশ ভূমিরাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। শেরশাহের আমলে রবি ও খরিফ শস্যের বিঘা পিছু হারের এক দীর্ঘ তালিকা ছিল। এই তালিকা শেরশাহর 'রাই' বা রাজস্ব হার ছিল সম্ভবত। সম্ভবত আকবর তার রাজত্বের প্রথম দিকে গোটা সাম্রাজ্যের জন্য এই হারগুলোকে মেনে নিয়েছিলেন। আকবর সুনির্দিষ্ট রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য খালিসা জমিগুলিকে জায়গির জমি থেকে পৃথক করেন। সেটা ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইতিমাদ খাঁ দেওয়ান নিযুক্ত হলে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে মজাফর খাঁ দেওয়ান পদে নিযুক্ত হলে কানুনগোদের সাহায্যে জমি জরিপ করা হয় এবং ফসলের উৎপাদনের পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়। এর ভিত্তিতে তৈরি হয় হাল-ই-হাসিল। হাল-ই-হাসিল এ জমির উৎপাদন যেমন নথিভুক্ত থাকতো, সেই হারে রাজস্ব ধার্য করা হতো। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল দেওয়ান পদ লাভ করেন। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করতে উদ্যোগী হন। এ ব্যাপারে শাহ মনসুর

তাকে সাহায্য করেন। তার প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জবতি বা দহসালা বন্দোবস্ত।

জবৎ ব্যবস্থায় খলিসা জমিকে প্রতি প্লট ধরে জরিপ করা হতো। দৈর্ঘে ৬০ গজ ও প্রস্থে ৬০ গজ জমিকে এক বিঘা ধরা হতো। জবৎ প্রথায় ফসলের উৎপাদনের ভিত্তিতে জমিকে চারভাগে ভাগ করা হতো পোলাজ, পরৌতি, চাচর ও বানজার। পোলজ হলো সেই জমি যেখানে প্রতি বছর চাষ হতো। যে জমিতে প্রতি বছর চাষ হতো না তাকে পরৌতি বলা হতো। যে জমিতে তিন-চার বছর অন্তর চাষ হতো, তাকে চাচর বলা হতো। বানজার হলো সেই জমি যেখানে পাঁচ বা তার অধিক সময়কাল কোনো কৃষিকাজ হতো না। পোলাজ, পরৌতি, চাচর এই তিন শ্রেণির জমিকে উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে আবার সরেশ, মাঝারি ও নিরেস এই তিন ভাগে ভাগ করা হতো। এবং প্রতি শ্রেণির জমির বিগত দশ বছরের উৎপাদন একত্র করে তার গড় করা হতো। একে গড় উৎপাদন হিসাবে ধরা হতো এই গড় উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য হতো। তবে এক্ষেত্রে ফসলের পরিবর্তে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদান করা হতো। এক্ষেত্রে শস্যের বিগত দশ বছরের গড় মূল্য নির্ধারণ করা হতো। পরে সরকারি রাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত ফসলের দাম কৃষক নগদ অর্থে তার সরকারকে প্রদান করতো। এই প্রথায় সরাসরি কৃষকের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত করা হতো। জায়গির জমিগুলিও জবতি প্রথার আওতায় নিয়ে আসা হয়।

এক্ষেত্রে রাজস্ব বিভাগের কর্মী রাজস্ব আদায়ের পর জায়গিরদার তার নির্ধারিত প্রাপ্য লাভ করতেন। এই প্রথায় কৃষকদের যে পাট্টা দেওয়া হতো, তাতে জমির শ্রেণি, কৃষকের প্রদেয় রাজস্বের পরিমাণ, জমির পরিমাণ প্রভৃতি সব কিছু নথিভুক্ত থাকতো। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য এই ব্যবস্থা ১০ বছরের জন্য স্থায়ী ছিল, তা নয়। প্রয়োজনে এ ব্যবস্থায় রাজস্বের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটত। তবে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য পূর্ববর্তী ১০ বছরের উৎপাদনের গড় করা হতো। জবৎ ব্যবস্থা মুলতান, লাহোর, দিল্লি, আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, বিহার ও মালবে প্রচলিত হতো। জবৎ ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ-র যা দাম হতো তা নগদ মূল্যে রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। শাহজাহানের আমলে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে উৎপাদনের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা হয়। ঔরঙ্গজেব আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ফসলের এক-তৃতীয়াংশকে রাজস্ব হিসাবে ধার্যের কথা বলেছিলেন।

জবৎ ব্যবস্থার কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব।

(১) যেখানে মাটির ধরনের হেরফের ঘটতো বা মৃত্তিকা সমজাতীয় ছিল না, সেখানে এ ব্যবস্থা সহজে প্রয়োগ করা যেত না। আবার যেখানে ফসল উৎপাদনের নিশ্চয়তা ছিল না, বছর প্রতি উৎপাদনে হেরফের হতো, সেখানে এই ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল না। আবুল ফজল তার গ্রন্থে কান্দাহার সংক্রান্ত অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, 'চাষিদের যদি 'জবৎ' বহনের ক্ষমতা না থাকে, তবে রাজস্ব হিসাবে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করার রীতিই অনুসরণ করা হতো।

(২) এছাড়া এই ব্যবস্থার পরিচালনার জন্য আর্থিক খরচও হতো অনেক বেশি। জরিপ ব্যবস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য 'জাবিতানা' নামে বিঘা পিছু এক দাম উপকর নেওয়া হতো। *আইন-ই-আকবরি*তে উল্লিখিত আছে যে, জরিপের দশ জবিতানা হিসাবে রোজ '৫৮' দাম করে পেত। এই ব্যয় নির্বাহের জন্যই বিঘা প্রতি এক দাম করে আদায় করা হতো।

(৩) এছাড়া জমির মাপ নথিভুক্ত করণের সময় হিসেবের অনেক গরমিল করা হতো। *আকবরনামায়* বলা হয়েছে, আকবরের রাজত্বের ত্রয়োদশ বছরের পূর্বে 'জবৎ-এ-হরমালা' বা বার্ষিক জরিপ করতে খালিসা-য় প্রভূত ব্যয় হতো এবং লোকে অর্থ আত্মসাৎ করতো।

(৪) উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য হওয়ায় তা কৃষকের ওপর চাপ সৃষ্টি করতো। রাজস্ব হিসাবে এর পরিমাণ ছিল যথেষ্ট বেশি। পরবর্তীকালে শাহজাহানের আমলে এই হার বাড়িয়ে ১/২ অংশ করা হয়েছিল এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে তাই বহাল ছিল। এর ফলে অনেক সময় রায়তরা জমি ছেড়ে পালাতেন। পলায়মান কৃষককে রুখতে হাঁকোয়া প্রথার প্রচলন ঘটে। এই প্রথায় পলায়মান কৃষকের পশ্চাতে ঘোড়সওয়ার পাঠানো হতো। তারা চাবুক দিয়ে প্রহার করে কৃষকদের তাদের গ্রামে ফিরিয়ে আনতো। এই কারণে ঔরঙ্গজেবও জমিদারদের সতর্ক করে দিতে হয়েছিল যে, তাদের দাপটে যেন কোনো রায়ত জমি ছেড়ে না চলে যায়। সর্বোপরি, নগদ টাকায় রাজস্ব প্রদানের রীতি চালু হওয়ায়, কৃষককে নগদ টাকা জোগাড়ের জন্য অসুবিধায় পড়তে হতো। কারণ মুদ্রার প্রচলন বেশি না থাকায় রায়তকে মুদ্রা সংগ্রহের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হতে হতো। মানরিখ এ কারণে মুঘল আমলে কৃষকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

নসক নামে আর এক প্রকার ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতির কথা—জানা যায়। তবে এই পদ্ধতির প্রকৃত স্বরূপ কী ছিল তা স্পষ্ট নয়। আবুল ফজল এর উল্লেখ করেছেন বটে, তবে এর কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেননি। ইরফান হাবিব আবুল ফজলের বর্ণনার উপর নির্ভর করে নসক ব্যবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। তার মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নসককে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য কোনো স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। উপরন্তু অন্য সব পদ্ধতির সহায়ক হিসেবেই একে দেখা হয়েছে। অর্থাৎ রাজস্ব নির্ধারণ বা আদায়ের পদ্ধতি যাই হোক না কেন, নসক পদ্ধতি গ্রহণ করা যেত। নসক শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় আকবরের রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বছরে। হাবিবের মতে, জবত এলাকা এবং অবশিষ্ট এলাকা যেমন বাংলা, কাশ্মীর ও বেরারে সন—আলাদা ভাবে প্রযুক্ত হতো। জবত এলাকায় দু'ভাবে রাজস্ব নির্ধারিত হতো নগদে নির্ধারিত রাজস্ব ও বাৎসরিক জম-জরিপ। আর সরকারি দলিলে নসক শব্দটি জবত এলাকার বার্ষিক জরিপের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বেরার, বাংলা ও কাশ্মীরে নসক প্রথা চালু ছিল। বেরারে এই ব্যবস্থায় আবাদি জমি বা প্রকৃত ফলনকে হিসাবে না ধরে কোনো গ্রামের লাঙ্গলের সংখ্যার ওপর লাঙল পিছু চিরাচরিত হার প্রয়োগ করা হতো। বাংলায় 'ভাগ চায' প্রথা ছিল না, জরিপ ব্যবস্থাও মাঝে মধ্যে কার্যকরী হতো। এখানে রাজস্ব দাবির ভিত্তি ছিল নসক।

মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কতগুলি নেতিবাচক দিকের প্রতিও ঐতিহাসিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আকবরের আমলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় যে সুসংবদ্ধতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, জাহাঙ্গীরের আমলে তা হ্রাস পেয়েছিল। জাহাঙ্গির খলিসা জমির ৭০ শতাংশ জায়গিরদারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শাহজাহানের আমলে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব ইজারাদারদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। পরিণামে কৃষকের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ঔরঙ্গজেবের আমলে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয়ভার বহনের জন্য রাজস্বের হার বাড়িয়ে অনেকক্ষেত্রে উৎপাদনের ২/৩ অংশ করা হয়েছিল।

মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

(১) উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব নির্ধারণের কয়েকটি পদ্ধতি অনুকরণ করা হয়েছিল। জবৎ, কানকূত, গল্লা-বখ্‌শী ইত্যাদি। এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল অমাল-ই-খেওয়াত, অমাল-ই-জিনসী বা নাসক। এই রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতিগুলি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে প্রচলিত ছিল। কিন্তু দলিলপত্রে এদের কোনো উল্লেখ নেই। হয়তো কোনো কোনো অঞ্চলে এই প্রথাগুলি সীমাবদ্ধ ছিল। যে কারণে কেন্দ্রীয় নথিপত্রে এদের উল্লেখ মেলে না। হতে পারে এগুলি সপ্তদশ শতকের শেষে বা অষ্টাদশ শতকের শুরুতে চালু হয়েছিল।

(২) রাজস্ব কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন কৃষক ও জমিদারদের প্রচলিত রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি যে কোনো একটি বেছে নেবার সুযোগ দেয়। বিভিন্ন সরকারি আদেশনামায় এ কথা বলা হয়েছে। তবে বাস্তবে এই হুকুম তামিল করা কষ্টসাধ্য ছিল। কোন অঞ্চলে কোন রাজস্ব নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, তা রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মীদের ওপরই নির্ভর করতো।

(৩) দু'ভাবে রাজস্ব আদায় করা হতো একক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গ্রামের উপর এককালীন রাজস্ব ধার্য করা হতো এবং জমিদারের কাছ থেকে তা আদায় করা হতো। আর অন্য ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় হতো প্রতি কৃষকের ব্যক্তিগত জোত-জমার উপর। সম্ভবত প্রথম প্রথাই সাধারণত প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় প্রথাটি ছিল ব্যতিক্রম। যেসব ক্ষেত্রে জমিদার ঘোষণা করতেন যে, রায়ত-এর কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের সামর্থ তার নেই, এবং জমিদার ধার্য ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিতেন, সে ক্ষেত্রে জমাবন্দির ভিত্তিতে প্রতিটি কৃষকের নিকট থেকে পৃথকভাবে রাজস্ব আদায় করা হতো। সর্বোপরি, মনে রাখতে হবে রাজস্ব ধার্যের একক ছিল গ্রাম এবং জমিদার ও মোকাদ্দমগণ রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাগারে পাঠাতে লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ থাকতেন।

১৪.৪ রাজস্ব প্রদানের প্রণালী

মুঘল আমলে রাজস্ব কীরূপে প্রদত্ত হতো সে বিষয়ে জানা প্রয়োজন। আকবরের আমল থেকে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদানের রীতি চালু হয়। সেই সঙ্গে অবশ্য আমিলদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, কোনো কারণে কৃষক নগদ মুদ্রায় রাজস্ব প্রদান করতে অসম্মত হলে উৎপন্ন শস্যে তা গ্রহণ করতে হবে। তবে নির্দিষ্ট কিস্তি দেবার সময় হলে কৃষকরা যাতে নগদ মুদ্রায় তা প্রদান করে, তার জন্য চেষ্টা করা হতো এবং নগদ মুদ্রায় রাজস্ব প্রদানের প্রবণতা প্রশ্রয় পেত। প্রশ্ন হলো রাজস্ব শস্যর মাধ্যমে আদায় হলে তা কীভাবে ব্যবহৃত হতো? এ প্রশ্নের উত্তর কোনো নথিপত্রে নেই। তাই মনে হয় শস্য দিয়ে রাজস্ব প্রদানের রীতি খুব অল্পক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল। যেজন্য এ ব্যাপারে কোনো সাধারণ নিয়মাবলী রচিত হয়নি। ঔরঙ্গজেব ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলের যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় যে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থানেই নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। 'দেওয়ান-ই-পসন্দ', খুলাসোত-উসমিয়াক প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে মনে হয় সাধারণত নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদান করা হতো। তবে স্থানীয় রীতি নীতি ও প্রথা অনুযায়ী এবং কোনো কোনো অঞ্চলের প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার কারণে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব-প্রদান চলত।

নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব বছরে চার বা ছয় কিস্তিতে দেওয়া চলতো, প্রতি কিস্তিতে কী পরিমাণ দিতে হবে তা লিখিত চুক্তিপত্রে উল্লিখিত থাকতো এবং ইজারা-দলিলেও তার বর্ণনা থাকতো।

১৪.৫ রাজস্ব আদায়কারী প্রশাসন

রাজস্ব নির্ধারণ ও তা সংগ্রহের দায়িত্ব যে মন্ত্রকের হাতে থাকতো তাকে বলা হতো দেওয়ান-ই-উজিরত। কেন্দ্র, প্রদেশ সরকার ও পরগণা এই চারটি পর্যায়ে এই মন্ত্রকের কার্যক্রম প্রসারিত ছিল। উজীরের নেতৃত্বে এই দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। উজির দেওয়ান-ই-কুল বা দেওয়ান-ই-আলা নামে পরিচিত ছিলেন। রাজস্ব নির্ধারণ ও তা আদায় প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য আকবর সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও যথেষ্ট ছিলেন। বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রদেশের চুক্তি গঠন 'ওয়াকিল'-এর অধীন থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন মন্ত্রক হিসাবে 'উজিরত' বা রাজস্ব মন্ত্রকের প্রতিষ্ঠা এবং প্রাদেশিক স্তরে উজিরের প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক

দেওয়ান পদের সৃষ্টি মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আকবরের অনন্য অবদান। তার পরবর্তী দুই মুঘল শাসক জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনে সামান্য পরিবর্তন ঘটলেও আকবরের আমলে প্রবর্তিত মূল কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থাই অব্যাহত ছিল।

উজির : আকবরের রাজত্বের অষ্টম বৎসরে দেওয়ান-ই-কুল নামক দপ্তরের প্রতিষ্ঠা করা হয় রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য। ঐ দপ্তরের প্রধানকে বলা হতো 'দেওয়ান-ই-কুল' বা 'উজির'। মুজাফর খানকে প্রথম দেওয়ান-ই-কুল বা উজির পদে নিযুক্ত করা হয়। এই দপ্তর আবার দেওয়ান-ই-আলা নামেও অভিহিত হতো। দেওয়ান-ই-কুল এর তত্ত্বাবধানে রাজস্ব মন্ত্রকের একাধিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা হয়। ঔরঙ্গজেবের আমলে রাজস্ব দপ্তরের প্রধান কর্তা উজির বা 'উজির-ই-আজম' বা 'উজির-ই-মোয়াজ্জম' নামে পরিচিত হন। তবে প্রশাসনিক কাগজপত্রে বা হিসাব-নিকাশের খাতায় তাঁকে 'দেওয়ান-ই-আলা' নামেই অভিহিত করা হতো। অর্থাৎ আকবরের আমলে যিনি 'দেওয়ান-ই-আলা' নামে পরিচিত ছিলেন, ঔরঙ্গজেবের আমলে তাঁকেই আবার উজির-ই-আজম, বা 'উজির-ই-মোয়াজ্জম' বলা হতো। বিভিন্ন বর্ণনায় রাজস্ব মন্ত্রকের প্রধান 'উজির' নামে অভিহিত হলেও, তার পারিভাষিক নাম ছিল 'দেওয়ান-ই-আলা'। তবে পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের আমলের নথীপত্রে 'দেওয়ান-ই-আলা' উজির নামে অভিহিত হয়েছেন।

এই দেওয়ান-ই-আলা রাজস্ব মন্ত্রকের বাইরেও অন্যান্য অনেক ক্ষমতা ভোগ করতেন। তার অধীনে বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্ম নির্বাহ হতো। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী নিয়োগ, দপ্তরের বিভিন্ন সরকারি কর্মের তত্ত্বাবধান, বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রে স্বাক্ষর করা, জনগণের অভিযোগ শোনা, মনসবদার ও অন্যান্য পদাধিকারীরা যে সব আর্জি জানাতেন সেগুলির যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। ঔরঙ্গজেবের আমলে ফজিল খান, জামার খান, আমাদ খান প্রভৃতি উজির পদে নিযুক্ত অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী ছিলেন।

রাজস্ব দপ্তরের অধীনে একাধিক বিভাগ ছিল। যেমন দেওয়া-ই-খালিসা, দেওয়ান-ই-তান, মুস্তাফি, দারুল-ইনসা বা রাজকীয় ফরমান্ত বা হুকুমনামা প্রস্তুত করার বিভাগ। দেওয়ান-ই-আলা'র অধীনস্ত প্রধান কর্মচারী ছিলেন দেওয়ান-ই-খালিসা, দেওয়ান-ই-তান প্রমুখ। দেওয়ান-ই-আনলা-র সুপারিশ অনুসারে ও সম্রাটের নির্দেশে দেওয়ান-ই-খালিসা নিযুক্ত হতেন। বিভিন্ন প্রদেশ ও পরগণা থেকে রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্র তার দপ্তরে আসতো। দেওয়ান, ফৌজদার, আমিনের নিয়োগপত্র তিনি স্বাক্ষর করতেন। খালিসা জমির খাজনা সংক্রান্ত হিসাবপত্র তার দপ্তরে প্রস্তুত করতে হতো।

দেওয়ান-ই-তান—এর উপর মনসবদার নিয়োগ ও জায়গির বিলি বন্দোবস্তের দায়িত্ব ছিল। মুস্তাফি ছিলেন আমিল প্রদত্ত হিসাব পরীক্ষা করার দায়িত্বে।

প্রাদেশিক স্তরে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত দপ্তর ছিল দেওয়ান-ই-সুবা। আকবরের রাজত্বের চোদ্দতম বছরে প্রতিটি প্রদেশে অন্যান্য কর্মচারী সহ একজন করে প্রাদেশিক দেওয়ান নিযুক্ত হয়। ক্রমশ প্রাদেশিক দেওয়ানের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পায় যে, তাঁর রাজত্বের চল্লিশতম বছরের মধ্যে তিনি সুবাদারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যান। দেওয়ান-ই-আলা'র মাধ্যমে তিনি সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েন। তার সমস্ত কাগজপত্র সম্রাটের কাছে সরাসরি পাঠানো হতো।

সুষ্ঠভাবে রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মুঘল যুগে প্রাদেশিক স্তরে কয়েকটি বিভাগ সৃষ্টি হয় সরকার, পরগণা বা মহাল। পরগণা ও মহাল-এর মধ্যে পার্থক্য ছিল। একাধিক গ্রামের সমষ্টিতে সৃষ্ট রাজস্ব নির্ধারণ ও তার সাথে যুক্ত ভূমি ক্ষেত্রের যুক্ত এককে পরগণা বলা হতো। আর মহাল বলতে বিশেষ ধরনের রাজস্ব নির্ধারণের এককে বোঝানো হতো, যেমন মহাল কাট্রা পরচা, 'মহাল সায়ের ও বালদা'। অনেক সময় একাধিক মহাল নিয়ে একটি পরগণা

গঠিত হতো, কিন্তু সাধারণত একটি মহাল নিয়েই পরগণা গঠিত হতো। যে কারণে 'মহাল' ও 'পরগণা' শব্দ দুটি বহু ক্ষেত্রেই অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি পরগণা নিয়ে গঠিত হতো একটি সরকার। দেওয়ান-ই-সরকার একটি সরকারের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন।

রাজস্ব বিষয়ে প্রাদেশিক স্তরে দেওয়ান-ই-সুবার অধীনে একাধিক কর্মচারী ছিলেন। সরকার পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী হলেন অমাল গুজর। ইনি আবার আমিল নামেও পরিচিত ছিলেন। পরগণার প্রধান রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন আমিল। সমস্ত আবাদি জমি যাতে কৃষিতে নিযুক্ত হয়, তা দেখা এনার। পরগণার রাজস্ব-ধার্য ও তা সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন আমিল। এটাই ছিল তার প্রাথমিক কাজ। সম্ভবত সরকার-আমিলের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন পরগণা আমিল। সরকার আমিলের অধীনস্ত অন্যান্য কর্মচারীরা হলেন বিতিকী, কারকুন, ফতদার প্রমুখ।

১৪.৬ জমিদার ও কৃষক

জমিদার ও কৃষক — উভয়ই ছিল মুঘল যুগের গ্রামীণ জীবনের মৌলিক স্তম্ভ। মুঘলরা ভারতে আসার আগে থেকে জমিদার শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। ফারসি শব্দ 'জমিনদার'-এর অর্থ হল জমিতে যার অধিকার আছে। এই 'জমিনদার' শব্দ থেকেই 'জমিদার' কথাটি এসেছে। ভারতে 'জমিনদার' শব্দটির প্রথম উল্লেখ মেলে চতুর্দশ শতাব্দীর ফারসি ঐতিহাসিকদের রচনায়। কোনো একটি এলাকার প্রধান অর্থে জমিনদার বা জমিদার শব্দটি তারা ব্যবহার করেছিলেন। মুঘল যুগে আকবরের আমল থেকেই 'জমিনদার' বা জমিদার শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। সে সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে যে ব্যাক্তি কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার অর্জন করে এবং আদায়ীকৃত খাজনা সরকারি কোষাগারে জমা করে, তাকে জমিদার বলা হত। মুঘল প্রশাসন সপ্তদশ শতাব্দী থেকে জমিদারদের এই কাজটিকেই তাদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করত। অবশ্য ঐ একই কাজের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অন্য নামের কর্মচারীরাও যুক্ত ছিল। দোয়াব অঞ্চলে খট, খটি, মুক্কদ্দম নামের পদাধীকারীরা ঐ একই কাজ করতো। লক্ষণীয় যে, চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই এই সব পদাধীকারীর নাম পাওয়া যায়। রাজস্থানে এভাবে যারা কৃষকের কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহ করতেন তাদের বলা হত 'ভোমি' আর গুজরাটে বলা হত 'বন্থ'। মুঘল আমলের প্রথম দিকে আবুল ফজল জমিদারদের সমার্থক 'ভূমিয়া' বা 'ভুইয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

জমিদাররা সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমি চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু উৎপন্ন ফসলের একটা অংশের উপর তাদের অধিকার ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি সত্ত্বে ও এই দাবির ধরণ আলাদা হত। একই প্রদেশে বিভিন্ন ধরণের জমিদারি সত্ত্বের অস্তিত্ব ছিল। এই সব স্বত্ত্বগুলি স্থায়ী ছিল এবং তা বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করা যেত। ভুললে চলবে না, জমিদাররা রায়ত বা কৃষকশ্রেণি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এবং কৃষকদের তুলনায় পদ-মর্যাদাগত ভাবে এরা অনেক উচ্চে অবস্থান করতো।

১৪.৭ জমিদারদের উত্তরাধিকার

জমিদারের নিজের জমি ও খাজনা সংগ্রহ করার অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ—দখল করা যেত। তবে উত্তরাধিকারীকে কেন্দ্রীয় সরকার কাছ থেকে অনুমতি নেবার প্রয়োজন হত। জ্যেষ্ঠ পুত্রই যে উত্তরাধিকারী হবে তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। কোনো জমিদারিতে বড় ছেলে উত্তরাধীকার লাভ করত, কখনও আবার জমিদারিতে আবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত থাকলেও অনুজ ভ্রাতাকে জমিদারির উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হত। মুর্শিদকুলী খানের আমলে বাংলাদেশে বিধবা মহিলাও জমিদারি লাভ করত। আবার বিভিন্ন উত্তরাধিকারীর মধ্যে জমিদারি ভাগ

করে দেওয়া হচ্ছে, তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। গ্রামীণ জমিদাররা জমিদারির অংশ বিক্রি করতে পারতেন এবং বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হত ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক স্বীকৃত মূল্যের উপর। অনেক সময় আবার জমিদার মারা গেলে জমিদারি খালিশা বা খাস জমি করা হতো এবং সেখানে সরকারি আমলা নিয়োগ করা হতো। আবুল ফজল একবার এই ধরনের খালিশা জমির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

মুঘল আমলের আগেও রাইয়তের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব ছিল। এরা এক এক স্থানে এক এক নামে পরিচিত ছিলেন। যেমন রাজা,রাই, রাণা, ঠাকুর খট,মুক্কদ্দম, চৌধুরী ইত্যাদি। মুঘল আমলে এরা কেবল জমিদার নামেই অভিহিত হতে থাকেন। মুঘল যুগের সূচনায় আবুল ফজল জমিদার অর্থে 'ভুমিয়া' বা 'ভূঁইয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল দলিলে জমিদারকে 'মালিক' বলে অভিহিত করা হত। আর তার অধিকারকে বলা হত 'মিলকিয়াৎ'। আরবী শব্দ মালিকের অর্থ হল 'স্বত্বাধিকারী'। আর ইংরাজীতে 'Private Property' বা ব্যাক্তিগত সম্পত্তি বলতে যা বোঝায় , আরবীতে 'মিলকিয়াৎ'-এর অর্থও তাই।

ঐতিহাসিক নুরুল হাসান মুঘল যুগে তিন ধরনের জমিদারের কথা বলেছেন। প্রথমে ছিল, সব থেকে উঁচু শ্রেণির জমিদার- যাদের বলা হতো জমিদারান-ই-উমদা। এরাই ছিল সবচেয়ে বড় জমিদার। এদের তলায় থাকতো মাঝারি মানের জমিদার। আর সবশেষে ছোট জমিদার। এদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি, যদিও তাদের মধ্যে অনেক স্তরভেদ ছিল। এককথায় বলা যায় যে, মুঘল আমলে তারা জমিদার নামে পরিচিত ছিলেন যারা বিভিন্ন শর্তে জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করতেন।

১৪.৮ জমিদারির আয়তন

বিভিন্ন জমিদারির আয়তন বিভিন্ন হত। একটি জমিদারির সীমানা একটি গ্রাম বা একাধিক গ্রামের অংশ নিয়ে হতে পারত। মাল-ওয়াজির বা ভূমি-রাজস্ব প্রদানের শর্তে কোন কোন জমিদারি একাধিক গ্রাম বা এক বা একাধিক পরগনা নিয়ে গঠিত হতো। আবার এমনও দেখা যায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেশকাশ দেবার বিনিময় কোনও কোনও জমিদারির সীমানা কয়েকটা গ্রাম বা এক বা একাধিক পরগনা বা একটি সরকার বা তদাপেক্ষা অধিক এলাকা নিয়ে গঠিত হতো।

১৪.৯ জমিদারের প্রাপ্য

অনেক স্থানে জমিদার আদায়কৃত খাজনার একটি নির্দিষ্ট অংশ নিজ প্রাপ্য হিসেবে রাখতো। বাংলাতে এই প্রথা চালু ছিল। সাধারণত জমিদার সংগৃহীত খাজনার এক-দশমাংশ নিজের পারিশ্রমিক হিসেবে রাখত। যাকে মুঘল যুগে 'নানকর' বলা হত। আকবরের আমলে কিছুকালের জন্য জমিদারদের তাদের প্রাপ্য নগদ টাকায় মেটাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। অনেক সময় এই জমিদাররা এই খাজনা সংগ্রহের পারিশ্রমিক হিসেবে নিষ্কর জমি ভোগ করতো বা তার নিজের জমির খাজনা কিছুটা কম করে সরকারকে প্রদান করত। মুঘল যুগের সরকার সরাসরি খাজনা আদায় করলে জমিদারের প্রাপ্য হিসাব সংগৃহীত খাজনার ১/১০ অংশ জমিদারের 'মালিকানা' বলে দিতে হত। এতে সরকারি কাজের ফলে জমিদারের আর্থিক অবস্থার অবনতি কম হত। মালিকানা প্রদানের রীতি এবং আদায়ীকৃত রাজস্বের কত অংশ মালিকানা হিসাবে প্রদত্ত হবে প্রদেশ ভেদে তা পৃথক হত। গুজরাট অঞ্চলের সঙ্গে স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে সরকার একটা রফা করেছিল। *মিরাৎ-এ- আহমদী* থেকে জানা যায় যে, জমিদারদের জমির দুই ভাগে ভাগ করা হতো- তলপদ ও বাঁঠ। জমির তিন-চতুর্থাংশ তলপদ এবং এক-চতুর্থাংশ বাঁঠ নামে পরিচিত ছিল। প্রথম অংশ থেকে

আদায়ীকৃত রাজস্ব জমা পড়তো সরকারের ঘরে আর বাঁঠ অংশ ছেড়ে দেওয়া ছিল জমিদারদের জন্য। মুঘল কর্তৃপক্ষ কাথিয়াবাড় উপকূলের পোরবন্দরের রাজস্বের ১/৪ ভাগ সেখানকার জমিদারকে দিত। ঘটনা হলো প্রায় সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে মুঘল আমলের জমিদারি এলাকার উপর জমিদারের এক আর্থিক দাবি ছিল। আর তা হত চাষিদের উপর আলাদা একটা শুল্ক চাপিয়ে বা জমির একটা অংশ লাখেরাজ হয়ে তাদের হাতেই থাকতো বা কর্তৃপক্ষ নিজেই সমস্ত জমি থেকে রাজস্ব আদায় করে তার থেকে তাদের একটা নগদ ভাতা দিত। উত্তর ভারত ও বাংলায় এই শেষ দুটি রূপ পরিচিত ছিল 'দো-বিশ্বী' নামে, গুজরাটে এরই নাম ছিল 'বাঁঠ' আর দক্ষিণে 'চৌথ'।

জমিদাররা তাদের প্রধান আর্থিক দাবি ছাড়াও চাষিদের কাছ থেকে কয়েকটি ছোটখাটো উপরি পাওনা আদায় করত। যেমন জন্ম, বিবাহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারা কর আদায় করত। কোন কোন স্থানে 'দস্তার—শুমারী' (পাগড়ী গোনা) নামে মাথাপিছু এক কর আদায় করত। আর করতো 'খানা-শুমারী' বা বাড়িকর ও অন্যান্য উপকর। প্রজাদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে নিতো তাদের দেখা যেত। বলাহার, থোরী, ধানুক ও চামাররা তাদের জমিদারদের জন্য পথ দেখানোর কাজ ও কুলির কাজ করতে বাধ্য ছিল। এসব উপরি পাওনা থেকে একজন জমিদার কী পরিমাণ আয় করতো, সে সম্পর্কে অবশ্য সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

জমিদারদের সঙ্গে জায়গিরদারদের আবার পার্থক্য ছিল। জায়গিরদার সরকারি কর্মচারী, বেতনের বদলে তারা জায়গির ভোগ করতেন। জায়গির বংশানুক্রমিক ছিল না। জমিতে জমিদারের কোনো শর্ত ছিল না। জায়গিরদারকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বদলি করা চলতো। জায়গিরদার তার জায়গির বা জায়গিরের অংশ বিক্রি করতে পারতেন না। অন্যদিকে জমিতে বা জমিদারিতে জমিদারের স্বত্ব ছিল বংশানুক্রম। জমিদার ছিলেন রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। তিনি তার স্বত্ব দান করতে, বিক্রি করতে, বা হস্তান্তরিত করতে পারতেন। তারা কখনো কখনো নিষ্কর জমিও ভোগ করতো। আবার কোনো কোনো স্থানে আদায়ি রাজস্বের একটা অংশ পেতেন। অর্থাৎ এককথায় কৃষকের উৎপন্ন করা ফসলের একটা অংশ জমিদাররা ভোগ করতেন।

জমিদারদের মধ্যে শ্রেণিভেদ ছিল। বিশাল রাজ্যের সমান এলাকায় জমিদাররা যেমন ছিলেন তেমনি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছোট জমিদাররাও ছিলেন। জমিদারদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিভুক্ত ছিলেন সামন্ত শ্রেণি। রায়, রাণা রাজা ইত্যাদি ছিল তাদের উপাধি। এরা পেশকাশী জমিদার নামে পরিচিত ছিলেন। এই শ্রেণির জমিদাররা সরকারকে সাহায্য দিতেন এবং তার নিদর্শন স্বরূপ উপঢৌকন বা পেশকাশ পাঠাতেন। যেমন জম্মুর রাজা বা কাংড়ার রাজা। পেশকাশ দিতেন বলে এদের পেশকাশী জমিদার বলা হত। এরা জমিদারি পরিচালনায় স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতেন।

এই পেশকাশ বা উপঢৌকনের বিশদ বর্ণনা মেলে না। তবে সাধারণত পশুপাখি মূল্যবান রত্ন অলংকার ইত্যাদি এমনকি নগদ টাকাও পেশকাশ হিসেবে পাঠানো হতো। সম্ভবত জমিদারের জমার ওপর নির্ভর করতো পেশকাশের পরিমাণ। মুঘল শাসন অবশ্য সবসময়ই চেষ্টা করেছে পেশকাশী জমিদারকে মালগুজারি জমিদারে পরিণত করতে যেখানে জমি জরিপ করে খাজনা নির্ধারণ করা হবে ও কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আবুল ফজলের বর্ণনায় দেখা যায় যে, পেশকাশ নিয়মিত পাঠানো হতো। জমিদার বা তার দূত দরবারে উপস্থিত হয়ে যেমন পেশকাশ বা উপঢৌকন দিত, তেমনি সম্রাটের প্রতিনিধি জমিদারিতে বা তার নিকটবর্তী স্থানে হাজির হলে জমিদারের তরফে পেশকাশ দেওয়া হতো। জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার সুবাদার যখন সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় যশোরের কাছে যান তখন জমিদার প্রতাপাদিত্য তার সঙ্গে দেখা করেন। তার দুই ছেলেকে মনসবদার করা হয় এবং তাকে পেশকশ নিয়ে আবার দেখা করতে বলা হয়। এই পেশকাশের মধ্যে আবার সোনার মোহর ছিল। কিন্তু প্রতাপাদিত্য নিজে না এসে

ছেলেকে পাঠান ও সোনার বদল রূপার টাকা পাঠান। এর পরেই তাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনা থেকে মনে হয় যে নিয়মিত ও অনিয়মিত দু'ধরনের পেশকাশী জমিদার ছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত জমিদারদের বলা হত মালওয়াজির বা মধ্যবর্তী জমিদার। এদের জমিদারির রাজস্ব জমি জরিপ করে ধার্য করা হত। আর তৃতীয় শ্রেণিতে ছিল খিদমতি জমিদার। এরা রাজস্ব সংগ্রহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অন্যান্য কাজে সরকারের খিদমত বা সেবা করত। তার বিনিময়ে নানা সুযোগ-সুবিধা পেত। চৌধুরী, মুকাদ্দম, দেশমুখ ইত্যাদি ছিল তাদের উপাধি। নুরুল হাসান তৃতীয় শ্রেণির এই জমিদারদের মুঘল আমলের মুখ্য জমিদার বলে অভিহিত করেছেন। জমিদারদের নিজস্ব সৈন্য থাকতো। জমিদার শ্রেণির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার থেকে জমি জরিপ বা আমিল নিয়োগ করা হত। এসব নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে অনেক সময় জমিদারগণ বিদ্রোহ করতেন। কৃষক অসন্তোষের সুযোগে তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শামিল হত।

১৪.১০ পদমর্যাদা

মুঘল আমলের সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে ভূমি রাজস্ব পরিচালন অব্যাহত রাখতে জমিদার শ্রেণি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হত। জমিদার- সরকার সম্পর্ক নির্ধারিত হত জমিদারদের দ্বিবিধ স্বত্বের ভিত্তিতে একদিকে জমিদার ছিলেন ভূমি-স্বত্বভোগী প্রজা এবং অন্যদিকে তিনি ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী। এই মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকায় তার দায়িত্ব ছিল সরকারি কর্মচারী নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহ এবং জমিতে পূর্ণ সাধ্য অনুযায়ী ফলন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। আইনের চোখে সম্ভবত এই দুই স্বত্বারই পৃথক গুরুত্ব ছিল। ফলে নির্ধারিত ভূমি রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকলেও জমির মালিকানা স্বত্ব হতে উদ্ভূত দস্তুরি থেকে তাকে বঞ্চিত করা সম্ভব ছিল না। আর এই বিশেষ পদ-মর্যাদাই তাকে সাধারণ মধ্যস্বত্বভোগী থেকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর এই কারণেই জমিদারকে সাধারণ জোতদারের পর্যায়ে ফেলা যেত না। আবার জমিদার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আবাদি জমির উপর ধার্য খাজনা সংগ্রহ ও তা জমা দেবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করতেন, সেজন্য মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবেও তাকে গণ্য করা হতো। সমগ্র গ্রামের উপর এককভাবে বা বিভিন্ন কৃষকের ব্যক্তিগত জমির উপর পৃথকভাবে ঐ রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ায় রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারবর্গ 'জমিদারন-ই-রায়তি' বলে পরিচিত ছিলেন। আর এক শ্রেণির জমিদার ছিলেন যাদের জমিদারন-ই-জোরতলব বলা হত। কারণ তারা প্রায়ই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করতেন এবং বলপ্রয়োগের হুমকির দ্বারাই তারা নির্দিষ্ট কর দিতে সম্মত হতেন। সর্বোপরি জমিদার জমিদারির অভ্যন্তরেই বাস করতেন। অনেক সময় শ্রমিক নিয়োগ করে কৃষকদের মত জমিতে ফসলও উৎপন্ন করতেন। এর ফলে গ্রামের সঙ্গে তথা জমিদারির সঙ্গে ও তার অন্যান্য বাসিন্দাদের প্রতি তার এক মমত্ববোধ গড়ে উঠতো।

১৪.১১ জমিদারের কর্তব্য

স্থানীয় রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং তার নানান দায়িত্ব ছিল। এক, জমিদারির সমস্ত আবাদযোগ্য জমি চাষ হচ্ছে কি না তা দেখা জমিদারের দায়িত্ব। কৃষককে তার ইচ্ছায় বা প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে কৃষিকার্যে তাকে নিয়োগ করার ক্ষমতা জমিদারের ছিল। কৃষকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকায় সে সময়ে সরকারি কর্মচারীর পক্ষে কৃষককে কৃষিকার্যে নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। কারণ তারা কোনোমতেই একজন অপরিচিত ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। কিন্তু বংশপরম্পরায় একই গ্রামে বাস করার ফলে জমিদারদের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল।

জমিদার গ্রামের সমৃদ্ধি কামনা করতেন। গ্রামের সমৃদ্ধির সঙ্গে তার নিজের স্বার্থও জড়িত ছিল। গ্রামের সমৃদ্ধি জমিদারের জীবনে স্বাচ্ছন্দ নিয়ে আসতো। তাছাড়া গ্রামীণ সমৃদ্ধি রায়তের শুভেচ্ছা ও কর্ম-উদ্যোগকে উৎসাহিত করত। তাই স্থানীয় প্রশাসনিক কাজে জমিদারের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত জমিদারের এই ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রও বেশ সচেতন ছিল। তাই প্রায়ই জমিদারদের তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সরকার অবহিত করতো।

দ্বিতীয়তঃ জমিদারের প্রধান কর্তব্য ছিল মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে ধার্য ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করা ও সরকারি খাজাঞ্চিখানায় তা জমা করা। একদিকে কৃষক আর অন্যদিকে সরকার উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে অথচ জমিদারের যথেষ্ট লাভ থাকবে এমন পরিমাণ রাজস্ব ধার্য করা ও তা আদায় করার জন্য জমিদারের যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন ছিল।

তৃতীয়ত, এসব ছাড়াও জমিদারিতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব ছিল জমিদারের। যেমন কোনো চোর বা দুষ্কৃতি তার জমিদারিতে আশ্রয় নিলে সে সম্পর্কে জমিদারকে খোঁজখবর নিতে হতো। প্রয়োজনে তিনি ব্যবস্থাও নিতেন। তাকে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতো। প্রতিবেশি কোন জমিদার রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হলে বা কোনোরকম অবাধ্যতা প্রকাশ করলে, বিদ্রোহী হিসাবে তার বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান চালানো হতো, জমিদারকেও সেই অভিযানে যোগ দিতে হতো। এক কথায় মুঘল আমলে গ্রামীণ প্রশাসনে জমিদার ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

১৪.১২ কৃষকের অবস্থা ও তার অধিকার

মুঘল আমলে কৃষকদের অবস্থা কেমন ছিল? এক ডাচ পর্যটকের বর্ণনায় এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। জাহাঙ্গিরের আমলে ভারতে আসেন। তিনি এদেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন তার বর্ণনায়। তিনি লিখেছেন যে, তাদের জীবন ছিল অভাব আর নিদারুণ দুঃখের বাসভূমি। দক্ষিণ ভারতের মানুষদের সম্পর্কে লিখেছেন যে জীবনধারণের জন্য তাদের খুব অল্প জিনিসই দরকার পড়ে। এক কথায় সাধারণ মানুষের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। কৃষকরাও এই ব্যবস্থার ঊর্ধে ছিলেন না।

যোড়শ শতকের ভারতে জমির মালিক কৃষক ছিল না। জমির মালিকানা কেবল রাজার হাতেই ন্যস্ত ছিল। ইউরোপীয় পর্যটকদের বর্ণনায় এমন কথাই বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রায় সকলেই এই ধারণায় বিশ্বাস করে গেছেন কিন্তু এখন আর এ ধারণা সত্য বলে গ্রাহ্য নয়। বরং স্পষ্ট করে বলা হয় যে, হিন্দু বা মুসলমান প্রচলিত সমকালীন কোন বিধানেই ঐরকম কোন নীতির স্বীকৃতি নেই। মধ্যযুগের ভারতীয় গ্রন্থ প্রণেতাদের রচনা বা বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজে এমন কথা কোথাও লেখা নেই যে, যা থেকে বলা যায় যে সম্রাটই ছিলেন সমস্ত জমির মালিক। বরং আবুল ফজলের রচনায় অন্য ইঙ্গিত মেলে। তিনি চাষি ও ব্যবসায়ীদের ওপর কর বসানোর উদ্যোগকে সমর্থন করতে গিয়ে যুক্তি দেখান যে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে বাদশাহকে যে ব্যবস্থা করতে হয়, তারই বিনিময়েই এই করকে বাদশাহীর পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য করতে হবে। কিন্তু জমির মালিক বলে বাদশাহকে কর প্রদান করতে হবে ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে এমন কোনো ইঙ্গিত কোথাও মেলে না। বরং সেখানে জমির আসল মালিক ছিল চাষি এর সমর্থনে এখন অনেকেই জোরের সাথে বলছেন, যদিও তারা এ বিষয়ে খুব বেশি প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। অধ্যাপক ইরফান হাবিব এমন কিছু প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন যেখানে কৃষককে জমির মালিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, আওরঙ্গজেবের এক ফরমানে 'মালিক' ও 'আরবাব-এ-জমিন' (জমির মালিক) বলতে সাধারণ চাষিকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তথ্যে যা-ই থাকুক না কেন বাস্তবে চাষিরা জমির মালিক বলতে যা বোঝায় চাষিদের কি সেই অধিকার ছিল?

ইরফান হাবিব মনে করেন, মুঘল আমলে চাষি যে জমি চাষ করে সেই জমির উপর তার স্থায়ী ও বংশগত দখলিস্বত্ত্বের ব্যাপারে একটা সাধারণ স্বীকৃতি ছিল। মুহম্মদ হাসিমকে যে ফরমান দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল চাষি বা মালিক যদি জমি চাষ করতে না পারে, বা সম্পূর্ণ ফেলে রাখে তাহলে চাষ করতে রাজি আছে এরকম কোনো ব্যক্তিকে ওই জমি দিয়ে দেওয়া হবে যাতে ভূমি রাজস্বে ঘাটতি না পড়ে। কিন্তু কোনো সময় মালিক যদি সেই জমি চাষ করার সামর্থ্য ফিরে পায় সেখানে আবার ফিরে আসে তাহলে সেই জমি তাকে আবার ফেরত দিতে হবে। চাষির দখলিস্বত্ত্ব যে অস্বীকার করা যায় না তার স্বীকৃতি রয়েছে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে দুটি বিধানে। প্রথমটি পাওয়া যায় *আইন-ই-আকবরিতে*। রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সেখানে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, তারা যেন চাষিদের মালিকানাকে ('রাইয়ত কাস্তা')-কে 'মাদাদ-এ-মাস' এর অধিকারীদের খুদ-কাস্তা বা নিজ চাষের জমি হিসেবে নথিভুক্ত না করে।

আর একটি প্রমাণ হল জাহাঙ্গির সিংহাসনে বসার পর যে বারোটি আদেশনামা জারি করেন, তার একটি। সেখানে রাজস্ব দপ্তরের কর্মীদের বলা হয়েছে, তারা যেন চাষিদের জমি (জমিন-এ রি-আয়া)-কে জোর করে নিজেদের জোতে ('খুদে-কাস্তা') পরিণত না করে। তাছাড়া *আইন-ই-আকবরিতে* আছে যে যারা পুরুষানুক্রমিক ভাবে চষা জমির মালিক বাদশাহ্ তাদের রক্ষা করেন। অর্থাৎ জমিতে চাষিদের অধিকার যে বংশগত (মৌরসী) ছিল তা আবুল ফজলও বলেছেন। চাষিদের এই মৌরুসি জমির কথা কাফি খাঁ-ও উল্লেখ করেছেন। মহম্মদ হাসিমকে দেওয়া ফরমানে দেখা যায় যে চাষির জমি বিক্রির অধিকার ছিল সেকালে। কিন্তু মনে রাখতে হবে আধুনিককালে মালিকের ইচ্ছামত জমি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাবার অধিকার মুঘল আমলের কৃষকদের ছিল না। জমি চাষির অধীন হলেও চাষিও আবার জমির অধীন ছিল। উত্তরাধিকারী না থাকার ফলে চাষের পক্ষে জমি ছেড়ে চলে যাওয়া বা চাষ করতে নারাজ হওয়া-এ দুটোর কোনটাই সম্ভব ছিল না। ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক গেলেইসেন পোল্যান্ডের ভূমিদাসদের সঙ্গে ভারতীয় চাষিদের কোন তফাৎ দেখেননি। কারণ ভারতীয় চাষিরা পোলাণ্ডের মত বীজ বুনতে বাধ্য ছিল। মহাম্মদ হাসিমকে দেওয়া ফরমানটিতে বলা হয়েছিল যে, চাষির যদি চাষ করার ক্ষমতা থাকে ও সেচের যদি ব্যবস্থা থাকে, তবুও যদি দেখা যায় তারা কৃষিকার্য করছে না, তাহলে রাজস্ব কর্মচারীদের উচিত তাদের ওপর জুলুম করা, ভয় দেখানো এবং বন্দী করা ও দৈহিক শাস্তির ভয় দেখানো। এসব জবরদস্তি সত্ত্বেও যদি দেখা যায় কোন চাষি চাষ করতে অক্ষম তাহলে অন্তত সাময়িকভাবে সে জমির উপর তার অধিকার হারাবে এবং তা হাত বদল করা যেতে পারে। ঔরঙ্গজেবের আমলে গ্রামের ভারপ্রাপ্ত সরকারি আমলাদের কথা দিতে হতো যে, তারা কোনো চাষিকে জমি ছেড়ে যেতে দেবে না। তৎসত্ত্বেও যে সব চাষি ফেরার হয়ে যেত তাদের জমি অন্যান্য বসবাসকারীদের মধ্যে বিলি করার দায়িত্বও ঐ আমালাদেরই ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চাষি জমি ছেড়ে অন্য কোন জমিদারের এলাকায় পালিয়ে গেলে তাদেরকে আবার জোর করে ফিরিয়ে আনা হতো। জমির সাথে কৃষকের এই বাধ্যতামূলক বন্ধনের প্রক্রিয়াকে লক্ষ্য করে ইরফান হাবিব মুঘল কৃষকদের জীবনকে 'আধা-ভূমিদাস জীবন' বলেছেন। চাষিদের দখলিস্বত্ত্ব মেনে নেওয়ায় প্রশাসন যে উৎসাহ দেখিয়েছিল চাষিকে জমির সঙ্গে যুক্ত রাখতে তথা চাষি যাতে জমি ছেড়ে পালিয়ে না যায় সে ব্যাপারে উদ্বেগ দেখিয়েছিল সে যুগে সেটা ছিল খুব স্বাভাবিক। কারণ তখন লোক সংখ্যা ছিল কম। আর জনসংখ্যার তুলনায় কৃষি জমির পরিমাণ ছিল বেশি। মুঘল যুগে অনেক অঞ্চলে মোট জমির অর্ধেকের বেশি চাষ হতো না। ফলে চাষি করতে চাইলে জমির অভাব ছিল না। কৃষি জমির তুলনায় রায়তের এই স্বল্পতা হেতু কৃষি ক্ষেত্রে যে অস্থিরতা দেখা দিত, তা প্রশমিত করে কৃষিক্ষেত্রে স্থিতিশিলতা আনার জন্যই প্রয়োজন হত দমনপীড়নের।

বস্তুত মুঘল আমলে ভারতীয় কৃষকদের ভূম্যাধিকারকে এক ধরনের মালিকানা স্বত্ব বলা যায় বটে তবে মালিক

হবে স্বাধীন ও তারই থাকবে ইচ্ছামত জমি হাত বদলের অধিকার। আর চাষি যেহেতু আইনগতভাবে কোনো জমি কোনো কারণে ছেড়ে যেতে পারতো না তাই সে ছিল ভূমিদাসের শামিল। সুতরাং জমির প্রকৃত মালিকানা না ছিল রাজার, না ছিল চাষির। অর্থাৎ রাইয়তী এলাকায় জমির কোনো মালিকানা খুঁজে পাওয়া যাবে না। জমি ও ফসলের ওপর বিভিন্ন ধরণের অধিকার ছিল ঠিকই, কিন্তু সম্পত্তির নিরঙ্কুশ অধিকার বলতে কিছু ছিল না।

অন্যদিকে কৃষকের জীবনযাত্রার মান ছিল খুব সাধারণ বা নীচু মানের এবং কুঁড়েঘর ছাড়া তাদের এমন কোনো স্থাবর সম্পত্তি ছিল না যে তাকে পুরোনো ভিটেয় আটকে রাখবে। *বাবরনামা*-য় বাবর লিখেছেন, হিন্দুস্থানে পাড়াগাঁ, গ্রাম এমনকি শহরগুলো মুহূর্তের মধ্যে যেমন জনশূন্য হয়ে যায়, তেমনই আবার গড়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যেই। বছরের পর বছর ধরে বেশ বড় শহরেই বাস করেছেন এমন সব লোক যদি পালায় তারা এমনভাবে পালায় যে এক-দেড় দিন বাদে তাদের বসবাসের কোন চিহ্ন বা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে যে জায়গায় বসবাস করবে ঠিক করে সেখানে তারা না কাটে খাল, না দেয় নদীতে বাঁধ, কারণ সব শস্যই তো হবে বৃষ্টির জলে। ভারতের জনসংখ্যা বিপুল। একসঙ্গে কিছু লোক জড়ো হলেই তারা পুকুরঘাটে কিংবা কূপ খনন করে; আর বাড়ি তৈরি বা দেওয়াল তোলার সমস্যা নেই। চারিদিকে তো অজস্র ঘাস আর অজস্র গাছগাছালি। তা দিয়েই গড়ে ওঠে কোন গ্রাম বা শহর।' চাষির বারংবার বাসস্থান পরিবর্তনের এই ক্ষমতাই সে যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে দুর্ভিক্ষ হলে বা চাষির উপর অত্যাচার হলে তারা স্থান পরিত্যাগ করতো। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় কৃষকদের জমি থেকে পালানো আটকাতে রাষ্ট্র কেন উদ্যোগী হয়েছিল।

চাষি আইনগতভাবে তার জমি ছেড়ে যেতে পারত না, প্রকৃতপক্ষে সে ছিল ভূমিদাসেরই শামিল। ইরফান হাবিব তাই মনে করেন, জমির প্রকৃত মালিকানা না ছিল রাজার, না ছিল চাষির। জমি ও ফসলের উপর বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল বটে কিন্তু সম্পত্তির অধিকার বলতে কিছু ছিল না। তবে সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়েই যে কৃষক জমি থেকে পালিয়ে যাবে এমন আতঙ্ক ছিল তাও কিন্তু নয়। এমনও জমি ছিল যা অসাধারণ উর্বর। সেচের সুবিধা বর্তমান বা বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত যেখান থেকে সহজেই ফসল নিকটবর্তী শহর অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বিক্রি করা সম্ভব। এরকম স্থানে কৃষক যে কোন শর্তে চাষ করতে রাজি ছিল। সরকারি কর্মী বা জমিদারদের সেক্ষেত্রে ভয় ছিল না যে, চাষিকে উচ্ছেদ করলে ওই জমি চাষের জন্য অন্য চাষি পাওয়া যাবে না।

দস্তর-ই-অমাল-ই বেকাস গ্রন্থে জমিদার প্রদত্ত এক অঙ্গীকারনামা থেকে জমিদার-কৃষক সম্পর্কের রূপটি ধরা পড়ে। সেখানে বলা হয়েছে —(১) জমিদার কৃষকের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহ করে তার সরকারি কোষাগারে জমা করবেন। (২) নির্ধারিত রাজস্বের অতিরিক্ত অর্থ জমিদার কৃষকের কাছ থেকে আদায় করবে না। (৩) জমিদার এমন কিছু করবে না যাতে কৃষক গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। (৪) গ্রামত্যাগী কৃষকেরা যাতে গ্রামে ফেরে জমিদার সে ব্যাপারে উদ্যোগী হবে। (৫) গ্রামে ফিরে আসা কৃষক যাতে তার দখলিস্বত্ব ভোগ করতে পারে সেদিকে জমিদার নজর রাখবে। (৬) কৃষক গ্রামে ফিরতে না চাইলে নির্ধারিত রাজস্বের আনুপাতিক হারে উক্ত জমি বিলি করে দেবেন জমিদার। (৭) নিজ স্বার্থে জমিদার কৃষকের ওপর অতিরিক্ত চাপ দেবেন না।

এই অঙ্গীকারনামায় কৃষক সম্পর্কিত তিনটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন নোমান আহমেদ সিদ্দিকি। এগুলি হল রাজস্ব ধার্য ও তা আদায় সংক্রান্ত, জমিতে কৃষকের দখলিস্বত্ব এবং জমিদারের প্রয়োজনে কৃষকদের শ্রমদানের দায়িত্ব সম্পর্কিত। তার মতে, এগুলির ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মুঘল আমলে জমিকে কৃষকদের দখলিস্বত্ব সুরক্ষিত ছিল এবং জমিদারদের অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল।

দস্তুর-উল-অমাল গ্রন্থ প্রণেতা মেহি আলি খাঁ। তিনি লিখেছেন, মুঘল আমলে বংশানুক্রমিক দখল স্বত্বের অধিকারী কোন কৃষক পরিবারকে তার দখলিস্বত্ত্ব থেকে বঞ্চিত করা যেত না। কৃষক স্বেচ্ছায় যদি তার স্বত্ত্ব ভোগ করতো, তবে জমিদার সেই জমি পুনর্বণ্টন করতে পারতেন।

তবে এইসব ব্যবস্থার সুবিধা কৃষক কতটা নিতে পারতো তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ মুঘল শাসন যে অনেক ক্ষেত্রে কৃষক শ্রেণির স্বার্থের পরিপন্থী ছিল তার উল্লেখ মেলে *হিদায়ত-উল-কাওয়াদ গ্রন্থে*। সেখানে বলা হয়েছে, মনসবদাররা রাজস্ব আদায়ের জন্য সেনাবল প্রয়োগ করত। পদোন্নতির জন্য রাজ কর্মচারীরা রায়তি জমিদারদের উপর অতিরিক্ত রাজস্বের জন্য চাপ দিত। জমিদার কৃষকদের পীড়ন করে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করত। উপরন্তু মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি কৃষি-সমাজের ওপর চাপ বৃদ্ধি করত। সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে কৃষকের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। কেবল গ্রাসাচ্ছাদন করেই তাদের জীবন যাপন করতে হতো। অধিকাংশ কৃষকই ছিল দরিদ্র।

১৪.১৩ উপসংহার

আকবরের রাজত্বকালে মুঘল শাসনব্যবস্থা ভারতের মাটিতে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এর একদিকে ছিল সাম্রাজ্যের সামরিক বিস্তার; অন্যদিকে ছিল সুষ্ঠ ভাবে প্রশাসন পরিচালনার নীতি গ্রহণ করা এবং ভূমি রাজস্ব আদায় করা। ভারতের মতন দেশে ভূমি রাজস্ব আদায় করা খুব সহজ কাজ ছিল না। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিককার রাজস্বসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো দেখলেই তা বোঝা যায়। ব্রিটিশ শক্তির মতন মুঘলরাও চেষ্টা করেছিল সর্বাধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করতে। কিন্তু দুই এর মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল: ব্রিটিশ আমলে জমি কম, চাষ করার লোক বেশি; মুঘল যুগে বিপরীত — জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যা কম ছিল। ফলত, ব্রিটিশ আমলে কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করা সহজ ছিল। অন্যদিকে মুঘলরা কৃষককে জমির সঙ্গে বেঁধে রাখত বা রাখার চেষ্ট করত। জমির চরিত্র-ও ছিল নানা প্রকারের। ফসল উৎপাদনে যেমন বৈচিত্র্য ছিল, জমির চরিত্রও নানা ধরনের ছিল। মুঘলরা চেষ্টা করেছিল সব ধরনের বৈচিত্র্যকে বিবেচনার মধ্যে রেখে, একটি গড় রাজস্ব নির্ধারণ করতে যা কৃষকদের পক্ষে দেওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না।

জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দূরত্ব ছিল, তেমনি কৃষি সমাজেও আর্থিক ও সামাজিক ব্যবধান ছিল। গ্রামের মোড়ল উচ্চশ্রেণির ধনী কৃষকেরা ছিল কৃষক সমাজের উপরের অংশ। তেমনি নিচের দিকে ছিল ছোট ছোট কৃষকগণ। অবস্থাপন্ন কৃষকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ থাকলেও ছোট কৃষকদের তা ছিল না। বীজ কেনা গবাদিপশু কেনা বা কৃষিকার্য চালানোর জন্য সম্পূর্ণ ঋণের উপর নির্ভর করতে হত। গ্রাম জীবনে কৃষক ছাড়াও সর্বনিম্ন স্তরে আর এক শ্রেণির মানুষ ছিল যাদের নিজের জমি চাষ করাও নিষিদ্ধ ছিল। এরা হল চামার, ধানুক, বলাহার প্রভৃতি। এরা চামড়ার কাজ, ঝাড়ু দেওয়ার কাজে নিযুক্ত থাকতো। জমিদার বা অবস্থাপন্ন কৃষকের জমিতে এদের ঠিকা শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগানো হতো। অবশ্য ধর্মকুমার বলেছেন, গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণ খানিকটা আলগা হলে নিম্নশ্রেণির কিছু লোক ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের মর্যাদা পেলেও তারা গ্রামীণ দাসত্বের ঊর্ধে উঠতে পারেনি। ইরফান হাবিবের মতে, সমাজের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বৈষম্য বর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়েছিল যা উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষকদের বহন করতে হয়।

১৪.১৪ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল আমলে জমির মালিকানাস্বত্ব কার ছিল ?

২. মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন।

৩. মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাঠামোটির স্বরূপ আলোচনা করুন।

৪. মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোয় জমিদারশ্রেণির ভূমিকা কী ছিল ?

৫. শাসক হিসাবে জমিদারশ্রেণির কর্তব্য আলোচনা করুন।

৬. মুঘল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জমির উপর কৃষকের অধিকার কীরূপ ছিল ?

১৪.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

N.A. Siddiki, *Land Revenue Administration under the Mughals, 1700-1750.* Delhi, 1989

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India,1556-1707,* OUP, 1999

Tapam Raycaudhury and Irfan Habib, *The Cambridge Economic History of India Vol. I, c.1200-1750.* CUP, 1982

Meena Bhargaua (Ed.), *Exploring Medieval India, Sixteenth to Eighteenth Centuries, Politics, Economy, Religion,* Vol-I, New Delhi, 2010

Satish Chandra, *History of Medieval India*, New Delhi, 2009

গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ,* কলকাতা, ১৯৮৩

ইরফান হাবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, ১৫৫৬-১৭০৭*, কলকাতা, ১৯৮৫

একক : ১৫ □ গ্রামীণ অস্থিরতা

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য

১৫.১ ভূমিকা

১৫.২ অতিরিক্ত রাজস্বের দাবি

১৫.৩ কৃষকদের বিদ্রোহ

১৫.৪ জমিদারদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ

১৫.৫ কৃষক বিদ্রোহে জমিদারদের নেতৃত্ব গ্রহণের কারণ

১৫.৬ উপসংহার

১৫.৭ প্রশ্নাবলী

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.০ উদ্দেশ্য

এই পাঠ গ্রহণের উদ্দেশ্য হল

- মুঘল আমলে রায়তের উপর অতিরিক্ত রাজস্বের দাবি এবং তা আদায়ে প্রশাসনের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
- এ প্রসঙ্গে সরকারি ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া গ্রাম—সমাজে কী রূপ লাভ করতো এবং তার ফলে কেমন অস্থিরতার সৃষ্টি হত সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১৫.১ ভূমিকা

মুঘল যুগের শাসক শ্রেণির বৈভবের প্রাচুর্য ছিল যেমন তেমনি সাধারণ কৃষকের দৈন্য ছিল অনুপেক্ষণীয়। বস্তুত সেকালে কৃষকদের শোষণই ছিল ধনীদের সম্পদ উৎস। এই শোষণ কেবল অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন প্রকার আবওয়াব বা বেআইনি করের বোঝা। কৃষি উৎপাদনের এক বিরাট অংশ এই আবওয়াবের চাহিদা মেটাতেই চলে যেত। সরকার তথা সম্রাটদের নিষেধ সত্ত্বেও আবওয়াবের দাবি কখনো শেষ হয়নি। প্রতি সম্রাটই প্রায় সিংহাসনে বসার সময় এসব আবওয়াব নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করতেন। জাহাঙ্গির, শাহজাহান বা আওরঙ্গজেব সকলেই একই কাজ করেছিলেন। তাদের এই ফরমান জারির ঘটনা আওরঙ্গজেবের উপস্থিতির কথাই প্রমাণ করে। এসব আবওয়াবের দ্বারা নিঃসন্দেহে রায়তকে সরকার-বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। তাছাড়া মুঘল আমলে চাষির ওপর রাজস্বের হার-ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। আকবরের আমলে জবত ব্যবস্থায় রাজস্বের হার ছিল শস্যের এক-তৃতীয়াংশ, সেখানে ঔরঙ্গজেবের আমলে তা বেড়ে হয় ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ। তবে এখন মনে করা হয়, সরকারি নিয়ম মোতাবেক আকবরের আমলে উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য হলেও বাস্তবে উৎপন্নের দুই-তৃতীয়াংশই কৃষককে রাজস্ব হিসেবে দিতে হত।

১৫.২ অতিরিক্ত রাজস্বের দাবি

ইসলামিক রীতি অনুসারে মধ্যযুগের অর্থনীতির মুল কথা ছিল কৃষকের ওপর শোষণের মাত্রা তার ন্যূনতম জীবনযাত্রা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা অবশ্যই সীমিত থাকবে। অর্থাৎ সরকার এমন দাবি করবে না যাতে কৃষকের জীবন যাপনের ন্যুনতম মান ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ এর ফলে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠনের আশঙ্কা থাকতো। জাহাঙ্গিরের আমলে এক সুবেদারকে তার কর্মে নিযুক্ত করার সময় নিয়োগপত্রে যে নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছিল তাতে কৃষক নিপীড়নের সরকারি স্বীকৃতি আভাসিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত কৃষককে এমন শায়েস্তা করা উচিত যাতে অন্যরা তা দেখে সাবধান হয়ে যায়। কৃষককে জব্দ করার এমন দৃষ্টান্ত আরো আছে। তবে সেই সাথে এটাও ঠিক যে অত্যাচারের মাত্রা সীমা অতিক্রম করলে সম্রাটরাও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। এমন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় উড়িষ্যায়। সেখানকার সুবেদার হাশিম খানকে অত্যাচারের অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছিল। জনগণ অভিযোগ করলে থানেশ্বরের অত্যাচারী ক্রোড়ি-কে আকবর ফাঁসি দেন। গুজরাটের জায়গিরদার বেশি হারে রাজস্ব ধার্য করলে ঔরঙ্গজেব অত্যাচার বলে ঘোষণা করেছিলেন। এসব সরকারি কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা সম্রাটের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠাতেন। তার দৃষ্টান্ত রয়েছে আকবরাৎ-এ। আবার প্রজাদের অভিযোগের ভিত্তিতে সম্রাট ঔরঙ্গজেব আবার রাজস্ব ১৬২ টাকা থেকে কমিয়ে ৪০ টাকা ধার্য করেছেন তেমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী কর্মচারীদের বরখাস্তও করা হতো। অর্থাৎ কৃষকের ওপর অত্যাচার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট ছিল। কিন্তু মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থায় নানান অন্তর্দন্দ্বের জন্য এই ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল এবং কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

খুলাসত-উৎ-তোয়ারিখ রচনা করেন সুজন রায়। তিনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যা থেকে বোঝা যায় যে কৃষকদের ওপর প্রায়শই রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হত। শিখ গুরু অর্জুন আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবেদন করেছিলেন যে পাঞ্জাবে মুঘল সৈন্য যাবার ফলে সেখানে শস্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং রাজস্বের হারও বাড়ে। কিন্তু পরে সৈন্যরা চলে গেলেন সর্ষের দাম পড়ে যায়। কিন্তু বর্ধিত রাজস্বের হারে এক-ই থাকে। ফলে চাষিরা কর দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। আকবর গুরু অর্জুনের আবেদন বিবেচনা করেন এবং রাজস্বের হার ১০ থেকে ১২ শতাংশ কমিয়ে দেন।এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে কৃষকের স্বার্থ সম্পর্কে মুঘল প্রশাসন সচেতন ছিল এবং প্রশাসনের সঙ্গে রায়তের যোগাযোগ ও নির্ভরতার সম্পর্ক সূচিত হয়। আওরঙ্গজেবের আমলে এমন দৃষ্টান্ত আছে যে, আমলা ও জমিদারদের আবওয়াব গ্রহণ ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করছে এবং সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছেন ও ব্যবস্থাও গ্রহণ করছেন। তাঁর আমলের ১২ তম বছরে জারি করা ফরমান থেকে জানা যায় যে, আগ্রার সরকার কনৌজের খালিসার দেওয়ানকে জমিদার আমিল, ক্রোড়ি, ফোতাদার প্রভৃতি কর্মচারীদের ওপর ব্যাপক খবরদারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল যাতে ওই অঞ্চলের সরকারি কর্মীরা রায়তদের ওপর জুলুম করে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় না করে। অর্থাৎ কৃষকের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা ছিল এক স্বাভাবিক ঘটনা। ফলে কৃষক সমাজ সর্বদা নিপীড়িত হত।

বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের এই চাপ ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেমন বাংলার কথা বলা যায়। বাংলাদেশে জমিদারদের জমি জরিপ ও শস্যের উপর কর আদায়ের চেয়ে লাঙ্গল পিছু কর সংগ্রহের দিকেই ঝোঁক ছিল। মুকুন্দরামের কাব্যে তার প্রমাণ মেলে। তেমনি আবার রাজস্থানে এবং গুজরাটেও কৃষকের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৃষক সমাজের উপর এই ভাবে যে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি হয় তাতে রাজস্ব ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

১৫.৩ কৃষকদের বিদ্রোহ

ক্রমবর্ধমান এই চাপের কারণ হল মুঘল কৃষি অর্থনীতিতে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে যেসব দ্বন্দ্ব ছিল, তা ক্রমশ বৈরিতামূলক দ্বন্দ্বের রূপ নিয়েছিল। জায়গির বদল ও ইজারাদারি ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে কৃষকদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কাছে বাঁচবার পথ ছিল দুটো। সাধারণত ব্যাপক অত্যাচার না হলে কৃষকরা বিদ্রোহী হত না। কিন্তু অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠলে তারা প্রতিরোধের পথ নিত। এই প্রতিরোধের আবার দুটো পথ ছিল এক কৃষি-কাজ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া। এটা ছিল ভারতীয় কৃষকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রাথমিক অস্ত্র। এই ঘটনার উল্লেখ মেলে ষোড়শ শতকে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বর্ণনায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমে রচিত ঘনরামের *ধর্মমঙ্গল* কাব্যেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। একই রকম ভাবে *তারিখ-ই ফিরিস্তা*-তেও ভারতীয় কৃষকদের ব্যাপকভাবে অঞ্চল ত্যাগের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'ধারণাতীতভাবেই একটি অঞ্চল হঠাৎ জনশূন্য হয়ে যায়। এর কারণ এখানকার অধিবাসীরা খড়ের ঘর তৈরি করে এবং তাদের গৃহস্থলির বাসন মাটির এবং দুটোই তারা বিনা কষ্টে পরিত্যাগ করতে পারে। ফলে তারা গবাদিপশু সমেত অন্য জায়গায় গিয়ে পূর্বের পরিত্যক্ত গৃহের মত বাসস্থান করে নেয় এবং মাটির পাত্র সংগ্রহ করে কৃষিকাজে মন দেয়।" বাবর তার আত্মজীবনীতে একই রকম কথা লিখেছেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের এ রূপ গ্রামত্যাগের ঘটনা বা নির্দশন পাওয়া যায় ভুরি ভুরি। উড়িষ্যার দেওয়ান হাসিমের অত্যাচারে কৃষকেরা এরকমভাবে অন্যত্র পালিয়ে ছিল। অষ্টাদশ শতকের মহম্মদ শাহের রাজত্বে বিহার থেকে পাওয়া অসংখ্য পরোয়ানায় দেখা যায় যে, অত্যাধিক জমার চাপে কৃষকরা গ্রামের পর গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছে।

আর এই পলায়ন ছাড়া দ্বিতীয় যে অস্ত্র ছিল তা হল বিদ্রোহ। এই 'রাইয়ত সরকশথে'-এর কথা মুঘল দলিলে বারবার বলা হয়েছে। এই দৃষ্টিতে গুজরাটে কিছু গ্রামকে 'মেওয়াসি' বা বিদ্রোহী এবং কিছু গ্রামকে রাসতি বা শান্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। *আইন-ই-আকবরি*-তে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাবের কথা উল্লেখিত হয়েছে। খাজনা না দেওয়া মুঘল ব্যবস্থায় নতুন কিছু ছিল না। মানুচ্চি লিখেছেন, রাজস্ব না দেওয়া ভারতীয় কৃষকদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এবং রাজস্ব না দিয়ে বরং অত্যাচার সহ্য করা তাদের কাছে বেশি কাম্য ছিল। তিনি লিখেছেন- 'তাড়াতাড়ি রাজস্ব না দেওয়ার অভ্যাস কৃষকদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসিত হয়। যে সবচেয়ে বেশি মার খায় ও সহ্য করে তাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করা হয়। এই জাতীয় ব্যবহার ও অপমান সহ্য করার মধ্যে সম্মান বেশি।' এক পর্তুগিজ পর্যটকও বাংলার কৃষকদের সম্পর্কে একই কথা লিখেছেন: 'এত অত্যাচার সত্বেও বাংলার জনগণ অর্থ দিতে এতটা অনিচ্ছুক যে সমাজের কিছু লোক মনে করে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তীব্রভাবে প্রহৃত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রাজস্ব দেওয়া একটা মস্ত অপমান।' খান-ই-জাহানের জায়গিরের কৃষকরা বিনা প্রতিরোধে এক টাকাও রাজস্ব দিত না এবং এজন্য তার দেওয়ান গঙ্গারামকে এলাহাবাদ অঞ্চলে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী মাইনে দিয়ে ভরণ-পোষণ করতে হত। প্রকৃত ঘটনা হল মুঘল আমলের রাজস্বের হার এত বেশি ছিল যে কৃষকের প্রায় সমস্তটাই নিয়ে নেওয়া হতো। সেইজন্যই রায়ত রাজস্ব দিতে অনীহা প্রকাশ করত। অষ্টাদশ শতকে শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি শাহ ওয়ালিউল্লা-র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কৃষক, বণিক ও কারিগরদের ওপর অতিরিক্ত কর চাপানো হত ও অত্যাচার করা হত। ফলে যারা ভিতু শ্রেণির মানুষ তারা পালাত, আর যারা ক্ষমতাশালী তারা বিদ্রোহ করত। একমাত্র করভার কমলেই দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল। জাঠ, কোলি, মারাঠা ও শিখ বিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিল অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায়ই।

১৫.৪ জমিদারদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে কৃষকদের পক্ষে সে কালে সর্বক্ষেত্রে সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদে শামিল হওয়া সম্ভব ছিল না। উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রগত বিচ্ছিন্নতা কৃষকদের কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণিতে রূপান্তরিত করতে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরোধিতায় অবতীর্ণ হবে এমন কৃষি-সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তাই অনেক ক্ষেত্রে এ জাতীয় অসন্তোষকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতো জমিদার শ্রেণি। বিশেষত প্রাথমিক স্তরের জমিদার বা মালগুজারি জমিদাররা। ভুললে চলবে না যে উদ্বৃত্ত সম্পদের ভাগীদার প্রধানত দুজন জমিদার ও জায়গিরদার। সম্পদের অধিকাংশ জায়গিরদারের করায়ত্ত হবার ফলে জমিদারদের সঙ্গে জায়গিরদারের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা সেকালের ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। শুধু তাই নয় জমিদারদের সাথে জায়গিরদারদের সংঘাত ছিল স্বাভাবিক ও নিয়মিত ঘটনা। মুঘল রাজ্যে হিন্দু রাজা ও জমিদারের বিদ্রোহ ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মানুচ্চি লিখেছেন, "সাধারণ মুঘল প্রতিনিধিরা হিন্দু রাজা এবং জমিদারদের সঙ্গে নিত্য সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো এবং এর কারণ হল রাজ্য দখল করা এবং সাধারণদের রাজস্বের চেয়েও অধিক সংগ্রহ করা।'

ফারসি উপকরণে জমিদারদের বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত প্রচুর। বারেসওয়ারার ফৌজদারের চিঠি থেকেও জমিদার বিদ্রোহের পরিচয় মেলে। দিল্লির নিকটে অবস্থিত বায়স কৌমের জমিদার বারবার 'জমিদারানে জোরতলব কৌমে বায়েস'। অর্থাৎ বায়েস কৌমের বিদ্রোহী জমিদারদের কথা বলেছেন। এছাড়া জানা যায় যে কিছু কিছু অঞ্চলের জমিদাররা সেনাবাহিনী না পাঠালে তারা বড় একটা রাজস্ব দিত না। যেমন মুজাফফরগড়, সান্দিলা, বিজাপুর ইত্যাদি অঞ্চলের জমিদারগণ। *মুরকাৎ-ই-হাসান*-এ দেখা যায় যে, হরহরপুরের কৃষ্ণভঞ্জ মেদিনীপুর থেকে ভদ্রক পর্যন্ত ১০০ মাইল অঞ্চলে লুণ্ঠনকার্য চালান ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে। খুর্দার রাজা খণ্ডায়েৎ পাইক ও উপজাতিদের জমায়েত করে এবং কিছু জমিদারদের সঙ্গে একত্র হয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। হিজলি জমিদাররাও তার সাথে যোগ দেয়। এই সময়ে জমিদার ও জায়গিরদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার নেয়। এর দুটো কারণ ছিল প্রথমত জায়গিরদার এর পক্ষে কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করার ফলে জমিদারের মালিকানার নির্দিষ্ট অংশ কমে যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইজারাদারি ব্যবস্থা জমিদারদের প্রচন্ড আঘাত হানে। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হলে জমিদাররা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হত। এবং তাদের বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব ইজারাদাররা আত্মসাৎ করে। বহু ইজারাদার জমার হিসাবে কারচুপি করে, প্রায়শই সময় মত রাজস্ব না দেবার অজুহাত দেখিয়ে জমিদারের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে নেয় এবং অযোধ্যার বহু তালুকদারের উৎপত্তির পিছনে ইজারাদারদের কারচুপিই ছিল প্রধান। ফলে জমিদাররাও সশস্ত্র প্রতিরোধকে একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। ভীমসেন বুরহানপুরীর লেখা থেকে জানা যায় যে, 'জমিদাররাও শক্তি সংগ্রহ করে মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং অত্যাচারে ঘর-মুলুককে ছারখার করল। যখন প্রত্যেক জায়গায় জমিদারদের অবস্থা এরকম তখন জায়গিরদারদের কাছে এক কানাকড়ি পৌঁছনো কঠিন হলো।" পর্তুগিজ কাগজপত্রেও এরকম দ্বন্দ্বের পরিচয় মেলে। তিলপতের মালগুজারি জমিদার গোকুল ও সানসনি ও সঙ্গরের মালগুজারি জমিদার রাজারাম রামচেরা প্রথম পর্যায়ের বিদ্রোহের নেতা ছিল। বুন্দেলখণ্ডে গাউরদের বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল জায়গিরদার অনিরুদ্ধ সিং হাদার অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ইন্দ্ররাখির মালগুজারি জমিদার পাহাড় সিং গাউরের ক্ষোভ। এর সাথে অবশ্য জাতে উঠার ইচ্ছাও জড়িত ছিল। গাউররা চামার ছিল। ফলে সামাজিক মর্যাদা তাদের তেমন ছিল না। ছোটখাটো রাজপুত জমিদারদের জায়গিরদারের হাত থেকে রক্ষা করার বিনিময়ে পাহাড় সিং রাজপুত পরিবারের জামাই হতে চেয়েছিলেন। ফলে সমাজে তার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবার প্রত্যাশা এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হয়েছিল।

আওরঙ্গজেবের আমলে এইসব জমিদারদের বিদ্রোহের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দিল্লির সন্নিকটস্থ দোয়াব অঞ্চলে বা সুবা এলাহবাদে এ ধরনের বিদ্রোহ প্রায়শই দেখা দেয়। ১৬৮৪ থেকে ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নয়টি এলাকায় জমিদারদের

অবিরত বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

১৫.৫ কৃষক বিদ্রোহে জমিদারদের নেতৃত্ব গ্রহণের কারণ

কৃষক বিদ্রোহগুলিতে জমিদারদের নেতৃত্ব দেবার কতগুলো সুবিধা ছিল। বা বলা যেতে পারে কৃষক বিদ্রোহে জমিদারদের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার পেছনে কতগুলি কারণ ছিল। এক, মুঘল আমলে গ্রামগুলি জাতিভিত্তিক হওয়ায় কৃষক ও জমিদার মধ্যে একটা সামাজিক সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া জমিদাররা কৃষকদের সাথে সমগোষ্ঠীভুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, বহু সময়েই জমিদার-রা ছিল গ্রামীণ সমাজের সদস্য, যেখানে জায়গিরদাররা ছিল বাইরের লোক। গ্রামের কৃষককে কৃষিকাজে নানাভাবে সাহায্য করে, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে জমিদাররা গ্রামীণ সমাজ তথা কৃষকদের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। সর্বোপরি প্রতি জমিদারেরই কিছু না কিছু সৈন্য ছিল এবং তারা মাটির কেল্লারও মালিক ছিল। ফলে মুঘল শক্তিকে প্রতিহত করার প্রাথমিক শক্তি তাদের ছিল, যা তাদের বিদ্রোহের পথে পা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করতো। কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে বোঝাপড়ার সম্পর্ক বিভিন্ন রচনায় উল্লিখিত হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের আমলে এক সরকারি ইতিহাসবিদ লিখেছেন, 'কৃষকদের মন জয় করার জন্য এবং তাদের তুষ্ট করার জন্য যাতে তারা সময় মত রাজস্ব দেয় ও কথা শোনে, হিন্দুস্থানের জমিদাররা তাদের জমিদারির মহালের রাজস্ব ধীরেসুস্থে আদায় করে এবং সাম্রাজ্যের দস্তুর ও কানুন নিজেদের শাসনে প্রয়োগ করে না।' মনসবদাররা কৃষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করলে তারা বিদ্রোহী জমিদারের জমিদারিতে আশ্রয় গ্রহণ করতো। ফলে বিদ্রোহী জমিদারদের এলাকা জনসমৃদ্ধ হয়ে উঠতো এবং তাদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত।

১৫.৬ উপসংহার

মুঘল যুগে কৃষক বিদ্রোহ, প্রাথমিক জমিদারদের বিদ্রোহ, জায়গিরদারদের মধ্যে অন্তর্দন্দ্ব এই সাম্রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। শুধু তাই নয় এর পতনেরও অন্যতম কারণ এবং সাম্রাজ্যের অন্তিম দশার কারণ। কিন্তু এই অন্তিম দশা নতুন কোন সাম্রাজ্যের সূচনা করেনি। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কৃষকরা কোথাও তাদের নিজেদের ক্ষমতা দীর্ঘদিন কায়েম করতে পারেনি। যদিও বিভিন্ন জায়গাতে প্রাথমিক জমিদাররা শক্তি সঞ্চয় করে নিজেদের স্বাধীন করেছে এবং কৃষকদের সমর্থনও পেয়েছে। কিন্তু তারাও মুঘল শাসনের অনুকরণে সামন্ত রাজ্যের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করেছে, যেখানে কৃষককুল আবার শোষিত হয়েছে। জাঠদের রাজ্যে, শিবাজীর মারাঠা রাজ্য বা শিখদের মিসলে এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অব্যাহত ছিল। চিনের মত ভারতের কৃষকদের বিদ্রোহও একই পরিণামের শিকার হয়েছিল। তারা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, তা প্রতিরোধ করেছে, কিন্তু নতুন সমাজে তাদের উত্তরণ ঘটেনি। কৃষক বিদ্রোহের ফলে অধিক সুবিধাভোগী দলকে সরিয়ে আরেকটি সুবিধালোভী গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা ও স্বার্থকে কায়েম করেছে। আর যেহেতু এসব রাজ্যগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক নিয়মে আবদ্ধ ছিল, এখানেও ঠিক একই ধরনের অন্তর্দন্দ্ব কিছু কালের মধ্যেই প্রকটিত হয়ে কৃষকদের অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলেছিল।

১৫.৭ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল যুগে গ্রামীণ স্তরে কৃষক বিদ্রোহের কারণ কী ? এই বিদ্রোহে জমিদার শ্রেণির ভূমিকা কী ছিল?

২. মধ্যকালীন ভারতে প্রশাসনিক উৎপীড়ন কীভাবে গ্রাম-সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করত?

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India, 1550-1707,* OUP, 1999

Stish Chandra, *History of Medieval India*, Orient Blackswan, 2007

Satish Chandra, *Essays on Medieval Indian History*, OUP, 2009

গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, কলকাতা, ১৯৮৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

ইরফান হাবিব, *মধ্যযুগের ভারত একটি সভ্যতার পাঠ*, নয়াদিল্লি, ২০০৯

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

একক : ১৬ ❐ কৃষির প্রসার

গঠন

১৬.০ **উদ্দেশ্য**

১৬.১ **ভূমিকা**

১৬.২ **জমি জরিপ ও কৃষির প্রসার অনুধাবন**

১৬.৩ **উপসংহার**

১৬.৪ **প্রশ্নাবলী**

১৬.৫ **গ্রন্থপঞ্জী**

১৬.০ উদ্দেশ্য

এই পাঠ গ্রহণের উদ্দেশ্য হল মুঘল আমলে কীভাবে কৃষির প্রসার ঘটেছিল সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। নিম্নের বিষয়গুলি সম্পর্কে জনা যাবে পাঠটি গ্রহণ করলে:

- কী পরিমাণ জমি কৃষির আওতাভুক্ত ছিল।
- আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি কীভাবে হয়েছিল।

১৬.১ ভূমিকা

একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে যেমন তেমনি মুঘল আমলে কৃষিরও প্রসার ঘটেছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে কৃষির প্রসারে রাষ্ট্রের নজর ছিল উল্লেখযোগ্য। কারণ এদেশ কৃষি নির্ভর হওয়ায় এবং রাষ্ট্র রাজস্বের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষির প্রসার বরাবরই রাষ্ট্রশক্তির আগ্রহের বিষয়। এ কারণে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় তরফে কৃষি-সহায়ক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। যেমন সেচখাল খনন, বীজ সরবরাহ ইত্যাদি। মুঘল যুগে কৃষি-জমির পরিমাণ কীরূপ ছিল বা কোন কোন স্থানে কৃষির প্রসার ঘটেছিল বা কতটা জমি চাষের আওতাধীনে এসেছিল, তা নির্ধারণে ঐতিহাসিকরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে তিনজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ডব্লু. এইচ. মোরল্যাণ্ড, ইরফান হাবিব আর শিরিন মুসভি। আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরি* ও আরিফ কান্দহারী *তবাকাত-ই-আকবরি*-তে গোটা সাম্রাজ্যকেই কৃষির উপযোগী বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের লেখক সুজনরাই-এর *ইকবালনামা* থেকে মনে হয় সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের মোট জমির ১/৩ অংশই মাত্র কৃষিকাজের উপযুক্ত ছিল।

১৬.২ জমি জরিপ ও কৃষির প্রসার অনুধাবন

কী পরিমাণ জমি কৃষির আওতাভুক্ত ছিল তা অনুধাবনের জন্য জমি-জরিপ হওয়া এলাকা ও গ্রামের সংখ্যার পরিসংখ্যানের উপর ঐতিহাসিকগণ নির্ভর করেছেন। এ সম্পর্কিত দু'টি গ্রন্থে সমকালে কৃষির প্রসারের স্বরূপ অনুধাবনে ঐতিহাসিকদের সহায়াক হয়েছে একটি হল আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরি* আর অন্যটি রাই চতুরমন রচিত *চহার গুলশন*। *আইন-ই-আকবরি*-তে আবুল ফজল 'বারোটি প্রদেশের বিবরণ' শীর্ষক অধ্যায়ে থাট্টা, কাশ্মীর ও বাংলা ছাড়া গোটা উত্তর ভারতের এলাকা ভিত্তিক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। আকবরের রাজত্বের চল্লিশতম বছরে অর্থাৎ

১৫৯৫-৯৬ সালে এই পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর থেকে কী পরিমাণ জমিতে কৃষিকাজ হত, বা কৃষির সম্প্রসারণ কোন অঞ্চলে সে কালে ঘটেছিল তা জানা যায়। এই পরিসংখ্যানে প্রত্যেক প্রদেশে কতখানি জরিপ করা জমি ছিল তার হিসাব দেওয়া আছে। এই জমিকে বলা হয়েছে 'জমিন-এ-পইমূদা' বা 'মাপা জমি'। 'বিঘা'-কে একক ধরে এই পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। 'আরজী' বা জমি শিরোনাম অধ্যায়ে প্রতি 'সরকারে' সে কালে কী পরিমাণ জমি ছিল এবং কোন কোন মহাল নিয়ে সরকারগুলি গঠিত ছিল তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে সাম্রাজ্যের পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছিল, যদিও সেগুলি ছিল সংক্ষিপ্ত। সে কালের দু-তিনটি গ্রন্থে একটি সারণি পাওয়া যায়, যেখানে প্রতি প্রদেশের এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যান যা 'রক্কা' নামে নথিভুক্ত হয়েছিল। প্রতি প্রদেশে কত সংখ্যক গ্রাম ছিল, গ্রামে জরিপ হওয়া বা না-হওয়া জমি কত ছিল তার হিসাব-নিকাশ ঐ রক্কা-য় উল্লিখিত হয়েছিল। এছাড়া *চহার-গুলশান*-এ (১৭৫৯-৬০-এ রচিত) প্রতিটি সরকারের নির্দিষ্ট এলাকা এবং সরকারের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ঔরঙ্গজেবের আসলের পরিসংখ্যান-সারণির সঙ্গে *চহার-গুলশান*-এ প্রদত্ত তথ্য প্রায় একই। তাই বলা যায় *চহার-গুলশান*-এ অন্তর্ভুক্ত পরিসংখ্যানের সময়কাল ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ কয়েক বছর বা তার সামান্য পরবর্তীকালের।

আইন-ই-আকবরিতে জমির পরিমাণ হিসাবে যে একক ব্যবহার করা হয়েছে, তার নাম 'বিঘা-এ ইলাহী'। এই বিঘা-এ-ইলাহী হচ্ছে এক একর জমির ০.৫৯ অংশ অর্থাৎ এক একরের তিনের পাঁচ অংশ। পরবর্তীকালের পরিসংখ্যানে জমির একক হিসাবে 'বিঘা-এ-দফতরি'র উল্লেখ করা হয়েছে। 'বিঘা-এ-দফতরি' আসলে ছিল বিঘা-এ-ইলাহীর তিনভাগের দু'ভাগ। শাহজাহানের আমলে এই পদ্ধতির মাপ প্রচলিত হয়।

আরেকটি বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকমহলে মতভেদ আছে। তা হল 'জরিপ-করা-জমি' বলতে সে কালে কী বোঝাত? রাজস্ব নির্ধারণ করার জন্য মুঘল যুগে জমি জরিপের ব্যবস্থা ছিল। তবে দেশের সর্বত্র জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারিত হত না। আওরঙ্গজেবের আমলের জমির এলাকার অঙ্ক *আইন-ই-আকবরিতে* নথিভুক্ত জমির এলাকার অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। যদিও বহুসংখ্যক গ্রামকে জরিপ না-হওয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এর থেকে ইরফান হাবিব সিদ্ধান্ত করেছেন যে কি আকবরের আমলে বা কি আওরঙ্গজেবের আমলে কোনো নির্দিষ্ট প্রদেশের রাজস্ব প্রদানকারী সমস্ত জমি জরিপ করা হয়নি। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলায় গ্রাম ছিল ১,১২,৭৮৮টি। এর মধ্যে জমি জরিপ-না-হওয়া গ্রামের সংখ্যা ১,১১,২৫০টি। জরিপ হয়েছিল এমন গ্রামের সংখ্যা ১,৫৩৮টি। আর জরিপ হওয়া এলাকার পরিমাণ ছিল ৩,৩৪,৭৭৫ বিঘা। তেমনি বিহারে মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল ৫৫,৩৭৬টি। এর মধ্যে জরিপ-না-হওয়া গ্রামের সংখ্যা ২৪,০৩৬। জরিপ হওয়া গ্রামের সংখ্যা ৩১,৩৪০। আর জরিপ হওয়া এলাকার পরিমাণ ১,২৭,৫৩,১৫৬ বিঘা বা 'বিঘা-এ-দফরী'। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে মোট জমির পুরোটা জরিপ হয়নি।

মোরল্যাণ্ড মনে করেন, মুঘল আমলে এই জরিপ করা জমিই ছিল 'মোট ফসলী এলাকা' অর্থাৎ ঐটুকু জমিতেই কেবল চাষ-আবাদ হত। তার বেশি নয়। ইরফান হাবিবের মতে, 'জরিপ করা জমির' মধ্যে কেবল আবাদি জমিই ছিল না, যে জমিগুলিতে চাষ করা সম্ভব ছিল অর্থাৎ আবাদযোগ্য জমিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আওরঙ্গজেবের আমলে প্রায়ই অভিযোগ উঠতো যে, 'স্থানীয় আমলারা প্রকৃত আবাদি জমির পৃথক হিসাব না পাঠিয়ে মোট আবাদযোগ্য জমির হিসাব পাঠায়।' অর্থাৎ প্রকৃত আবাদি জমির ও আবাদযোগ্য জমির হিসাব একত্রে ধরার প্রবণতা ছিল সে আমলে। এই আবাদযোগ্য জমির মধ্যে বাসগৃহ, পুকুর, নালা, জঙ্গলও পড়ত। ঐ সব এলাকাও জরিপের মধ্যে আসতো। তবে অরণ্য বা অহল্যাভূমি নিঃসন্দেহে জরিপ হত না।

এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে ইরফান হাবিব মুঘল আমলে কৃষিজমি হিসেবে তিন শ্রেণির জমিকে চিহ্নিত করেছেন।

(১) চষা জমি বা যে জমিতে চাষ হয়।

(২) তখনকার মত পতিত জমি। (যা সে সময়ে চাষ হচ্ছে না)

(৩) পতিত জমি ছাড়া অহল্যাভূমি যা আবাদযোগ্য।

চষা জমির হিসাব থেকে কী পরিমাণ জমিতে চাষ হত তা বোঝা যায়। কিন্তু 'আবাদ যোগ্য' জমির ক্ষেত্রে কতটা চাষের জমি ছিল, তা স্পষ্ট নয়। তাই সেক্ষেত্রে প্রকৃত কৃষিজমির পরিমাণ নির্ধারণ করা দুষ্কর। এক্ষেত্রে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে মাত্র। জনবসতির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করেও কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ বা কৃষির সম্প্রসারণের চৌহদ্দি অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন ইরফান হাবিব। মুঘল আমলে জনবসতি বিন্যাসের উপর নির্ভর করেও কৃষিক্ষেত্রের পরিধি অনুধাবন করেছেন ঐতিহাসিকগণ। *আইন-ই-আকবরি*তে বাংলার কোনো এলাকাগত পরিসংখ্যান দেওয়া হয়নি। তবে আরঙ্গজেবের আমলে বাংলার মোট ১,১২,৭৮৮টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১,৫৩৮টি গ্রামের জমি জরিপ হয়েছিল। ফলে প্রকৃত কৃষি সম্প্রসারণের স্বরূপটি সম্পর্কে তেমন ধারণা করা যায় না। *চাহারগুলশন*-এর ভাষ্য অনুযায়ী জামরূপ অঞ্চলে আওরঙ্গজেবের আমলে ১০১৯২৩টি গ্রাম ছিল। অর্থাৎ ঐ পরিমাণ অঞ্চলে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হয়েছিল।

আইন-ই-আকবরি-র তথ্য ব্যবহার করে ব্লখম্যান দেখিয়েছেন যে, আকবরের আমলে বাংলায় সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চল পর্যন্ত চাষের বিস্তার ঘটেছিল। যদিও মগ দস্যুদের আক্রমণের ফলে এই ব-দ্বীপের পূর্বাংশ জনশূন্য হয়ে পড়ে। তবে ১৬৬৫তে আরাকানের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের পর বাখরগঞ্জ অঞ্চলে প্রভূত পুনর্বাসন হয় এবং কৃষিকাজ শুরু হয়। আরো পূর্ব দিকে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। চট্টগ্রামে মগ দস্যুদের বারবার আক্রমণ ঘটায় সেখানে জঙ্গলের প্রসার হয়। আর ভাওয়াল এবং সিলেট জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় সেখানে মনুষ্য বসতি কম ছিল, ১৬৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বরিশালে নতুন করে বসতির বিস্তার ঘটায় চাষ আবাদের বৃদ্ধি ঘটে। উড়িষ্যা অঞ্চল ছিল অরণ্যসংকুল। বিহারে কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ আকবরের আমলের কৃষিক্ষেত্রে আয়তনের প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে বিহারে কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল কারণ মুঘল আমলে সেখানে গঙ্গার ধার সংলগ্ন সরু ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যেই তাদের জরিপ কাজ সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ঐ সীমার বাইরে যে গ্রামগুলি ছিল সেগুলির আয়তনে এগুলির চেয়ে বড় ছিল। ফলে সেখানে অধিক আবাদ জমি থাকার কথা। সে জমির কোনো হিসাব মুঘল কাগজপত্রে নেই।

এলাহাবাদ ও অযোধ্যা ছিল বিহারের পশ্চিমাংশে। দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মুঘল সুবা। এলাহাবাদ গঙ্গার দুই তীরে প্রসারিত বিরাট জায়গা নিয়ে বিস্তৃত। গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের নিম্নাংশও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অযোধ্যা এর উত্তরে অবস্থিত। পূর্বে গণ্ডক ও পশ্চিমে গঙ্গা নদী দ্বারা আবদ্ধ। আকবরের আমলে এই দুই প্রদেশের খুব স্বল্প জমিই জরিপ করা হয়েছিল। তবে ঔরঙ্গজেবের আমলে ৪৭,৬০৭টি গ্রামের মধ্যে ৪৫,৩৪৫টি গ্রামই জরিপ হয়েছিল। অর্থাৎ এলাহাবাদের বেশিরভাগ অংশেই কৃষির প্রসার ঘটেছিল, অন্যদিকে অযোধ্যায় লোকসংখ্যা কম ছিল বলে সেখানে কৃষিরও প্রসার এলাহাবাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের আমলে অযোধ্যায় ৫২, ৬৯১টি গ্রামের মধ্যে ১৮,৮৪৯ গ্রামে কোন জমি জরিপ হয়নি। কেবলমাত্র ৩৩৮৫২টি গ্রামে জরিপ হয়েছিল।

সপ্তাদশ শতকের শেষভাগেও গোরক্ষপুরে গ্রামের সংখ্যা বেশি ছিল না। অযোধ্যার সুবাদার গোরক্ষপুর সরকারকে 'একেবারে জনহীন' বলে সনাক্ত করেছিলেন। অতএব এখানে কৃষির তেমন বিস্তার ঘটেনি। টাভার্নিয়ারের বর্ণনা

থেকে মনে হয় যে, গোরক্ষপুরের উত্তরাংশ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ।

সাগর নদী পেরিয়ে দক্ষিণে আজমগড় জেলার পূর্বাংশে টন্সনদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ছিল ঘন জঙ্গল। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত আগ্রা সুবা যমুনার দক্ষিণ পার্শে মধ্য-দোয়াব অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। ঔরঙ্গজেবের আমলে এর প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামেই জরিপ করা হয়। ৩০,১৮০টি গ্রামের মধ্যে ২৭,৩০৩টি গ্রামে জরিপ হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটে। ১৭০১-১০ সালে এই অঞ্চলে আবাদযোগ্য এলাকার যে বিবরণ আছে, মুঘল আমলে এর পরিমাণ তার ৫/৬ ভাগ ছিল। তবে এ অঞ্চলেও জঙ্গল ছিল, *তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরে* তার উল্লেখ আছে। সেই জঙ্গলে বাঘ শিকার চলত এবং অনেক সময় বিদ্রোহীরা বাঘ শিকার করত। আগ্রার উত্তরে ছিল দিল্লি। আকবরের আমলে এই অঞ্চলে যে কৃষি জমি ছিল ঔরঙ্গজেবের আমলে তার পরিমাণ তিনগুণ হয়েছিল। ৪৫০৮৮টি গ্রামের মধ্যে জরিপ হওয়া গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪৩,৫১২টি এবং বিঘার হিসাবে মোট জরিপ জমি ছিল ৬,০১,৫২, ৩৭৫ বিঘা। অর্থাৎ ষোড়শ শতকের তুলনায় সপ্তদশ শতকে দিল্লিতে কৃষির অধিক সম্প্রসারণ হয়। ইরফান হাবিবের মধ্যে সমগ্র অঞ্চলে হারত ব্যবস্থা চালু ছিল। মোরল্যাণ্ড লিখেছেন, বদায়নু, বেরেলি ও বিজনেরের মত জেলাগুলিতে ঐ সময়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ আকবরের আমলের তুলনায় দ্বিগুণ ছিল। *চাহার-গুলশান*-র বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে সপ্তদশ শতকে এসব স্থানে জনবসতি বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি কৃষি উৎপাদনেও বৈচিত্র্য এসেছিল। তবে এই অঞ্চলের উত্তরে, অধুনা শাহজাহানপুর জেলা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। নৈনিতাল অঞ্চলও কৃষি এলাকাভুক্তি ছিল না। অঞ্চলটি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তবে দুন উপত্যকায় বসতি যে ছিল তার প্রমাণ মেলে। এমনকি সেখানে কৃষকেরাও বাস করত।

পাঞ্জাবের লাহোর থেকে সিন্ধু প্রদেশের সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটে মুঘল আমলে। সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির জল এই কৃষির সহায়ক হয়েছিল। তবে ইরফান হাবিব *আইন-ই-আকবরি* ও *চাহার-গুলশান*-এর তথ্যের তুলনা করে বলেছেন যে আকবরের আমল থেকে ঔরঙ্গজেবের আমলে কৃষিকাজের বিস্তার খুব বেশি ঘটেনি। অর্থাৎ মুঘল শাসনের প্রথম দিকে লাহোরে জরিপ করা জমির কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে নি। ঔরঙ্গজেবের আমলে (আকবরের আমলের তুলনায়)। ইরফান হাবিব লিখেছেন, "লাহোর প্রদেশ এবং দীহালপুর সরকারকে একত্রে নিয়ে দেখান যায় তাদের অধীনে নথিভুক্ত এলাকা ছিল ১৯০৯-১০-এ ঐসব জেলা এবং রাজ্যগুলির আবাদযোগ্য এলাকার অর্ধেকরও কম। তবে শতদ্রু ও বিপাশা নদীতে বারংবার বন্যার ফলে মাঝে মাঝে দীহালপুরে ক্ষয়ক্ষতি হত। ফলে ঐ অঞ্চল ত্যাগ করেছিল মানুষ। সেখানে 'লখী জঙ্গল' নামে বিরাট এক আবাদশূন্য অরণ্য অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছিল। মুঘল আমলে থাট্টা, কাবুল ও কাশ্মীরে কোন জমি জরিপ হয়নি। ঐ অঞ্চলগুলির গ্রামের সংখ্যা কেবল উল্লিখিত হয়েছে মুঘল পরিসংখ্যানে। ফলে সেখানে কৃষির প্রসার কী রূপ হয়েছিল তা সঠিক বোঝা সম্ভব নয়। গুজরাটে টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। আকবরের পরবর্তীকালে তা বাতিল হয়ে যায়। ফলে সরকারি নথি যথেষ্ট নেই। তবে *মীরাৎ-ই-আহমদী* গ্রন্থে কিন্তু 'জরিপপত্রনামের' উল্লেখ আছে। আর আছে *চাহার-গুলশান*-এর তথ্য। তবে *আইন-ই-আকবরি*-তে আকবরের আমলে ঐ অঞ্চলে প্রচুর গ্রামের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ১৬২৯ সালে এক ডাচ পর্যটক, নাম জেলিনসিন লিখেছেন, গুজরাটের মোট জমির ৯০ শতাংশেই কৃষিযোগ্য জমি। তবে মোরল্যাণ্ড বা ইরফান হাবিব কেউই এ বক্তব্য গ্রাহ্য মনে করেননি। গুজরাটের প্রচুর জমি যে শাহজাহানের আমলে জঙ্গলাকীর্ণ হয়েছিল, তা লাহোরীর *পঞ্চশাহনামা* থেকে বোঝা যায়।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত মালবও খুব জনবসতি পূর্ণ অঞ্চল ছিল। সেখানে কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ঔরঙ্গজেবের আমলে আকবরের আমলের চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছিল। জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন কৃষিক্ষেত্রের প্রসার ঘটানোর প্রক্রিয়া মালবে দীর্ঘদিন ধরেই চলেছিল। অর্থাৎ এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে কৃষির প্রসার ঘটানো হয়েছিল। মালবের পার্শবর্তী অঞ্চল খান্দেশ জনবহুল ছিল। তবে সেখানে সপ্তদশ শতকে মোট গ্রামের (১৮৬৭৮) অর্ধেক সংখ্যক গ্রামে

(৬৯৩৬) জরিপ করে রাজস্ব ধার্য হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেবের আমলে বেবারের গ্রাম সব জমিই জরিপের আওতায় এসেছিল। এখানে চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মধ্যভারতের অরণ্যভূমি পরিষ্কার করে এখানে কৃষির বিস্তার হয়। মুঘল পরিসংখ্যানে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আওরাঙ্গাবাদ প্রদেশের মোট গ্রামের সংখ্যা ১৮৯১-এর সংখ্যার প্রায় সমান। জরিপ জমির সংখ্যা মোট গ্রামের ৯/১০ ভাগেরও বেশি ছিল। ফলে এখানে যে কৃষির বিস্তার ঘটেছিল তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে এছাড়া বিদর, বিজাপুর বা হায়দারাবাদের ক্ষেত্রে কৃষিজমি সংক্রান্ত কোন পরিসংখ্যান মুঘল রেকর্ডে মেলেনি। গ্রামের সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লিখিত হয়নি। ফলে ঐ অঞ্চলগুলিতে কৃষির কীরূপ প্রসার ঘটেছিল, তা সঠিক বলা সম্ভব নয়।

১৬.৩ উপসংহার

ইরফান হাবিবের মতে আকবরের আমলের পর থেকে মুঘল ভারতে চাষ-আবাদ বৃদ্ধি হয়েছে। কৃষি জমির পরিমাণও অনেক বেড়েছে সর্বত্র। যদিও একই হারে কৃষি জমির এই বৃদ্ধি সব জাগায় পরিলক্ষিত হয়নি। তিনটি অঞ্চলে এই বৃদ্ধির হয়েছে সর্বাধিক প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ। প্রথম অঞ্চল এলাহাবাদ, অযোধ্যা, বিহার ও বাংলার কিছু অংশ। দ্বিতীয় বেরার যেখানে মধ্যভারতের অরণ্য পরিষ্কার করে কৃষির বিস্তার ঘটেছিল। আর সবচেয়ে বেশি কৃষির প্রসার হয় সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে।

১৬.৪ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল আমলে কীভাবে কৃষির প্রসার ঘটেছিল?

২. মুঘল আমলে জমি জরিপ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

১৬.৫ গ্রন্থপঞ্জী

N.A.Siddiki, *Land Revenue Administration under the Mughals*

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707,* New Dilhi,1992

Sahah Chandra, *History of Medieval India*, New Delhi, 2009

John F.Richardo, *The Mughal Empire,* Combridge, 2007

Tapan Raychoudhuri and Irfan Habib (Ed.), *The Combridge Economic History of India, Vol-I, c.1200-1757.* New Delhi, 1984

Meera Bhargaua, *Exploring Medieval India, Sixteenth to Eighteenth Centuris. Vol-I. Politics, Economy. Religion,* New Delhi, 2010

ইরফান হাবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, ১৫৫৬-১৭০৭*, কলকাতা, ১৯৮৫

গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, কলকাতা, ১৯৯১

একক : ১৭ □ কৃষি-উৎপাদন

গঠন

১৭.০ **উদ্দেশ্য**

১৭.১ **ভূমিকা**

১৭.২ **কৃষিপণ্যের উৎপাদনঃ খাদ্যশস্য**

১৭.৩ **অর্থকরী ফসল**

১৭.৪ **সবজির চাষ**

১৭.৫ **বাগিচা চাষ**

১৭.৬ **রেশম চাষ, পশম উৎপাদন, গবাদি পশুপালন**

১৭.৭ **উপসংহার**

১৭.৮ **প্রশ্নাবলী**

১৭.৯ **গ্রন্থপঞ্জি**

১৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার উদ্দেশ্য হল মধ্যযুগের ভারতে বিশেষত মুঘল যুগে ভারতে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এই পাঠ থেকে নিম্নের বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে ঃ

- মুঘল যুগে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের প্রকারভেদ।
- খাদ্য শস্য ছাড়া সে সময়ে আর কী কী অর্থকরী ফসল উৎপাদিত হত।
- ভারতের অঞ্চলভেদে উৎপাদিত ফসলের রকমফের, ফসল-বৈচিত্র্য, বাগিচা চাষ কিংবা সবজি ও ফলের চাষ সম্পর্কে জানা যাবে।

১৭.১ ভূমিকা

ভারতবর্ষে প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ এবং এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। মুঘল আমল থেকে অদ্যাবধি এই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড কৃষি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষির প্রসারের সাথে সাথে নতুন ধরনের কৃষিজ ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। শুধু তাই নয় কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিও মানুষ মনোযোগী হয়ে ওঠে। সেই ধারা পরবর্তীকালে যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থাকে। মুঘল আমলেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সেকালে সরকারি কৃষিনীতির দুটি পরস্পরবিরোধী সমান্তরাল নীতি অনুসরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সরকার কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে কৃষক সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করে, অন্যদিকে অতিরিক্ত রাজস্বের জন্য তাদের উপর পীড়ন করে। স্থানীয় প্রশাসন কৃষকদের উপর উদ্বৃত্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্যাতন করলেও সরকারি নীরবতা বা প্রশাসনিক উদাসীনতা ছিল আশ্চর্যজনক। এতদসত্ত্বেও

গোটা মুঘল যুগ ধরে প্রতিটি সুবাতেই কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি উৎপাদনও সময়ের সাথে সাথে বর্ধিত হয়।

১৭.২ কৃষিপণ্যের উৎপাদনঃ খাদ্যশস্য

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ভারতবর্ষে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্পপণ্যের সাথে সাথে কৃষিপণ্যেও সমান গুরুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। মধ্যযুগে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ভারতীয় কৃষকদের কৃষি উৎপাদনে পরিবর্তনশীলতার প্রতি আগ্রহ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। *তুজুক-ই-বাবরি*-তে তিনি লিখেছেন ভারতবর্ষের কৃষি জমির প্রাচুর্য কৃষকদের নতুন নতুন ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতীয় কৃষি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্যের পাশাপাশি অর্থকরী ফসল উৎপাদনে ভারতীয় কৃষকদের দক্ষতা ছিল ঈর্ষণীয়। সমকালে উৎপাদিত প্রধান খাদ্যশস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধান, গম, জোয়ার। বাৎসরিক ৪০ বা ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের সমবর্ষণরেখা ছিল এই দুই এলাকার সীমানা। আসাম উপত্যাকা, বাংলা, উড়িষ্যা, পূর্ব উপকূল, তামিল ভূখণ্ড এবং পশ্চিম উপকূলের সামান্য অংশ আর কাশ্মীরে ধান চাষ হতো। বিহার, এলাহাবাদ, অযোধ্যা এবং খান্দেশের কিছু কিছু এলাকায়ও ধান উৎপন্ন হত। গুজরাটের দক্ষিণ উপকূলবর্তী অঞ্চলে ধানের চাষ হত। মীরাৎ-এ লেখা হয়েছে যে গুজরাট অঞ্চলে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ববর্তী আমলের চেয়ে ধান চাষের অনেক উন্নতি ঘটেছিল। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শুষ্ক এলাকায় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সিন্ধু ও তার শাখা নদীগুলির পলিবিধৌত অঞ্চলে ধান চাষের চল ছিল। লাহোরে উৎকৃষ্ঠ মানের ধান পাওয়া যেত।

গম চাষ হতো ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে। তার মধ্যে বাংলাদেশেও ছিল। যদিও এখানকার গম খুব উঁচু মানের ছিল না। বার্লি উৎপন্ন হতো ভারতের মধ্যাঞ্চলে ও গুজরাটে। কিন্তু বাংলায় বার্লির উৎপাদন তেমন হত না। আবার কর্ণাটক অঞ্চল, তামিলনাড়ু, কাশ্মীরে বার্লির উৎপাদন একেবারেই হত না। ভারতের পশ্চিমে দীপালপুর অঞ্চলে জোয়ার ছিল প্রধান খরিফ শস্য। আর রবি শস্য হিসেবে চাষ হত গমের। আজমীর, গুজরাট এবং খান্দেশে ধান-গমের চেয়ে জোয়ার, বাজরাই বেশি উৎপন্ন হত। অবশ্য মালব ও সৌরাষ্ট্রের সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য ছিল না। মুঘল আমলে বিভিন্ন প্রকার ডাল উৎপন্ন হত। *আইন-ই-আকবরি*-তে ডালের তালিকা দেওয়া হয়েছে। দু'ধরনের ডাল- কাবুলি এবং হিন্দি। মসুর, মটর, মুগ, উরদ, লোবিয়া ও কুলৎ ইত্যাদি ডাল উৎপন্ন হত। লক্ষণীয় যে এই তালিকায় অড়হড় ডালের উল্লেখ নেই কিন্তু অন্যান্য সূত্রে অড়হড় ডাল চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৭.৩ অর্থকরী ফসল

মুঘল নথিপত্রে জিনস-এ-কামিল ও জিনস-এ-আলা নামের এই দুটো শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হলো মূলত বিক্রির জন্য উৎপন্ন উঁচু জাতের ফসল অর্থাৎ আধুনিক অর্থে অর্থকরী ফসল বলতে যা বোঝায় তা-ই। সে আমলে দুটি প্রধান অর্থকরী ফসল হল তুলো ও আখ। তুলো উৎপন্ন হতো দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে। বিশেষ করে খান্দেশে। অবশ্য গোটা উত্তর ভারত জুড়েই তুলো চাষ হতো মুঘল আমলে। এমনকি তৎকালীন বাংলার অন্যতম প্রধান ফসল ছিল কার্পাস। অধুনা বাংলাদেশের মেঘনা নদীর মোহনা অঞ্চলে তিতাবাদি, বাজিতপুর প্রভৃতি অঞ্চলে উৎকৃষ্টমানের কার্পাস চাষ হত। মুঘল আমলে সম্ভবত আখের উৎপাদন হতো অনেক বেশি। পরিমাণগত দিক থেকে ও গুণগতমানের হিসেবে বাংলার চিনি উৎপাদনের খ্যাতি ছিল।

গোটা ভারতে এলাহাবাদ থেকে মুলতানে প্রায় সব প্রদেশেই নানান নানান ধরনের তৈলবীজ উৎপন্ন হত। গুজরাটে সম্ভবত রেড়ি-র চাষ হত। মসিনার চাষ হত তিসি অর্থাৎ তিসির তেল উৎপাদনের জন্য। যদিও এর থেকে সুতাও তৈরি হত। তন্তু উৎপাদক ফসল হিসাবে পাটের চেয়ে শণের চাষই বেশি হত। জাবতি প্রদেশগুলির প্রায় সবগুলিতেই এর চাষ দেখা যেত। বাংলায় অবশ্য পাটের চাষ হত কেবল স্থানীয় বাজারের জন্য।

রঞ্জনকারী পদার্থ হিসেবে নীলের গুরুত্ব ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে সর্বাধিক সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের নীলের চাষ হতো আগ্রার সন্নিকটস্থ বায়ানায় আর একটু নিচু মানের নীলের উৎপাদন হত দোয়াব, খুরজা ও কোইল বা আলিগড়ে বা আলিগড়ের সন্নিকটস্থ অঞ্চলে। সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত সেহওয়ানের নীলকে নানা দিক দিয়ে এর চেয়েও ভাল বলে গণ্য করা হত। বাংলাদেশ থেকে খান্দেশ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে নীল চাষ হত তা এর চেয়ে নিম্নমানের ছিল। দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা অঞ্চলেও নীলের চাষ হত। নীলের চাষ লাভজনক ছিল যে দু'বছরে তিনবার কাটার জন্য শীষগুলি মাঠেই রাখা থাকতো। সমসাময়িক তথ্যসূত্রগুলোতে এর বর্ণনা পাওয়া যায়। নীল সম্ভবত একমাত্র ফসল যার ফলন সম্পর্কে সমসাময়িককালের আনুমানিক হিসেবে পাওয়া যায়। যদিও স্বাভাবিক কারণেই ঋতুর প্রতিকুলতা বা আনুকুল্য অনুযায়ী বছর বছর উৎপাদনের হেরফের ঘটত। মুঘল সাম্রাজ্যের তিনটি প্রধান নীল উৎপাদক অঞ্চল ছিল বায়ানা-দোয়াব-মেওয়াট, সরখেজ, সেহওয়ান। যে বছর প্রকৃতই অনুকুল থাকত সে বছর এই অঞ্চলে নীলের উৎপাদন ১৮ লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত হত। এই হিসাবের মধ্যে গুজরাটের কিছু অংশ (সরখেজ বাদে) খান্দেশ বিহার ইত্যাদি যেসব অঞ্চলে আনুমানিক হিসেবের কোন নথি নেই,-এর মধ্যে তাদের ধরা হয়নি।

মুঘল আমলে নেশার সামগ্রী হিসাবে আফিম এবং গাঁজার চাষ প্রভূত পরিমাণে হত প্রায় সর্বত্রই। কিন্তু বিশেষ করে মালব ও বিহারে এর উৎপাদন ছিল সর্বাধিক। সিদ্ধি বা ভাঙ্গের চাষ হতো বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে। যদিও আওরঙ্গজেব এই চাষ পুরোপুরি বন্ধ করার নির্দেশ জারি করেছিলেন।

সতেরো শতক থেকে শস্যের ধরনের যেসব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে তামাক চাষের সূচনা ও দ্রুত প্রসার তার অন্যতম। *আইন-ই-আকবরি*-তে কোথাও তামাক চাষের উল্লেখ নেই কিন্তু বইটি সংকলিত হওয়ার প্রায় দশ বছরের মধ্যেই মক্কা ফেরত হজযাত্রী মুঘল দরবারে তামাক নামের এই বস্তুটির সংবাদ নিয়ে এসেছিল। বিজাপুর থেকে ফিরে আসাদ বেগ আকবরকে একটি চমৎকার সুগঠিত হুকা উপহার দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তামাকের ব্যবহার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গোটা মুঘল ভারতে জাহাঙ্গির এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো কাজ হয়নি। শাহজাহানের আমলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের গৃহে সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে তামাককেও স্থান দিয়েছিল। মানুচি লিখেছেন, মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণে তামাক সেবন করতেন। সুজন রায় আক্ষেপ করে লিখেছিলেন যে, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলকেই তামাক স্পর্শ করেছিল। তিনি আরো লিখেছেন যে, গোড়ায় ফিরিঙ্গিরা ইউরোপ থেকে তামাক নিয়ে আসতো। পরে চাষিরা এর চাষ শুরু করলে তামাকের উৎপাদন আর সব ফসলকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তামাক উৎপাদনে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল জাহাঙ্গিরের আমলে। ১৬১৭সালের মধ্যে সুরাটের আশেপাশের গ্রামগুলোতে প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হত। টেরী বলেছেন, এই সময় পর্যাপ্ত তামাক চাষ হত এবং অল্পদিনের মধ্যেই তামাকের চাষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সতেরো শতকের মধ্যভাগে সম্বল ও বিহারের মতো এলাকাতেও তামাক চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজস্ব বিষয়ক পুস্তিকায় সম্ভ্রান্ত সমাজের পানীয় হিসেবে কফি বেশ সম্মান অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। কফির আমদানি হতো আরব ভূখন্ড ও আবিসিনিয়া থেকে। মোখা বন্দর থেকে জাহাজে পাড়ি দিয়ে কফি ভারত ভূখণ্ড পৌঁছাত। যদিও ভারতের জল-হাওয়ায় তখনও কফি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি তবুও দক্ষিণ ভারতের কফি চাষ শুরু হয়েছিল। মহারাষ্ট্রে কফি উৎপন্ন হত। সারা ভারত জুড়ে মুঘল আমলে পানের চাষ হতো। জাফরান কেবল উৎপন্ন হত কাশ্মীরে।

১৭.৪ সবজির চাষ

সেকালে সবজির চাষ হতো প্রভূত পরিমাণে। শহরের চাহিদা মেটাবার জন্য সংলগ্ন ছোট ছোট জমিতে সবজি চাষ করার উৎসাহ লক্ষ্য করা যেত। মালি নামের এক জাতের লোক শুধু এই কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। রাঙা আলু, বা সাধারণ আলুর প্রচলন বা উৎপাদন মুঘল আমলে ছিল না। তবে বিভিন্ন ধরনের খাম আলুর কথা জানা যায়। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন স্থানে এবং সম্ভবত উত্তর ভারতীয়দের এটি ছিল লোকের প্রিয় খাদ্য। টমেটোর চাষ তখনও এদেশে প্রচলিত হয়নি। যে সমস্ত সবজি চাষ এখন হয় মুঘল আমলেও মোটের উপর তাই হত। উৎপাদনের এই বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য ইউরোপীয় পর্যটকদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। টেরি, পেলসার্ট, মানুচি, পিটার মাণ্ডি, ফ্রায়ার প্রমূখ সকলেই ভারতীয় সবজির প্রশংসা করেছেন।

১৭.৫ বাগিচা চাষ

ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুঘল আমলে যে বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায় তা অভূতপূর্ব। জঙ্গলে যে বুনোফল হতো তা গরিব মানুষের আহার্য ছিল। কৃষকেরা ঋতুভেদে কোন কোন ফলের চাষ করতেন তবে কিছু ভাল জাতের ফল সাধারণত সযত্নে সারিবদ্ধ ভাবে বাগানে লাগানো হত। চাষিদের বাগান থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাগানের মালিক হতেন ধনী ব্যক্তিরা। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা বণিক শ্রেণির লোকেদের ফলের বাগান ছিল। তারা নিজেরা ফল খাওয়ার পাশাপাশি মুনাফার জন্য তা বিক্রি করতেন। মুসলমান হলে অনেকেই এই সব ফলের বাগানে কবর তৈরি করতেন। বাগানে থেকেই তাদের বংশধরেরা বা কবরের পাহারাদারদের ভরণপোষণ চালানো হতো। বিদেশ থেকে ইউরোপীয়দের, বিশেষত পর্তুগীজদের হাত ঘুরে ভারতবর্ষে অনেক ফলের আমদানি ঘটেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হল আনারস। অতি দ্রুত এটি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সূচনায় এর চাষ হতো কেবল পর্তুগিজ অধিকৃত ভারতের পশ্চিম উপকূলে। কিন্তু ষোল শতকের শেষ দিকে বাংলা, গুজরাট ও বগলানাতে এর চাষ এত বিপুল পরিমাণে শুরু হয় যে আনারস এসব অঞ্চলের প্রধান উৎপাদনের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে। আবুল ফজলের বর্ণনায় ভারতের ফলের মধ্যে আনারসকে অন্যতম প্রধান ফল হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে। জাহাঙ্গিরের আমলে আগ্রার বাদশাহি বাগান থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার আনারস সংগ্রহ করা হতো। পেঁপে ও কাজুবাদামও আমদানি করা হয়েছিল বিদেশ থেকে। কিন্তু এদের প্রচলন হতে আরও দীর্ঘ সময় লেগে গিয়েছিল। দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব বাগানে প্রায় সব ধরনের ফল ফলানোর জন্য প্রচুর চেষ্টা করতেন। বাবরের সময় মধ্য এশিয়ার ফল উৎপাদনের চেষ্টা হয়েছিল ভারতের বাগানে। আকবরের আমলে দাবি করা হয়েছিল যে আগ্রার চারপাশের জমিতে তুরাণ ও ইরানের মতই তরমুজ ও আঙ্গুর উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু এই সাফল্য রাজকীয় বাগানগুলোর পরিসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক সময়ই এইসব বাগান পরিচর্যার দায়িত্বের জন্য নিযুক্ত হতেন মধ্য এশিয়া থেকে আগত মালিরা। সেই সাথে সাথে ক্রমাগত বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো বীজ। আকবরের আগে কাশ্মীরে চেরী হত না কিন্তু তার সময় মহম্মদ কুলি আফসার কাবুল থেকে এই গাছটির কলম সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন। এই পদ্ধতিতে প্রচুর খোবানি হতে শুরু করে। আগে এর খুব অল্প গাছই ভারতে ছিল। মুঘল যুগে সম্ভবত মর্যাদার খাতিরেই রাজকীয় বাগানে কলম করার রীতি সীমাবদ্ধ ছিল। শাহজাহান আইন করে সাধারণ এবং অসাধারণ সবার জন্যই কলম করার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল। কোলা ও নারঙ্গী জাতের কমলালেবুর মান এই পদ্ধতির দ্বারা খুব উন্নত হয়েছিল। আমের ক্ষেত্রেও

এই রীতি প্রয়োগ করা হয় তবে কলম করার এই কায়দা সত্যি কতটা নতুন আর কতটা প্রাচীন রীতি অনুসরণ করা হতো তা বলা শক্ত। বার্নিয়ের বক্তব্য থেকে মনে হয় যে কাশ্মীরের ১৭ শতকের ষাটের দশকে এই পদ্ধতি আদৌ কাজে লাগানো হতো না। নতুবা হলেও তা খুব অযত্নে। কলমের পদ্ধতি প্রথম প্রয়োগ করা হয়েছিল কাশ্মীরে।

১৭.৬ রেশম চাষ, পশম উৎপাদন, গবাদি পশুপালন

মুঘল আমলে সবচেয়ে বেশি রেশম উৎপন্ন হতো বাংলায়। আসাম, কাশ্মীর এবং পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে রেশমগুটির চাষ হতো। রেশমের উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে একমাত্র টাভার্নিয়ের লেখা থেকে একটা আনুমানিক হিসেব পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন কেবল বাংলার কাশিমবাজার থেকেই ২২০০০ গাঁট রেশমের যোগান হত। তার মতে, এক গাট মানে ১০০ লিভর। তবে এত রেশম উৎপন্ন হত কিনা তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে।

লাক্ষা শিল্প মুঘল যুগের গুরুত্বপূর্ণ পেশা। এছাড়া চাষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবাদি পশু পালনও কৃষি ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। মানরিখ বাংলার মত জনবহুল প্রদেশে বিরাট পশুপাল ও তাদের চারণভূমি দেখেছিলেন। গ্রাম অঞ্চলে এ দৃশ্য দেখা যেত। এছাড়া অন্যান্য সমকালীন পর্যটকরাও ভারতের নানান জায়গায় বিরাট সংখ্যক গবাদিপশুর কথা বলেছেন। আবুল ফজলের লেখা থেকে জানা যায় চারটে বলদ দুটো গরু আর একটা মোষের জন্য কোন কর লাগত না। তবুও যদি সত্য হয় তবে সমকালে কৃষকদের কাছে অনেক গরু-মহিষ থাকতো বলে মনে করা হয়। ঘিয়ের পর্যাপ্ত উৎপাদন ছিল। এর থেকে বোঝা যায় কৃষকদের গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল অনেক। বাংলায় এত মাখন হত যে তারা স্থানীয় চাহিদা পূরণ করেও রপ্তানি করা হত। *আইন-ই-আকবরি* থেকে জানা যায় মাখনের দাম গমের চেয়ে প্রায় আট গুণ বেশি ছিল।

মুঘল আমলে এছাড়া পশম উৎপন্ন হত। তবে ভারতীয় ভেড়ার থেকে উৎপাদিত পণ্যের মান ইউরোপীয় পর্যটকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এখানকার পশম ছিল মোটা। কেবল কম্বল বানানোর জন্য উপযুক্ত। কাশ্মীরের বিখ্যাত শাল তৈরি হতো। তার জন্য ছাগলের লোম ব্যবহার করা হত। এর জন্য পশম আসত লাদাখ তিব্বত অঞ্চল থেকে।

মাথাপিছু গবাদি পশুর সংখ্যা যেহেতু বেশি ছিল তাই গোবরের অভাব ছিল না। কৃষকেরা প্রচুর পরিমাণে গোবর সার কৃষিকার্যে ব্যবহার করতেন। যেহেতু জঙ্গলের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি তাই বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা দিয়েই জ্বালানির কাজ চালানো হতো। গোবর সার হিসাবে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। তবুও আগ্রা প্রদেশের নতুন ঘনবসতি পূর্ণ অঞ্চলগুলিতে মানুষ কাঠের অভাবে জ্বালানি হিসেবে ঘুটে পোড়াতেন, জানিয়েছেন পেলসার্ট।

১৭.৭ উপসংহার

ভারতবর্ষের সেচ ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। জলসেচের সুবিধা সর্বত্র উপলব্ধ ছিল না। এর পাশাপাশি কখনও অতিবৃষ্টি আবার কখনও অনাবৃষ্টি জনিত কারণে শস্যহানি ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল। তৎসত্ত্বেও কৃষি ব্যবস্থায় শাসকবর্গের উদাসীনতাকে উপেক্ষা করে ভারতীয় কৃষক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল। এক ভূমি থেকে পলায়ন করে অন্য ভূমিতে আশ্রয় নিয়ে নতুন করে উৎপাদন শুরু করার মধ্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখত তারা। তৎসত্ত্বেও কৃষির অভূতপূর্ব উৎপাদন সাধারণ মানুষের স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন প্রক্রিয়াকে বহুলাংশে চিরঅব্যাহত রেখেছিল।

১৭.৮ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল আমলে কী ধরণের খাদ্যশস্য ও বাণিজ্য শস্য উৎপাদিত হত?

২. মুঘল যুগের কৃষিকাজ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

১৭.৯ গ্রন্থপঞ্জি

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India, 1550-1707,* OUP, 1799

Tapam Raycaudhury and Irfan Habib, *The Cambridge Economic History of India, Vol. I, c. 1200 -1750,* OUP, 1982.

অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* ১২০০-১৭৫৭, কলকাতা, ২০০৮

জগদীশ নারায়ণ সরকার, *মুঘল অর্থনীতি, সংগঠন ও কার্যক্রম*

একক : ১৮ □ শস্যের ধরন

গঠন

১৮.০ **উদ্দেশ্য**

১৮.১ **ভূমিকা**

১৮.২ **খাদ্য শস্য ও বাণিজ্য শস্য**

১৮.৩ **বিদেশাগত শস্য**

১৮.৪ **উদ্যান চাষ**

১৮.৫ **উপসংহার**

১৮.৬ **প্রশ্নাবলী**

১৮.৭ **গ্রন্থপঞ্জি**

১৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার উদ্দেশ্য হল মুঘল যুগের উৎপাদিত ফসলের ধরন সম্পর্কে ধারনা লাভ করা। এই একক পাঠ করলে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারব ঃ

- কী ধরণের ফসল উৎপন্ন হত
- বিদেশাগত ফসলের চাষ কী হত

১৮.১ ভূমিকা

মধ্যযুগে ভারতে খাদ্য শস্য উৎপাদনের সাথে সাথে অর্থকরী ফসল যেমন উৎপাদিত হত, তেমনি বাগিচা চাষও হত। আবার যেখানে জল ও সেচের সহজ লভ্যতা ছিল সেখানে ধান, গম, ডালের চাষ হত, তেমনি স্বল্প জলের অঞ্চলে চাষ হত জোয়ার, বজরা, রাগী ইত্যাদির। অঞ্চলভেদেও আবার উৎপাদিত ফসলের ভিন্নতা চোখে পড়ে। গুজারাট, মহারাষ্ট্রে যেমন কার্পাস উৎপন্ন হত, তেমনি বাংলাতেও হত। কাশ্মীরে আবার জাফরান ও পশম যেমন উৎপাদিত হত, তেমনি মালাবার অঞ্চলে গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি মসলা উৎপন্ন হত। এক এক অঞ্চল এক এক ধরণের ফসলের উৎপাদনে বিখ্যাত ছিল।

১৮.২ খাদ্য শস্য ও বাণিজ্য শস্য

মুঘল আমলে ভারতীয় কৃষকেরা যেমন বিভিন্ন ধান, গম, তিল সর্ষে, ডাল, যব, বজরা, রাগী, তিল প্রভৃতি বহু ধরনের শস্য উৎপন্ন করত, তেমনি সেই সাথে নতুন নতুন ফসল চাষেও তারা উৎসাহ ছিল। বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্যের

উৎপাদন নির্ভর করত কৃষকের আর্থিক সামর্থের ওপর। অর্থকারী ফসল, যেমন তুলা আখ নীল, পান, আফিম ইত্যাদি চাষের জন্য বারবার জমি চষা ও জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য ছিল। এজন্য গবাদিপশুর ব্যবস্থা করা, কূপ খনন করার জন্য বা চিনি তৈরির জন্য চুল্লি নির্মাণ, নীল তৈরির জন্য চৌবাচ্চা নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য প্রচুর অর্থের দরকার ছিল। বড় চাষি বা ছোট জমিদার ছাড়া এত সব কাজ করা সম্ভব ছিল না। এই সব পণ্য চাষ করলে অন্যান্য খাদ্য শস্যের তুলনায় অনেক বেশি লাভ হতো। তাছাড়া ওইসব জমিতে রাজস্বের হারও ছিল খুব বেশি যা সমস্ত চাষীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

১৮.৩ বিদেশাগত শস্য

মুঘল আমলে এদেশে কিছু বিদেশাগত শস্য চাষের প্রচলন হয়। এদের একটি অর্থকরী ফসল অন্যটি খাদ্যশস্য। দুটোই নতুন বিশ্ব বা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছিল। প্রথমটি তামাক এবং দ্বিতীয়টি ভুট্টা। এর মধ্যে অস্বাভাবিক দ্রুততায় তামাক চাষের প্রসার ঘটেছিল। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের অব্যবহিত পরেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে তামাক চাষ শুরু হয় আর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই প্রায় গোটা মুঘল সাম্রাজ্য জুড়ে তামাকের উৎপাদন শুরু হয়। দীর্ঘকাল এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে উনবিংশ শতকে ভারতে ভুট্টার চাষ শুরু হয়, কিন্তু অধুনা গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে সপ্তদশ শতকে মহারাষ্ট্রের ভুট্টার চাষ হত। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব রাজস্থানে রাজস্ব প্রদানের জন্য অন্যান্য ফসলের সঙ্গে ভুট্টাও হাজির করা হতো। তখন একে মাকাই নামে অভিহিত করা হত। একই রকম ভাবে বাংলায় পঞ্চদশ শতকে রেশমের চাষ হতো না। কিন্তু সপ্তদশ শতকে এর চাষ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বের অন্যতম রেশম উৎপাদক অঞ্চলের পরিণত হয় বঙ্গভূমি।

১৮.৪ উদ্যান পালন

মুঘল আমলে উদ্যান পালন বা হর্টিকালচার বিদ্যা বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। অভিজাত ও বিত্তশালী মানুষদের উৎসাহে বিভিন্ন বাগান তৈরি করা হতো। তাছাড়া কলমের মাধ্যমে চারা গাছ তৈরির বিদ্যা এই বাগান তৈরি প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করে করেছিল। এক্ষেত্রে বিদেশিদের ভূমিকা ছিল। যেমন পর্তুগীজরা বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্ট আমের কলম তৈরি ও আম উৎপাদনে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিল। আলফানসো তাদেরই হাতে তৈরি। শুধু আম-ই নয়, বিদেশিদের হাত ধরে আরও অনেক নতুন ফলের আমদানি হয়েছিল মুঘল যুগে। যেমন আনারস, পেঁপে, কাজুবাদাম, পেয়ারা। সেকালে যেমন একাধারে এসব বাগিচা চাষ হতো তেমনি চাষিরা অর্থকরী ফসলও উৎপাদনও নিজেদের নিয়োজিত করত। যেমন নীল,রেশম ইত্যাদি। উত্তর ভারতের সন্নিকটে এবং আলিগড়ের সন্নিকটস্থ অঞ্চল ও দোয়াব অঞ্চলে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নীল উৎপাদিত হত।

১৮.৫ উপসংহার

এইভাবে খাদ্যশস্যের পাশাপাশি বাণিজ্যিক শস্য এবং বাগিচা চাষের বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ কৃষকেরা মূলত খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলেও ধনী কৃষকেরা বাগিচা চাষ এবং বাণিজ্যিক শস্য চাষের উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। শস্যের এই রকমফের মুঘল কৃষি ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৮.৬ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল আমলে কী ধরণের ফসল উৎপন্ন হত?

২. মুঘল আমলে উদ্যান পালন সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

N.A. Siddiki, *Land Revenue Administration under the Mughals, 1700-1750.* Delhi, 1989

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India.1556-1707.* OUP, 1999

Tapam Raycaudhury and Irfan Habib, *The Cambridge Economic History of India, Vol. I, c.1200-1750.* CUP, 1982

গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ,* কলকাতা, ১৯৮৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* ১২০০-১৭৫৭, কলকাতা, ২০০৮

জগদীশ নারায়ণ সরকার, *মুঘল অর্থনীতি, সংগঠন ও কার্যক্রম*

একক : ১৯ □ বাণিজ্য পথ ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ধরন

গঠন

১৯.০ উদ্দেশ্য

১৯.১ ভূমিকা

১৯.২ বাণিজ্য পথ

১৯.৩ দক্ষিণ ভারতের বাজার ও বাণিজ্য পথ

১৯.৪ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ধরন

১৯.৫ উপসংহার

১৯.৬ প্রশ্নাবলী

১৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৯.০ উদ্দেশ্য

এই পাঠের উদ্দেশ্য হল:

- মুঘল যুগের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
- বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কীভাবে বাণিজ্যিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল তা জানা।
- সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথ সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১৯.১ ভূমিকা

মুঘল আমলে কৃষির বিস্তার ঘটেছিল। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। মুঘলরা দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করায় এর ফলে এক স্থানের পণ্য নিয়ে অন্য স্থানে যাতায়াত সুবিধা হয়। পরিণামে বাণিজ্য পুষ্ট হয়। মুঘল আমলের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য। এই উভয় প্রকার বাণিজ্যই আবার জলপথ ও স্থলপথে পরিচালিত হত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের আবার দুটো ধরন আছে এক) স্থানীয় বাণিজ্য ও দুই) দূরপাল্লার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। স্থানীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল হাট বা মাণ্ডি। এই সব হাটে গ্রামের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি হত। আবার এই হাট ছিল অন্তঃর্দেশীয় বাণিজ্যের পণ্য সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র। বড় ব্যাপারী বা গোলদারের মাধ্যমে হাটের পণ্য দূরের বড় বাণিজ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হত। আগ্রা, দিল্লি, লাহোর, ফতেপুর সিক্রি, ঔরাঙ্গবাদ, ঢাকা প্রভৃতি বড় শহরে এরূপ বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্র থাকতো। সপ্তদশ শতকের সবচেয়ে বড় শহর ছিল আগ্রা। আবার লাহোরও খুব জনবহুল শহর ছিল। মনসেরেট লাহোরকে এশিয়া ও ইউরোপের সেরা শহর বলে গণ্য করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের সূচনায় জোরিয়াত নামক পর্যটক লাহোরকে কনস্ট্যান্টিনোপলের সাথে তুলনা করেছিলেন। লাহোর উত্তর-পশ্চিম ভারতের বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। শহরগুলির বৃহৎ আকার ও প্রচুর লোক সংখ্যা বৃহৎ শহর গড়ে

ওঠার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। ফলে শহরের বাজারে কেনাবেচার পরিমাণও অনেক বেশি ছিল। গ্রামীণ বাজারে শিল্পী-কারিগর শ্রেণির মানুষ নিজেরাই নিজেদের পণ্য-সামগ্রী নিয়ে হাজির হত। তবে শহরের বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে তার উপায় ছিল না। সেখানে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যে নিযুক্ত করত। তবে গ্রামীণ বা শহুরে বাজারে উৎপাদক শ্রেণির অংশগ্রহণ কতখানি ছিল তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, এ প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব দু'টি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : এক, যেহেতু চাষি বা উৎপাদক মহাজনের কাছ থেকে দাদন নিয়ে চাষ করত, তাই অপেক্ষাকৃত কম দামে উৎপাদিত ফসল সে মহাজানের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য ছিল। এই মহাজন বা দাদনদাতাই উৎপাদিত শস্য বাজারে নিয়ে যেত। দ্বিতীয়ত, উৎপাদক উৎপাদিত শস্যের বা পণ্যের একাংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমা দিত। জায়গিরদার বা তার গোমস্তা ঐ সব দ্রব্য বাজারে বিক্রি করত। আর এভাবে গ্রাম বা শহর সর্বত্র বাজারগুলোতে পাইকারী ব্যবসায়ীদের আধিপত্য ছিল।

১৯.২ বাণিজ্য পথ

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিবহন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক কালে রেল ব্যবস্থার প্রসার দূরকে নিকট করেছে। পণ্য পরিবহনকে করেছে সহজ। কিন্তু মুঘলযুগে তা সম্ভব ছিল না। স্থলপথে উট, মহিষ বা বলদ বা ঘোড়ায়টানা গাড়িতে করে পণ্য পরিবহন চলত আর ছিল নৌ-পথে। খাদ্য শস্য, চিনি, মাখন, নুন, ইত্যাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকত 'বানজারা' শ্রেণির লোকেরা। এই ব্যবসায়ে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। ভারবাহী বিরাট বিরাট বলদের পাল নিয়ে এরা পথ চলত। বানজারারা ছিল যাযাবর। পুরো পরিবার নিয়ে বাস করত 'টাণ্ডা' বা তাবুতে। বড় এক টাণ্ডায় ৬০০-৭০০ লোক ও ১২০০০-১৫০০০ বলদ থাকত। অনেকসময় ২০০০০ বলদও থাকতো। বানজারারা প্রয়োজনে এক লক্ষ বা তারও বেশি বলদ জোগাড় করতে পারত। এই ধরণের পরিবহনের খরচ ছিল অনেক কম। তবে এই পরিবহন ব্যবস্থার গতি শ্লথ ছিল।

এছাড়া নদীপথে পণ্য পরিবহন চলত আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে। এই পদ্ধতিতে পরিবহন ব্যয় ছিল অপেক্ষাকৃত কম। বাংলা, সিন্ধু, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে বেশিরভাগ পণ্য পরিবহন হত এই পথে, ৩০০-৫০০ টনের বৃহদাকার বজরা নৌপথে যমুনা ও গঙ্গার জলপথে আগ্রা থেকে পাটনা হয়ে বাংলায় আসতো। বর্ষার সময় এদের অভিমুখ হতে নীচের দিকে। আর অন্য সময় আবার উপরের দিকে ফিরে যেত বজরাগুলি। ছোট ছোট নৌকায় লাহোর মুলতান থেকে থাট্টায় পণ্য পরিবহন চলত। আগ্রা থেকে প্রতি বছর ১০,০০০ টন নুন যেত বাংলায়। পরিবহনের জন্য নৌকা ব্যবহৃত হত। সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় জাহাজের আক্রমণের শিকার হত এই সব নৌকাগুলি। পণ্য পরিবহনের জন্য যা খরচ হত, দ্রব্যমূল্যের ওপর তার প্রভাব পড়তো। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে এক মন পণ্য উটের পিঠে করে আগ্রা থেকে সুরাটে নিয়ে যেতে যা খরচ পড়তো, তা ছিল ঐ ওজনের গমের দামের প্রায় চারগুণ। সাদা চিনির দামের অর্ধেক। আবার নদী পরিবহনের খরচ পড়তো অপেক্ষাকৃত কম। যেমন, ১৬৩৯ সালে মুলতান থেকে থাট্টায় নৌকায় পণ্য পরিবহন করতে খরচ পড়তো গমের দামের দ্বিগুণ, আর সাদা চিনির দামের ১/৬ অংশ। পণ্য পরিবহনের এই ব্যয় ব্যবসার ওপর প্রভাব ফেলতো। পরিবহন ব্যয় ছাড়াও বাণিজ্য শুল্কও পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ভূমিকা নিত। তবে অনেক সময় মুঘল সম্রাটরা অনেক অভ্যন্তরীণ শুল্ক রদ করতেন। যেমন, আকবর ও তার উত্তরাধিকারীরা 'বাজ', 'তমা' বা 'জাবাৎ' ইত্যাদি শুল্কগুলি পুরোপুরি অথবা আংশিক রহিত করেন। তবে বড় বাজার বা বন্দরগুলিতে পণ্য সরবরাহের উপর মোট পণ্যমূল্যের ২ শতাংশ হারে শুল্ক দিতে হত। আবার কোথাও কোথাও এই হারের তারতম্য ঘটত। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের জন্য এই শুল্কের হার বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করেছিলেন তবে মুসলমানদের জন্য ২ শতাংশই

রেখেছিলেন। খাদ্যশস্যও এই শুল্কের আওতায় পড়তো। এছাড়া ছিল বিভিন্ন প্রকার 'রাহারী' বা শুল্ক। যাতায়াতের পথঘাট যারা নিয়ন্ত্রণ করতেন, বা যে সব কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতো, তারাই এই সব 'রাহারী' আদায় করত। অষ্টাদশ শতকে মুঘল কেন্দ্রীয়শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে এই রাহারী আদায়ের প্রবণতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তবে বিভিন্ন সময়ে বাদশাহি ফরমানগুলিতে সাধারণ মানুষের খাদ্যশস্য ও ভোগ্যসামগ্রীকে শুল্ক রেহাই দেবার কথা বলা হয়েছে।

পণ্য পরিবহনের নিরাপত্তার জন্য মুঘল রাষ্ট্রশক্তি সচেতন ছিল। তৎসত্ত্বেও 'বানজারা'-রা সর্বদা সশস্ত্র থাকতো। তাদের কাফিলা, সরাই, টাণ্ডা এবং নদীতে বজরার বহর এমনভাবে সুসংগঠিতভাবে থাকতো যাতে কেউ লুঠপাঠ না চালাতে পারে বা রাহাজানি হলে তার মোকাবিলা করতে পারতো। রাস্তাঘাটের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল মুঘল প্রশাসনের। তাছাড়া মুঘল সাম্রাজ্যের এক সুপ্রতিষ্ঠিত আইন ছিল যে, যদি কোনো পদস্থ রাজকর্মচারীর এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় কোনো চুরি বা ডাকাতি ঘটে, তবে হয় তিনি ঐ চোরাইমলা উদ্ধার করবেন নতুবা নিজেই ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। আইনের এই বাধ্যবাধকতার ফলে রাজকর্মচারীরা এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি নিত এবং সন্দেহজনক গ্রামগুলিতে লুণ্ঠন চালাতো। অবশ্য নিরাপত্তার এহেন ব্যবস্থা কেবল সমভূমি অঞ্চল বা যে অঞ্চলে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে বলবৎ ছিল, সেখানে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু যেখানে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ শিথিল ছিল যেমন মরুপ্রান্তর, গিরিপথ অঞ্চল বা জনবসতিহীন অঞ্চলে, সেখানে ডাকাত বা বিদ্রোহীরা বণিকদের ওপর হামলা চালালে তাদের 'খেসারত' বা 'উপঢৌকন' দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হত। রাজপুতনার পথে এ ঘটনা প্রায়শই ঘটত। সাধারণভাবে বলা যায়, মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে 'কাফিলা'র বাণিজ্য স্বাভাবিক অবস্থায় নিরাপদ ছিল। তবে নিঃসঙ্গ পথিকের ক্ষেত্রে পথে যা-ই ঘটুক না কেন, উল্লিখিত বিষয়গুলি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করত।

পণ্যের মূল্য অন্যান্য সুবা-র তুলনায় বাংলায় অনেক কম ছিল। বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনায় (বাউরি, লিনস্কোটেন প্রমুখ) সে কথা বারাবর উল্লিখিত হয়েছে। ১৬৫০ খ্রি: এক ইংরেজ কুঠিয়াল লিখেছেন, "মোম, গোলমরিচ, গন্ধক, চাল, মাখন, তেল এবং গম পাওয়া যেত হুগলীতে অন্যান্য জায়গার থেকে প্রায় অর্ধেক দামে। এইখানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত, যার একটা অংশ রপ্তানি হত ও বাংলার বাইরে পাঠানো হত। এখানকার চাল, চিনি, মাখন উপকূলের নৌপথে করমণ্ডল হয়ে কেরল পর্যন্ত যেত। জাহাজে করে চিনি প্রেরিত হত গুজরাটে। এমনকি পারস্য পর্যন্ত। আর আফিম রপ্তানি হত কেরলে। কখনও কখনও বাংলা থেকে দক্ষিণভারত ও পর্তুগীজ অধ্যুষিত অঞ্চলে যেত। করমণ্ডলের বিভিন্ন বন্দরে ওড়িষা থেকে যেত মাখন ও লাক্ষা, আর চাল। পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলায় আসতো সুতো এবং তামাক। গঙ্গার জলধারা বেয়ে বাংলার চাল ও রেশম রপ্তানি হত পাটনায়। এর বিনিময়ে সেখান থেকে আসতো গম, চিনি, আফিম।

আগ্রা ও বাংলার মধ্যে নদীপথে বাণিজ্য চলত পাটনা হয়ে। বাংলা ও পাটনা থেকে আগ্রায় যেত চাল, গম, মাখন, কাঁচা রেশম, চিনি। বদলে বাংলায় আসতো তুলো, নুন, আফিম। আগ্রা থেকে আবার বাংলার এই রেশম যেত গুজরাটে। তবে আগ্রা নীলের জন্য বিখ্যাত ছিল। পৃথিবীর সেরা নীল উৎপাদিত হত আগ্রার কাছে বায়ানাতে। অভ্যন্তরীণ বাজার ছাড়াও আগ্রার নীলের আন্তর্জাতিক বাজার ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বিক্রির জন্য আগ্রার নীল যেত লাহোরের বাজারে। সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমাতো। সিরহিন্দের উৎকৃষ্টমানের চালের আমদানি হত লাহোর বাজারে। লাহোর ও মুলতান থেকে চিনি ও আদা নৌপথে যেত থাট্টায়। সেখান থেকে লাহোরে আসতো মরিচ আর খেজুর। থাট্টায় নদীপথে মাখন আসতো ভাক্কার থেকে। সেহওয়ান থেকে নদী পথে বসরায় নীল আমদানি হত। এই নীল সুরাট হয়ে বিদেশে রপ্তানী হত।

কাশ্মীর থেকে আগ্রা ও ভারতের অন্যত্র জাফরান রপ্তানী হত। আবার নেপাল থেকেও পাটনার বাজারে জাফরানের আমদানি হত। কাশ্মীরে যে সব পণ্য নিয়ে যাওয়া হত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নুন, মরিচ, আফিম, তুলো, সুতো ইত্যাদি।

পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যে গুজরাটের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মালব ও আজমীর থেকে গুজরাট আমদানি করত গম, দক্ষিণ ভারত থেকে চাল। মালাবারের গোলমরিচ ও নারকেল নৌপথে গুজরাটে আসতো। আর গুজরাট থেকে অন্যত্র যেত তুলো। সুরাট থেকে বুরহানপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তুলোর চাষ হত। এই তুলো বাংলায়, কেরলে যেত। আবার পারস্য ও লোহিত সাগরীয় বন্দরগুলিতেও পাঠানো হত। এছাড়া গুজরাটে নীল উৎপন্ন হত। বিদেশের বাজারে, ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে এর চাহিদা ছিল। গুজরাটে যে আফিম রপ্তানি হত তার বেশিরভাগটাই আসতো মালব থেকে। গোলমরিচের ব্যবসা চালাবার জন্য ওলান্দাজরা আফিম কিনত বুরহানপুর থেকে।

পশ্চিম উপকূলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক পণ্য ছিল মরিচ। গুজরাট ও মালাবার অঞ্চলের মধ্যে যে বাণিজ্য চলতো তার প্রধান পণ্য ছিল এই মরিচ। মালাবারের মরিচের বিনিময়ে গুজরাট থেকে যেত তুলো ও আফিম। সতেরো শতকের ষাটের দশকে ওলন্দাজরা এই তিনটি পণ্যের ওপর একচেটিয়া বাণিজ্য করায়ত্ত করে এবং মালাবার অঞ্চলে আফিম ও সুরাটে মরিচের দাম অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেয়।

কোনো কোনো অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন বাণিজ্যের সমৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং কৃষকেরা সেই পণ্যের বাণিজ্যিক সাফল্যের উপরই নির্ভরশীল ছিল। যেমন বায়ানা ও সরখেজের কৃষকরা সেখানকার উৎপাদিত নীলের বাণিজ্যের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। ঠিক একই রকমভাবে কাশ্মীরের কৃষক জাফরানের বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করতেন।

১৯.৩ দক্ষিণ ভারতের বাজার ও বাণিজ্য পথ

দক্ষিণ ভারতের বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে বার্টন স্টেইন লিখেছেন, পেন্টাই বা পতনম অর্থাৎ স্থায়ী বাজার ছাড়াও অসংখ্য সনতাই বা সাময়িক হাট ও মেলা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে সজীব রেখেছিল। জনসংখ্যা সেখানে বেশি ছিল, এই বাজারের সংখ্যা সেখানে স্বভাবতই বেশি ছিল। যেমন দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণাটকে সপ্তদশ শতকের গোড়ায় নরসিপুর, বিক্কানায়কনহালি, বাসবপতনমএ হস্তি, চিকবল্লাপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব বাণিজ্যকেন্দ্রের বিকাশ হয়েছিল শ্রীরঙ্গপত্তনম ও মহীশূরের উত্থানের কারণে। কৃষ্ণা-গোদাবরী উপত্যকাতেও এরূপ অনেক বাজার গড়ে উঠেছিল। এইসব বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাগুলভাঞ্চা, পলাকল্লু, গোন্দেয়ারাম। এইসব শহরগুলি ছিল কারিগর ও বণিকশ্রেণির বাসস্থান। এই অঞ্চল আবার সুতিবস্ত্র বয়নের জন্যও বিখ্যাত ছিল। দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণা-গোদাবরী উপত্যকা ও কাবেরী ব-দ্বীপ এলাকায় সুতিবস্ত্রের উৎপাদন হত। এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নদীপথে ও সড়কপথে এ অঞ্চলে বাণিজ্য চলত। গোলকুণ্ডার সঙ্গে সুরাটের পণ্য বিনিময় হত সড়কপথে। দক্ষিণ ভারতের উপকূলের সঙ্গে অভ্যন্তরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে পর্বতসঙ্কুল অনেক স্থান থাকায় বলদের গাড়িতে পণ্য পরিবহন অনেকসময় অসম্ভব ছিল। সেক্ষেত্রে 'কাবড়ি' বা বাঁশের বাকে করে পণ্য পরিবহন চলত।

দক্ষিণ ভারতের প্রধান বাণিজ্যপথগুলি:

বিজয়নগর ও ভাটকলের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সড়ক, পেনুভাল্ডা ও চন্দ্রগিরি হয়ে বিজয়নগর থেকে পুলিকট পর্যন্ত বিস্তৃত, বাঁকাপুর হয়ে গোয়া থেকে বিজয়নগর, বিজয়নগর থেকে রায়চুড় ও কোবাইকেণ্ডা হয়ে গোলকুণ্ডা

এবং অপর একটি পথ বিজয়নগর থেকে উদয়গিরি হয়ে কেণ্ডাপল্লি। এভাবে বিজয়নগরের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এছাড়া মালবার থেকে তাওহাভুর ও তামিলনাড়ুর কায়মকুল্লম ও মাদুরাইয়ের মধ্যে সংযোগকারী সড়ক দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ষোড়শ শতকে উপকূলের বন্দরের বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এ সময় দাভোল গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হয়ে ওঠে। চাউল ও দাভোল বন্দর থেকে একটি সড়ক গুলবর্গা ও হায়দারাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনকি বিজয়ওয়াড়ার মধ্য দিয়ে পথটি মসুলিপত্তন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। হায়দারাবাদের সঙ্গে গোয়া ও বিজাপুরের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। সুরাট যাবার জন্য হায়দারাবাদ থেকে দুটি পথ ছিল একটি বুরহানপুর হয়ে ও অন্যটি দৌলতাবাদ হয়ে। সপ্তদশ শতকে অনেক বিদেশি পর্যটক এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, গোলকুণ্ডা থেকে দৌলতাবাদ হয়ে সুরাট যেতে সময় লাগতো ২৮ দিন। আবার ঐ একই জায়গা থেকে মসুলিপত্তনম যেতে লাগতো ৭ দিন। আর বিজাপুর থেকে ৯ দিন। আর গোয়া থেকে ১৭ দিন। ভুললে চলবে না সে সময় যাতায়াত হত বলদের গাড়িতে। মুঘল আমলে গোলকুণ্ডা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খুব বড় হয়ে উঠেছিল। সুরাট, দাভোল, গোয়া বা বুরহানপুরের বণিকরা নিয়মিত এই শহরে যাতায়াত করতো। হীরা বেচা-কেনার বড় কেন্দ্র ছিল এই শহর। গোলকুণ্ডার সন্নিকটস্থ উদয়গিরি ছিল সেকালে ভারতের একমাত্র হীরার খনি। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ভারতের অন্ধ্রের উপকূল অঞ্চলে সুতিবস্ত্রের বাণিজ্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সে সময়ে মসুলিপত্তনম থেকে কাপড় যেমন সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যেত, তেমনি স্থলপথে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে মধ্য এশিয়ায় যেত। আবার গোদাবরী উপত্যকার নাগুলভাঞ্চা ও কুডাপ্পা থেকে ঐ একই পথ ধরে নীলও যেত পারস্যে।

দক্ষিণ ভারতের আরও দুটি বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র হল শ্রীরঙ্গপত্তনম ও মহীশূর। নীল ও সুতি বস্ত্রের বৃহৎ বাজার ছিল বিজয়ওয়াড়া। দক্ষিণকেন্দ্রে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে তিরুমালার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় ঐ অঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। তিরুমালাকে কেন্দ্র করে সোনারূপার ব্যবসা গড়ে ওঠে।

উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্যপথের তুলনা করলে দেখা যায় যে উত্তর-ভারতে গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধুর নদীপথকে ব্যবহার করে যে বাণিজ্যিক যোগ গড়ে উঠেছিল মুঘল আমলে, দক্ষিণ ভারতে নদীপথ তেমনভাবে ব্যবহৃত হয়নি। পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপথে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে পণ্য প্রেরণের সাথে সাথে উপকূলবর্তী অঞ্চলে নদীপথও ব্যবহৃত হত। তবে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উপস্থিতি পূর্ব উপকূলের সঙ্গে পশ্চিম উপকূলের নৌপথে যোগাযোগের অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। এ কারণে সেখানে পণ্য পরিবহনে সড়কপথের অধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

১৯.৪ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ধরন

মুঘল যুগের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের দু'টি দিক ছিল। একদিকে আন্তঃবাণিজ্য আর অন্যদিকে বৈদেশিক বাণিজ্য। এই বৈদেশিক বাণিজ্য দু'ভাবে পরিচালিত হত। একদিকে স্থল বাণিজ্য যা সড়ক পথে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়ে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আর অন্য বাণিজ্যিক ধারাটি ভারত মহাসাগরীয় জলপথে পশ্চিমে আরব সাগর, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর বা পূর্ব আফ্রিকা এবং পূর্ব দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ ও দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল গোটা ভারত জুড়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মুঘল যুগে অধিকাংশ ভারতীয়র বাসস্থান ছিল গ্রামে আর প্রয়োজনীয় পণ্যের অধিকাংশ তারা নিজেরাই উৎপন্ন করতেন বা স্থানীয়ভাবে আশে-পাশের অঞ্চল থেকে লাভ করতেন। বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল এবং বিনিময়ের মাধ্যমে যে সমস্ত পণ্যসামগ্রী আদান-প্রদান হত তার পরিমাণ কম ছিল না। এই বিনিময় হত গ্রামে

'হাট' বা 'মান্ডি'তে। মান্ডি হাটের চেয়েও বড় ছিল। জ্যাঁ ব্যাপটিস্ট টাভার্নিয়ের ছিলেন এক ফরাসি মণিমুক্তো ব্যবসায়ী ও পর্যটক, যিনি ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন এক ভ্রমণ-বৃত্তান্তের রচনাকারী হিসাবে। 'লে সিস ভয়েজেস দ্য জ্যাঁ ব্যাপ্টস্ট ট্যাভার্নিয়ের' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, মুঘল আমলের ছোট ছোট গ্রামেও হাট ও মান্ডি জাতীয় বাজার ছিল। এ সমস্ত বাজারসমূহে বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র বেচাকেনা হত। সমকালীন মঙ্গলকাব্য সমূহে, বিশেষত চন্ডীমঙ্গলে তার সমর্থন মেলে। তবে খাদ্যদ্রব্যের ও অন্যান্য সামগ্রীর মূলত চাহিদা ছিল শহরে। তাই শহরগুলির বাজার বৃহৎ ও পণ্য সামগ্রীও ছিল বিচিত্র।

প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে মুঘল যুগে বেশ কিছু বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল যেমন আগ্রা, দিল্লি, ফতেপুরসিক্রি, ঢাকা, ঔরঙ্গাবাদ প্রভৃতি। শহরগুলিতে গড়ে উঠেছিল বাজার। এরমধ্যে আগ্রা সর্বভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া প্রাদেশিক রাজধানীগুলি আঞ্চলিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হয়েছিল। দূরবর্তী গ্রাম থেকে শহরে জলপথ ও স্থলপথে পণ্য সামগ্রী আনা হতো। এর মধ্যে যেমন ছিল কৃষিপণ্য ছিল তেমনি ছিল কুটির শিল্পজাত পণ্য। দূরপাল্লার বাণিজ্যেও আবার শিল্পপণ্যের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। বাংলা ও ওড়িষ্যার খাদ্যশস্য রপ্তানি হতো ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। এছাড়া কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য কিছু বাজার গড়ে উঠেছিল। যেমন বেলগাও গোয়া মুল্যবান রত্ন বাজার হিসাবে বিখ্যাত ছিল। দূর-দূরান্তের ব্যবসায়ীরা এসব পণ্য নিয়ে আসতেন। মনে রাখতে হবে সে যুগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক যেমন দূরপাল্লার বাণিজ্যের অগ্রগতি ঘটেছিল তেমনি আঞ্চলিক বাণিজ্যেরও বিকাশ হয়েছিল। উভয় শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ছিল। অনেকে একাধারে দূরপাল্লা ও স্থানীয় বাণিজ্য অংশগ্রহণ করত। এসব বণিকদের নিজস্ব সামাজিক সংগঠনও ছিল। যেমন হিন্দুদের মুসলমানদের জামাত বা পারসিকদের পঞ্চায়েত। এসব সংগঠনের নিজস্ব কিছু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল। ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে সাহায্যও করত।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সেকালে নানান বণিক গোষ্ঠির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিখ ধর্মাবলম্বী লোহানা ও ক্ষত্রিরা, অন্ধ্রে কোমতি, তামিলনাড়ুতে চেট্টিয়ার, গুজরাটে খোজা, মেনন, বোহরা, পূর্ব ভারতে রাজস্থানী বানিয়া এবং পশ্চিম ভারতের পারসিকরা। তাছাড়া শৈব দশনামি, গোঁসাইরা ও বানজারা নামের ভ্রাম্যমান বণিকদের দল। প্রশ্ন হল কীভাবে এরা বাণিজ্য করতো ? বিশেষ বিশেষ ঋতুতে নিজেদের জাত-ভাই বা গোষ্ঠীর লোকেদের মাধ্যমে প্রাদেশিক উৎপাদকদের কাছ থেকে জিনিস কিনে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করত। অনেক সময় নিজেদের গোষ্ঠীর লোক এদের মাধ্যমে একস্থান থেকে পণ্য ক্রয় করে অন্যত্র বিক্রি করতো। প্রাথমিক উৎপাদন বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি এদের কোন যোগাযোগ ছিল না। সাধারণত নগদ লেনদেন চলত। শহরের বাসিন্দা এইসব ব্যবসায়ীরা দালালের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতো বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত সংগঠনের ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেও দূরদূরান্তে তা প্রেরণ করত। কেউবা আবার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ফেরিওয়ালার মতো ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করত। আঞ্চলিক ও ভ্রাম্যমাণ বণিকদের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল। দূরপাল্লার বণিকরা পণ্য সংগ্রহ করত ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যারা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিশেষ পণ্যের ব্যবসা করত।

স্থানীয় স্তরের এইসব বণিকদের নানান স্তরভেদে ছিল। সর্বোচ্চ স্তরে ছিল বড় বড় গোলাদাররা। বৃহৎ শহর বা তার আশপাশের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে ছিল তাদের ঘাঁটি। এই শ্রেণির ব্যবসায়ীদের আবার পণ্য সরবরাহ করতো পাইকার অথবা দালাল শ্রেণির ছোট ছোট সংগ্রহকারী বণিকরা। এই শ্রেণির বণিকদের আবার বিশেষীকরণ ঘটত। অর্থাৎ একটি পণ্য নিয়ে একজন দালাল বা পাইকার ব্যবসা করত। এই পাইকাররা উৎপাদকদের কাছ থেকে নগদ

অর্থে বা অগ্রিম দাদনের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করত। গোটা মুঘল যুগেই এই পদ্ধতিতে বাণিজ্য চলত।

খাদ্যশস্যের ব্যাপারীদের আবার শ্রেণিবিভাগ ছিল - বলদিয়া ও গোলাদার। যারা হাটে কৃষকদের কাছ থেকে ধান চাল ক্রয় করে বলদের গাড়িতে করে গোলাদারদের কাছে নিয়ে যেত বিক্রি করতে তাদের বলা হত বলদিয়া। এদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন ছিল তাদের বলা হতো কুলজিওয়ালা। এরা ৫০০ থেকে ৬০০ বলদের মালিক ছিল। এই ব্যবস্থার অন্যদিকে ছিল গৃহস্ত ব্যাপারীরা যাদের অনেকেই ছিল সম্পন্ন চাষি। ১০০ থেকে ১০০০ টাকা পুঁজি দিয়ে গ্রাম থেকে এরা ধান চাল শস্য সংগ্রহ করে বলদিয়া ব্যাপারির কাছে বিক্রি করতো বা হাটে নিয়ে যেত। সাধারণত এরা রায়তদের ও ফসল কাটার সময় ধান সংগ্রহ করত। অন্যান্য পণ্যের বেলায়ও যেমন ক্ষেত্রে একইভাবে দানের মাধ্যমে পণ্য কেনা-বেচা চলত। গৃহে উৎপন্ন পণ্যসমূহ প্রাথমিক উৎপাদকের কাছ থেকে পাইকাররা সংগ্রহ করে হাটে নিয়ে আসতো। দাদন নেবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদক বা কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। আবার কৃষকদের মধ্যেই একশ্রেণির সম্পন্ন ব্যক্তিরা ছিল যারা এই ব্যবস্থার ফলে লাভবান হয়েছিল। বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে উৎপাদকদের সংযোগ ঘটতো এদের মাধ্যমেই।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'মহাজন' শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। তবে এরা পৃথক কোন শ্রেণি হিসেবে আবির্ভূত হয়নি। অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বণিকরা নিজেদের বাণিজ্যের পাশাপাশি সুদের বিনিময়ে টাকা ঋণ দিত। এদের মধ্যে আবার স্তর ভেদ ছিল। বড় বড় মহাজনরা সাধারণত বড় ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিত। প্রয়োজন হলে মুঘল রাজপুরুষেরা ও জমিদার শ্রেণি তাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করত। বিশেষত রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে এবং যুদ্ধের সময় অর্থের প্রয়োজন হলে। কখনো আবার এই মহাজনরা রাজস্ব আদায়ের ইজারাও নিত। টাঁকশালের নিয়ন্ত্রণও এদের হাতে চলে যেত। বিদেশি বণিকেরা বাণিজ্যব্যপদেশে এদেশে এলে যে সোনা- রূপা (বুলিয়ন) নিয়ে আসতো তা তাদের দিলে, তারা তা মুদ্রায় রূপান্তরিত করে দিত। যারা এই ধরনের কাজ করতেন তাদের বলা হত শরাফ। সুরাট শহরে এই ধরনের শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যারা চড়াদামে মূল্যবান ধাতুর বদলে টাকা থেকে মুদ্রা প্রস্তুত করে দিত। পূর্ব ভারতে মহাজনদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল বাংলার জগৎ শেঠ। সপ্তদশ শতকে হীরানন্দ শাহ রাজস্থান থেকে বিহারের আসেন এবং রাজা মানসিংহের মহাজন-এ পরিণত হন। তার পুত্র মানিকচাঁদ পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি খাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন ও রাজনৈতিক ক্ষমতাও কুক্ষিগত করেন। তিনি জগৎশেঠ উপাধি পান। জগৎ শেঠের মহাজনি কারবার ভারতব্যাপী পরিব্যাপ্ত ছিল। বাংলার নবাবরা এদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিল্লিতে বার্ষিক রাজস্ব প্রেরণ করতেন।

এসব বৃহৎ মহাজন ছাড়া ছিল ছোট ছোট মহাজন এবং সকল শ্রেণি বিশেষত পশ্চিম ভারতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় স্থানীয় স্তরে ব্যবসায়ী জমিদার শিল্পী কারিগরদের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে এই শ্রেণির মানুষেরা। বিনিময়ে চড়া হারে সুদ আদায় করতেন। সুদের কারবার ছাড়া অনেক সময় এইসব মহাজন শ্রেণি স্থানীয় বাণিজ্যে অংশ নিত। ঘটনা হল মুঘল আমলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এসব ছোট-বড় শ্রেণির মহাজনদের বিশিষ্ট স্থান ছিল। বণিক কারিগররা তো বটেই রাজপুরুষেরা এদের উপর অর্থের জন্য নির্ভর করত। ফলে এই শ্রেণির লোকেরা রাজনৈতিক ক্ষমতাও করায়ত্ত করেছিল।

স্থলপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীন তিব্বত মধ্য এশিয়া পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলত। লাহোর, কান্দাহার, হিরাট, কাবুল,প্রভৃতি ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সমুদ্র উপকূল বরাবর নদীপথে অধিকাংশ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হত।

উত্তর ভারতের প্রধান বাণিজ্যিক নৌপথ গঙ্গা নদী বেয়ে চলতো। এই পথেই যুক্ত ছিল এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা ও রাজমহল। রাজমহলের প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্র আদান-প্রদান গঙ্গার উপনদী ও শাখানদী পথে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদী পথে বাণিজ্য চলত লাহোর, সিন্ধুর মোহনার বন্দরগুলোর মধ্যে দিয়ে। মুলতান ও সিন্ধুর মধ্যে সংযোগকারী খাল ছিল। সপ্তদশ শতকে ওই খাল মজে যাওয়ায় মুলতান থেকে সুরাট স্থলপথে বাণিজ্য চলত। একটি বাণিজ্যপথ আগ্রা ও পাটনাকে যুক্ত করেছিল। অন্য একই পথ মেদিনীপুর কাশিমবাজার রাজমহল পাটনা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সাথে যুক্ত ছিল আগ্রা। আগ্রা থেকে দিল্লি লাহোর কাবুল কান্দাহার পর্যন্ত যেত। গুজরাটের বন্দরগুলির সাথে উত্তর ভারতের বাণিজ্যিক-যোগ ছিল মুলত দুটি পথে। একটি পথ সুরাট থেকে পশ্চিম রাজস্থান হয়ে আগ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটি যেত আজমীর মেরতা, যোধপুর, জালোর, আহমেদাবাদ, খাম্বাজ, বারোচ হয়ে। দ্বিতীয় পথ মালওয়া, খান্দেশের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত ছিল। এই পথটি সরাসরি পূর্বদিকে প্রসারিত হয়েছিল। এটি গোয়ালিয়র, সিরোঞ্জ, উজ্জয়িনী, মাণ্ডু ও বুরহানপুর হয়ে যেত। রাজস্থানের সঙ্গে গুজরাটের শহরগুলি একাধিক সড়কপথে যুক্ত ছিল। তবে প্রধান পথ দুটির একটি মেবার ও অন্যটি মাড়োয়ার হয়ে গুজরাটে পৌঁছত।

কোঙ্কন ও করমণ্ডল উপকূলের বন্দরগুলি ও বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র একদিকে সড়কপথে ও অন্যদিকে জলপথে যুক্ত ছিল। সুরাট থেকে দক্ষিণ-পূর্বে আওরঙ্গবাদ পর্যন্ত একটি পথ ছিল। আবার আওরঙ্গবাদ থেকে অন্য একটি পথ অন্তি, গোলকুণ্ডা হয়ে অন্ধ্রের মসলিপত্তনম পর্যন্ত পৌঁছতো। গোলকুণ্ডা ও গোয়ার মধ্যে অনুরূপ আরেকটি পথ ছিল। চেন্নাইয়ের সঙ্গেও গোলকুণ্ডা এই পথ দ্বারা যুক্ত ছিল। দাভোল-গোয়া পথের সাথে গোয়া-বিজাপুর রাস্তা যুক্ত ছিল। মসলিপত্তনম থেকে রাস্তা নেল্লোর হয়ে পালিয়াকোট্টা পৌঁছানো যেত। উপকূলের ধার ঘেঁষে এই পথ এগিয়েছিলে। প্রধান রাস্তাগুলিকে যুক্ত করেছিল শাখা রাস্তাগুলিকে। গ্রাম ও আধা শহরগুলির মধ্যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। জাতীয় বাজার গড়ে না উঠলেও ভারতের সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

বাণিজ্য পথগুলো প্রমাণ করে যে উত্তর ভারত বাংলা রাজস্থান গুজরাট মালব এবং পূর্ব ও পশ্চিম দাক্ষিণাত্য নিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় বাজার গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণে উপকূল বরাবর অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল। সামগ্রিকভাবে কার্যকলাপের ভিত্তিতে ও বাণিজ্যের পরিমাণ এর ভিত্তিতে ভারতীয় বণিকদের কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে। বড় বড় অন্তর্দেশীয় বাজার ও মন্দিরগুলিতে অবস্থান করতো প্রভূত ধনী বণিক সম্রাটরা। যেমন সুরাটের আব্দুল গফুর মূলত দূরপাল্লার অন্তর্দেশীয় সমুদ্রবাণিজ্যে অংশ নিত। এদের অনেকের একাধিক জাহাজ ছিল। এই শ্রেণির নিচে ছিল স্বাধীন শ্রেণি যারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূলধনী অন্তর্দেশীয় সমুদ্র বাণিজ্যে অংশ নিত। পরবর্তী স্তরে ছিল নানান ধরনের আঞ্চলিক ব্যবসায়ী ও আড়তদার। আর একেবারে নিচে ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ী ও দালাল শ্রেণির মত পণ্য সংগ্রহকারীর দল। আর তার নিচে থাকত গ্রাম অঞ্চলের ব্যাপারীরা যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল সম্পন্ন কৃষক।

তপন রায়চৌধুরী বলেছেন বড় বড় বণিকদের পাশাপাশি ছোট ছোট সাধারণ ব্যবসায়ীরাও যে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতো তার কারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্বল্প মূলধনের প্রয়োজনীয়তা। তবে বৃহৎ এর পাশে ক্ষুদ্রের এই সহাবস্থানের পশ্চাতে ছিল প্রতিটি স্তরের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যা কোন নির্দিষ্ট স্তরের বণিকের পক্ষে-ই এড়ানো সম্ভব ছিল না। কেননা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে কারোর সংযোগ ছিল না। প্রাথমিক উৎপাদকের পণ্য মধ্যবর্তী স্তরের বণিকের হাত ঘুরে তবেই তা পৌঁছতে উপরতলার ব্যবসায়ীর কাছে। কখনো নগদ মূল্যের, কখনো অগ্রিম

দাদনের মাধ্যমে এই সব পণ্য সংগ্রহ করা হতো। প্রাথমিক উৎপাদকের হাতে মূলধনের অপ্রতুলতা ও উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করার বণিকদের স্বাভাবিক প্রবণতা এই প্রথাকে স্থায়িত্ব দান করেছিল।

অনেক ঐতিহাসিক মুঘল আমলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কারিগর শ্রেণির সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মোটামুটি চার ধরনের সম্পর্ক এক্ষেত্রে গড়ে উঠেছিল। কারিগররা কখনো নিজের উপর নির্ভর করে পণ্য উৎপাদন করতেন এবং নিজের ইচ্ছাতেই হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতেন পাইকারদের কাছে। এই পাইকার শ্রেণি ওই পণ্য অন্যত্র নিয়ে যেত। আবার ব্যবসায়ীরা কখনো হস্তশিল্পীদের টাকা অগ্রিম দিত। সেই টাকা নিয়ে কাঁচামাল কিনে পণ্য উৎপাদন করে সেই ব্যবসায়ীর কাছে তাকে যা বিক্রি করতে হতো পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে। এছাড়া অনেক সময় ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল সরবরাহ করতো হস্তশিল্পীদের এবং পরিবর্তে পণ্যসামগ্রীর পুরোটা বা আংশিক সংগ্রহ করত। কারিগররা কেবল মজুরি পেত। তবে কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে হস্তশিল্পীদের নিয়োগ করে উৎপাদন করা হতো। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা যৌথ মূলধন বিনিয়োগ করে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন পরিচালনা করত। তবে এই ব্যবস্থা কচ্চিৎ দেখা যেত। রাজকীয় কারখানায় এইভাবে কারিগরদের নিযুক্ত করে পণ্য উৎপাদন করা হতো। তবে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন কারখানা বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কারণ বাজারের সঙ্গে এই উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো সংযোগ ছিল না। রাজকীয় এই কারখানায় কেবল রাজপুরুষের পছন্দসই সামগ্রীই উৎপন্ন হত। স্বাধীন শিল্পীদের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ছিল মুঘল উৎপাদন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। তেমনি স্বনির্ভর কৃষকের উৎপাদনই ছিল কৃষি অর্থনীতির গোড়ার কথা। গোষ্ঠী বা বাণিজ্যিক মূলধন মুঘল আমলের ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

তপন রায়চৌধুরীর মতে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চাহিদা থাকলেও দেশীয় চাহিদা ছিল স্থিতিশীল। যার দরুন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাংগঠনিক বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনার তাগিদ কখনো অনুভূত হয়নি সেকালে। অনেকে অনুমান করেছেন যে মুঘল আমলে চাহিদার সঙ্গে যোগানের সামঞ্জস্য বজায় ছিল। এ ছাড়াও অসংখ্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর অবস্থিতির কারণে মূলধন বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে থেকেছে, একত্রিত হয়ে তা ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। পরিণামে, মুঘল আমলে বাণিজ্যিক মূলধন উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। কেবল কেনাবেচার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই তা আবদ্ধ থেকেছে। গৌতম ভদ্র *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ* গ্রন্থে জানিয়েছেন, উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তনে ভারতীয় বণিকদের অনীহার পেছনে এক ধরণের সামাজিক কারণ ছিল। ভারতীয় বণিক ও প্রাথমিক উৎপাদকদের মধ্যে নানান স্তরভেদ ছিল। দালাল ও পাইকার এই ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী ছিল। তাদের মাধ্যমেই প্রাথমিক উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করা হত। ফলে কেন্দ্রীভূত মূলধন কখনোই প্রাথমিক উৎপাদকদের সংহত করেনি। বিরাট মূলধন দালাল ও পাইকারদের মাধ্যমে আলাদা হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে দাদনের মাধ্যমে হস্তশিল্পীদের কাছে পৌঁছাত। ফলে মূলধন আকারে ক্ষুদ্র থেকে গিয়েছিল, হস্তশিল্পীরাও তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের মাধ্যমেই উৎপাদন অব্যাহত রেখেছিল। ঢাকার অবস্থাপন্ন তাঁতীরা পাঁচ-ছটা করে তাঁত রাখত এবং তাদের আওতায় জোগানদার ও কারিগররা কাজ করত। কিন্তু তার চেয়ে বৃহদায়তন উৎপাদন — সংগঠন গড়ে ওঠেনি। দাদনি ব্যবস্থা ও বিপুল পরিমাণ মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর অবস্থানের দরুণ মূলধন বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে থেকেছে, তার চাপে উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাত্রা ক্ষুদ্রায়তনই থেকে গেছে, তার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেনি। বস্তুত মূলধনের আয়তন বা তার পরিমাণ বৃদ্ধি উৎপাদন কাঠামোর রূপান্তর ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ঠ ছিল না। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সেখানে মূলধনের সামাজিক ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মূলধনের মালিকরা উৎপাদন ব্যবস্থা বদলানোর জন্য কোনো সামাজিক তাগিদ অনুভব করেন না। বরং এই জাতীয়

মূলধনের বৃদ্ধি আরো অনেক বেশি করে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে, এবং পুরানো কাঠামোকেই জোরদার করে।

বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি মুঘল রাষ্ট্রের মনোভাবে এ প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন। এই যুগে ভারতের বৃহৎ ভূখণ্ডে যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল তা বাণিজ্যের পথকে সুগম করেছিল ঠিকই, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তবুও বাণিজ্যের প্রতি মুঘল সরকারের তেমন নজর ছিল না। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়ে শাসকবর্গ তেমন মাথা ঘামাতেন না। তাদের দৃষ্টি ছিল কৃষির ওপর। বণিকদের ওপর করভার কৃষকদের তুলনায় ছিল কম। কৃষকদের যেখানে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসেবে দিতে হত সেখানে বণিকদের শতকরা ২.৫ বা ৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হতো। এর সঙ্গে কোনো কোনো স্থানে বাড়তি হিসেবে স্থানীয় জমিদাররা 'রাহাদারি' কর আদায় করতেন। বা কখনো কিছু অন্তর্শুল্ক বা উৎকোচ প্রদান করতে হতো। ব্যবসা-বাণিজ্যে মুঘল রাষ্ট্রের তেমন উৎসাহ ছিল না। তবে মাঝে মধ্যে সরকারি কোষাগার থেকে বণিকরা ঋণ পেতেন। শাহজাহানের আমলে এভাবে অনেককে ঋণ দেওয়া হতো। তবে এসব ছিল বিক্ষিপ্ত ঘটনা। প্রকৃত ঘটনা হল ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন না হলেও এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নীতি ছিল না তাদের। সমুদ্র বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন ছিলেন না। বন্দরগুলির সমৃদ্ধি কামনা করলেও সেই সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য তাদের কোনো উদ্যম ছিল না। স্থানীয় শাসক তার ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েই তারা নিশ্চিন্ত থাকতেন। তবে এটাও ঠিক যে মুঘলরা অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটাতো। বিশেষত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব জাহাজও ছিল। অনেকগুলি জাহাজের মালিক ছিলেন রাজপুরুষেরা। মীর জুমলার নিজের অনেকগুলি জাহাজ ছিল। কখনো আবার সম্রাট নিজেই এই বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ নিতেন। মুঘল রাজপুরুষেরা ব্যবসা করলে অনেক সময় তাদের একচেটিয়া অধিকার খাটাতে চাইছেন বলে সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হত। যেমন শাহজাহান বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকা লগ্নি করেছিলেন আমেদাবাদ থেকে কাপড় কিনে পাঠাবার জন্য। তাঁর কাজ শেষ করার আগে ওই অঞ্চলের তাঁতিদের অন্য কারোর কাজ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তিনি। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মুঘল রাজপুরুষরা এমন একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফলে ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিক নিয়ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বাংলার শায়েস্তা খাঁ ও আজিম-উস-শান লবণ ব্যবসা এর উপর এমন একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, লবণ ছাড়া অন্যান্য পণ্যের উপর তিনি এই একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আজিম-উস-শান ব্যবসায়ীদের বাধ্য করতেন তার জিনিস চড়া দামে ক্রয় করতে। বাণিজ্য এর ফলে স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হত। আজিম-উস-শান কে এই কারণে বাংলা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তবে কেবল বাংলাতেই নয় এ ধরনের উৎপীড়ন সারা ভারত জুড়েই চলত। এর প্রমাণ মেলে ঔরঙ্গজেবের এক নির্দেশনামা থেকে। সেখানে তিনি গুজরাটের রাজকর্মচারীদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন খাদ্যশস্য অল্প দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি না করে। প্রকৃতপক্ষে আকবরের আমল থেকেই ব্যবসায়ীদের ওপর মুঘল রাজপুরুষদের উৎপীড়ন চলত। এই উৎপীড়নের নানান রকমফের ছিল—কখনো একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের মাধ্যমে, কখনো কম সুদে জোর করে ঋণ আদায়ের মাধ্যমে, কখনো বেআইনি কর আদায় করে, কখনো আবার সরাসরি লুটতরাজ করে। এরকম অবৈধ উপায়ে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা ছিল বলে কেউ আর উৎপাদন পরিকাঠামো প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকে নজর দেয়নি। অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে, চাহিদা মেটানো বস্ত্রশিল্পের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

১৯.৫ উপসংহার

শেষ করা যাক বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে। গুজরাট অঞ্চলের মধ্যে অন্তঃবাণিজ্য মালাবার বণিকদের প্রাধান্য ছিল। প্রধান বাণিজ্যিক পণ্য ছিল নারকেল, মসলা, চন্দন কাঠ, সিল্ক যা চিন থেকে দিউ-তে আসত), সুতি বস্ত্র, গম, ঘোড়া, (গুজরাট থেকে মালাবারে যেত)। দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলির উপকূলের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো গুজরাট ও মালাবারি বণিকরা। গুজরাটি বণিকরা আফিম, ঘোড়া, সুতিবস্ত্র দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলোতে রপ্তানি করত।

আইন-ই-আকবরি থেকে জানা যায় যে আকবর শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি সাধনে উৎসাহী হয়েছিলেন। *আইন*-এ রেশম ও তুলা জাতীয় পণ্যের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। তুলা চাষ ও বস্ত্র উৎপাদন ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প ছিল। বারানসী, আগ্রা, জৌনপুর পাটনা, লক্ষ্ণৌ, মালব, বাংলাদেশ ছিল সুতি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ঢাকার মসলিন খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। বার্নিয়ার এর বর্ণনায় বাংলায় বিভিন্ন ধরনের সুতো তৈরির কথা জানা যায়। রেশম ও রেশম বস্ত্র তৈরির প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলা। রঞ্জন শিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল এখানে। এদওয়ার্ড, টেরি ভারতের রঞ্জন শিল্প দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইউরোপের চাহিদা মেটাতে আকবরের পরবর্তী আমলে ক্যালিকো বস্ত্রের উৎপাদন আরম্ভ হয়। জাহাঙ্গিরের আমলে অমৃতসরে পশম ও গালিচা শিল্পের প্রতিষ্ঠা ঘটে। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বাংলা ছিল চিনি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। সুতির ছাপা কাপড় তৈরির প্রধান কেন্দ্র ছিল বেরার, বুরহানপুর, আমেদাবাদ ও আগ্রা। বিহারে উৎপন্ন হতো সোরা।

এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে মুঘল আমলে ভারতবর্ষে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি — উভয় ধরনের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিকশিত হয়েছিল। বণিকরা অবশ্যই এক ধরনের ছিল না। মুঘল রাষ্ট্র চেষ্টা করত শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, আইনের শাসন চালু রাখতে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা নিরাপদ ভাবে ব্যবসা করতে পারত।

১৯.৬ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল যুগে বাণিজ্য-পথ সমূহ দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে কীভাবে সংযুক্ত করেছিল?

২. মুঘল আমলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের স্বরূপ কেমন ছিল?

১৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

Tapam Raycaudhury and Irfan Habib, *The Cambridge Economic History of India, Vol. I, c. 1200-1750.* CUP, 1982

গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ,* কলকাতা, ১৯৮৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* ১২০০-১৭৫৭, কলকাতা, ২০০৮

জগদীশ নারায়ণ সরকার, *মুঘল অর্থনীতি, সংগঠন ও কার্যক্রম*

একক : ২০ ❐ নৌ বাণিজ্য; সুরাট বন্দরের উত্থান

গঠন

২০.০ **উদ্দেশ্য**

২০.১ **ভূমিকা**

২০.২ **মধ্যযুগের ভারতে নৌ-বাণিজ্য**

২০.৩ **আরব সাগরে পর্তুগিজ শক্তির উত্থান ও নৌ-বাণিজ্যের পট পরিবর্তন**

২০.৪ **মধ্যযুগের ভারতীয় বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে বন্দরের ভূমিকা**

২০.৫ **বন্দর হিসেবে সুরাটের উত্থান**

২০.৬ **উপসংহার**

২০.৭ **প্রশ্নাবলী**

২০.৮ **গ্রন্থপঞ্জি**

২০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার উদ্দেশ্য হল মধ্যযুগের ভারতে ১৫৫০ থেকে ১৬০৫ পর্যন্ত নৌ-বাণিজ্য ও সুরাট বন্দরের উত্থান অনুধাবন করা। নিম্নলিখিত বিষয় গুলো আমরা বর্তমান এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে জানতে পারব:

- মধ্যযুগের ভারতে নৌ-বাণিজ্যের ধারা
- ১৪৯৮ সাল থেকে আরব সাগরে পর্তুগিজ শক্তির উত্থান
- মধ্যযুগের ভারতীয় বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে বন্দরের ভূমিকা
- সুরাট বন্দরের উত্থান

২০.১ ভূমিকা

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে যে ভদ্রলোক ভাস্কো-দ্য-গামাকে পথ দেখিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল মিলিন্দি থেকে কালিকট পর্যন্ত পথ দেখিয়েএনেছিলেন তার নাম ইবমজিদ এবং সম্ভবত তিনি ছিলেন সেকালের ভারত মহাসাগরের শ্রেষ্ঠ নাবিক। তবে তিনি ভারতীয় না অন্য জাতীয় মানুষ তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। মালিন্দির রাজা তাকে ভাস্কো-দ্য-গামাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্য-গামার হাত ধরে পর্তুগীজদের দ্বারা এই যে আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে যে যোগসূত্র রচিত হল তা পরবর্তী ভারত মহাসাগরের ইতিহাসের গতিধারা পাল্টে দিয়েছিল।

২০.২ মধ্যযুগের ভারতে নৌ-বাণিজ্য

ষোড়শ শতকের সূচনায় ভারতের বিখ্যাত বন্দর ছিল ক্যাম্বে। সেই সময় ক্যাম্বে থেকে জাহাজে যেত পূর্বে মালাক্কায় আর পশ্চিমে পারস্য উপসাগরের হোরমুজ পর্যন্ত। তখন তার গৌরব তখন অস্তমিত। তার জায়গায় বন্দর হিসাবে ক্রমশ সমৃদ্ধি অর্জন করছে দিউ ও সুরাট। অবশ্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাম্বে তাঁর সুনাম হারাবে। গুজরাটের বন্দরগুলির দক্ষিণে ছিল কোঙ্কন উপকূলের দাভোল ও চাউল বন্দর। চাউলে পর্তুগিজরা ষোলো শতকে বন্দর তৈরি করে। দাভোলের জাহাজ গোটা ভারত মহাসাগর জুড়ে ঘুরে বেড়াত। দাভোলের দক্ষিণে মালাবার উপকূলে বিখ্যাত বন্দর ছিল কালিকট যা গোলমরিচ রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। কালিকটের সম্মুখে সমুদ্র-পরবর্তী তীরে লোহিত সাগরের মুখে অবস্থিত এডেনের সাথে তার প্রধান বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া এ সময় উপকূলের পূর্বদিকে ষোল শতকের প্রথমে করমণ্ডলের প্রধান বন্দর ছিল পুলিকট। পুলিকটের সঙ্গে বাণিজ্য চলত বঙ্গোপসাগরের অপর পারে অবস্থিত (ষোড়শ শতকের প্রথমে) মালাক্কার সাথে। তবে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের পতন হলে পুলিকটের ধ্বংস সূচিত হয় এবং তার জায়গায় উঠে আসবে মসুলিপত্তন। পুলিকটের অবক্ষয় ও মসুলিপত্তনের উত্থান ষোড়শ শতকে ভারতের পূর্ব উপকূলের সমুদ্র বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মসুলিপত্তনের বণিকরা ভারত মহাসাগরের পূর্ব-পশ্চিম দুই দিকেই যাতায়াত করতেন। এই বন্দরের বিখ্যাত বণিক ছিলেন মীর জুমলা। তিনি আবার মুঘল প্রশাসকও বটে। এসময় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য বন্দর ছিল চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম। এই শতকেই সপ্তগ্রামের পতন ঘটে এবং তার স্থান নেয় হুগলি। সপ্তগ্রাম বন্দরের জল কম হয়ে যাওয়ায় পর্তুগিজরা হুগলিতে বন্দর গড়ে তোলে। আবার এসময় বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামেরও অবক্ষয় সূচিত হয়। মনে রাখতে হবে বন্দর হিসেবে হুগলির উত্থানের পশ্চাতে পর্তুগীজদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। অন্যদিকে আবার পুলিকট বন্দরের পতনের পশ্চাতেও পর্তুগীজদের হাত ছিল।

ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে ভারত মহাসাগরের দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে লাভজনক বাণিজ্যপথ ছিল লোহিত সাগরের মুখে অবস্থিত এডেন বন্দর থেকে দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ায় অবস্থিত মালাক্কা পর্যন্ত প্রসারিত - ভায়া গুজরাট বা মালাবারের বন্দরসমূহ। ভারতীয় সমুদ্র বণিকরা লোহিত সাগরে যাবার পথে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দেশগুলির সাথে বাণিজ্য করত। এ ছাড়া অপর একটি সমুদ্রপথে এরা হেড্রাম ও হোরমুজ হয়ে পারস্য উপসাগর দিয়ে ভারতে আসত। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে ভারতীয় সওদাগররা মালাক্কায় ঘাঁটি গেড়েছিল। সুমাত্রায় তাদের ঘনঘন যাতায়াত ছিল এবং জাভায় গ্রীজে বন্দরের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগ ছিল। তাছাড়া এই সময় ভারতীয় বণিকরা মালাক্কায় উপনীত হয় চিনা বণিকদের সাথে পণ্য কেনা-বেচা করত। করমণ্ডলের চেট্টি বণিকরা এই বাণিজ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষে যখন পর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরে এসে উপনীত হয় তখন এই ছিল এই অঞ্চলের সমুদ্র বাণিজ্যের স্বরূপ। গুজরাট থেকে লোহিত সাগরীয় অঞ্চলের যেত মূলত কাপড় ও নীল আর ওই অঞ্চল থেকে নিয়ে আসতো সোনা-রূপার তাল। মালাবার অঞ্চল থেকে রপ্তানি হতো মশলা, পূর্ব আফ্রিকা থেকে গুজরাটি বণিকরা নিয়ে আসতো আবলুশকাঠ, হাতির দাঁত ও সোনা। এর বদলে ওই অঞ্চলে ভারত থেকে যেত কাপড় ও খাদ্যদ্রব্য। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে হরমুজ হয়ে যেসব পণ্য সামগ্রী ভারতে আসত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ঘোড়া, কার্পেট, রং, মুক্তো প্রভৃতি। বাংলা থেকে দক্ষিণ ভারতও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি হত খাদ্য দ্রব্য ও কাপড়। করমন্ডল উপকূল থেকে রপ্তানি হত কাপড় ও সুতো। এক ইংরেজ রেসিডেন্ট মন্তব্য করেছিলেন, এডেন থেকে আঁচে পর্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভারতীয় বস্ত্র পরিধান করত। এই মন্তব্যে খানিকটা অতিশয়োক্তি থাকলেও একেবারে মিথ্যা ছিল না। অতিশয়োক্তি এ কারণে যে, মিশর বা অটোমান তুর্কিরা তুলো-র চাষ করত ও বস্ত্র রপ্তানিতে সুনাম অর্জন করেছিল। চীন ছাড়া প্রায় গোটা এশিয়ায় বস্ত্র সরবরাহ করত

ভারতবর্ষ। বিদেশ থেকে ভারতে আমদানি হওয়া পণ্যের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সোনা, রুপা ও তামা। ব্রোঞ্জ তৈরিতে প্রয়োজন ছিল টিন। আর আসত কিছু মসলা, যা ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। বাণিজ্য পণ্য হিসেবে কদর ছিল যুদ্ধের ঘোড়া এবং হাতির দাঁতের সামগ্রীর। সপ্তদশ শতকে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে ভারতের সোনা ও রুপার আমদানি অনেক বেড়ে যায়।

পর্তুগীজদের আগমনের পূর্বে গুজরাটিরা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোম্বাসা, কিলওয়া, মালিন্দি, পেট প্রভৃতি শহরের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। লোহিত সাগরীয় অঞ্চলের প্রবেশের পথে গুজরাটি জাহাজ ঐসব অঞ্চল ঘুরে যেত। বস্ত্রের বিনিময়ে হাতির দাঁত ও সোনা আমদানি হত পূর্ব আফ্রিকার অঞ্চল থেকে। পূর্ব আফ্রিকার সাথে এই বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকরা পশ্চিম ভারত মহাসাগরে আরবদের সহযোগিতা লাভ করেছিল ও এই ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল।

আলোচ্য সময়ে ভারতীয় বণিকরা যেমন আরব ভূখন্ডে বসবাস করতো তেমনি আরবরাও ভারতের পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন বন্দরে বসতি করেছিল। দশম শতকে তৎকালীন বৃহৎ বন্দর ক্যাম্বেতে আরব ও পারসিক বণিকদের বৃহৎ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ক্যাম্বেই ছিল গুজরাটের সুলতানদের প্রধান বন্দর। কিন্তু পলি জমার ফলে পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে এই বন্দরের মৃতপ্রায় দশা লক্ষ্য করা যায়। এই সময় থেকে সুরাট ও দিউ বন্দর হিসেবে উঠে আসে। মালিক আয়াজের নেতৃত্বে এ সময়ে দিউ লোহিত সাগর অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। অন্যদিকে সুরাটের শাসক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ মালিক গোপী সম্ভাবনাময় সুরাটের বাণিজ্যকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে দিউ এর ধ্বংস কামনা করতেন।

পর্তুগিজরা ভারতে আসার ঠিক আগে ভারত মহাসাগরের মধ্যে অঞ্চলে গুজরাটি মুসলমানদের বাণিজ্যিক প্রাধান্য ছিল। তারা মূলত ক্যাম্বে থেকে মালাবারের মধ্যে বাণিজ্য করতো। ষোড়শ শতকের প্রথমে মালাক্কা বন্দরে গুজরাটি বণিকরা বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ধর্মে তারা ছিল মুসলমান এবং আরব বণিকদের ঘনিষ্ঠ। এরা ছিল জাহাজি বণিক অর্থাৎ এদের নিজস্ব জাহাজ ছিল। পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগরের বন্দরগুলোতেও তারা বাণিজ্যব্যপদেশে গমন করতো। কিন্তু আরব সাগরের বাণিজ্যের আরব বণিকদেরই প্রাধান্য ছিল। লোহিত সাগর ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান বণিকরা এডেন থেকে গুজরাটে বাণিজ্য করতো। তাছাড়া মালাবার থেকে লোহিত সাগরের বাণিজ্যে মধ্যপ্রাচ্যের বণিকদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু গুজরাট থেকে মালাক্কা ছিল গুজরাটি মুসলমানদের দখলে। পর্তুগীজদের আসার পর সমুদ্রে বাণিজ্য করার এই ধারা খানিকটা পাল্টে যায়। পর্তুগিজরা মুসলিম বণিক জাহাজগুলিকে সমুদ্র পথে আক্রমণ করতে করতে শুরু করে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমরা মালাবার অঞ্চল ত্যাগ করে। এদের স্থানে আসে গুজরাটি বণিক ও ভারতীয় মুসলমান বণিকরা। ষষ্ঠদশ শতক থেকে লোহিত সাগরীয় অঞ্চলের সাথে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্য পূর্বের থেকে অনেক বেড়ে যায়। ভারত সাগরের পূর্বে অবস্থিত দক্ষিণ চিন সাগর ও মালয়ের মধ্যবর্তী সমুদ্রপথে চিনা বণিকদের আধিপত্য ছিল। তারা ওই অঞ্চল থেকে অন্য সব বণিকদের উঠিয়ে দেয়। আবার মালয় ও জাভার বণিকরা আধিপত্য স্থাপন করেছিল ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রপথে। আর একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ, ভারতের উপকূলের সমুদ্র-বাণিজ্য ছিল মূলত মুসলমানদের হাতে। আর সেই সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য পণ্য সরবরাহের কাজটা কুক্ষিগত করেছিল হিন্দু বণিকরা। হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের কাজও ছিল হিন্দু কর্মচারীদের হাতে।

২০.৩ আরব সাগরে পর্তুগিজ শক্তির উত্থান ও নৌ-বাণিজ্যের পট পরিবর্তন

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে পর্তুগিজরা আরবসাগর অঞ্চলে নিজেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ তারা গোয়া অধিকার করে, ১৫১১ তে তারা মালাক্কা অধিকার করে। অতঃপর কুক্ষিগত করে কলম্বো। এইভাবে আরব সাগরের উপর পর্তুগিজরা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। নৌকায় তাদের পারদর্শিতা ও প্রাধান্য অস্বীকার করার মতো কোনো শক্তি সেসময়ে ছিল না। এমনকি মুঘল সম্রাট আকবরও তাদের প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তারা মাঝ সমুদ্রে টহলদারি প্রথা চালু করে উপকূলে দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সমুদ্রে যাতায়াতের জন্য অন্য বণিকদের নিরাপত্তা কিনতে বাধ্য করত। অন্যথায় বিপদে পড়ার হাত থেকে কেউ রেহাই পেত না।

ভারতের করমন্ডল উপকূলে বণিকরা দীর্ঘ উপকূলের বহু বন্দরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। সুরাটের মত এখানে কোন কেন্দ্রীভূত বন্দর গড়ে ওঠেনি। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া করমন্ডল উপকূলের বণিকরা সব এসেছিল এমন সব গোষ্ঠী থেকে যারা পুরুষানুক্রমে বাণিজ্যিক কর্মে লিপ্ত ছিল। তবে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি অর্জিত হবার সাথে সাথে অন্যান্য জাতির লোকেরাও বাণিজ্য করতে আসে। এই উপকূলে হিন্দু বণিকদের প্রাধান্য ছিল, যদিও মুসলমান বণিকদের আধিপত্য যে একেবারে ছিল না তা নয়। হিন্দুদের মধ্যে চেট্টিদের ভূমিকা ছিল প্রধান। গুজরাটের বণিকদের মত এরাও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তামিল তেলেগু — উভয় শ্রেণির লোকই চেট্টি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তেলুগুরা এসেছিল কৃষ্ণা-গোদাবরী উপকূল থেকে। এদের মধ্যে কোমাটিরা মালাবার ও কর্ণাটক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তামিল চেট্টিরা প্রধানত করমণ্ডল উপকূলের দক্ষিণ দিকে বিশেষত মাদুরাই অঞ্চলে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও মহাজনি কারবার গড়ে তোলে।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল করমন্ডল উপকূলে বন্দর হিসেবে মসুলিপত্তনের উত্থান। এই সময় গোলকুণ্ডা রাজ্য পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করে। মসুলিপত্তনের উত্থানের পেছনে ছিল এই গোলকুণ্ডার প্রাধান্য বিস্তার। পুলিকটের পেছনে ছিল যেমন বিজাপুর, মসুলিপত্তনের পেছনের শক্তি তেমনি গোলকুণ্ডা। গোলকুণ্ডায় শিয়া সম্প্রদায় বেশি থাকায় পারস্য দেশ থেকে অনেক শিয়া বণিক এ সময়ে গোলকুণ্ডায় আসে। তাদের মধ্যে অনেকে শাসনকার্যে নিযুক্ত হয়। অনেকে বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। অনেক রাজপুরুষ এ সময় শাসনকার্যের সাথে সাথে বাণিজ্যেও লিপ্ত হয়। যেমন মীরজুমলা। এছাড়াও সুন্নি আফগান ও আরব বণিকরাও মুসলিপত্তনে ভিড় করে। মুসলিপত্তনের বণিকরা পারস্য উপসাগর মায়ানমার, সিয়াম আঁচে, ব্যান্টম, ম্যাকাসার প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এছাড়া করমন্ডল উপকূলে ছিল 'চুলিয়া' বণিকরা, যারা সমুদ্র বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। এরা তামিল মুসলমান হলেও আদতে ছিল পূর্ববর্তী আমলের আরব বণিকদের বংশধর যারা ভারতীয় সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল। যেমন মারাইক্কা, শাব্বাই প্রভৃতি। এই দুটি গোষ্ঠীই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলাদ্বীপগুলির সাথে ব্যাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। চুলিয়া বণিকরা শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলেও বাণিজ্যব্যাপদেশে যাতায়াত করতো।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যের ইতিহাসের প্রধান ঘটনা হল বন্দর হিসেবে পুলিকটের পতন ও মসুলিপত্তনের উত্থান। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের রাজা রামরায় পরাজিত ও নিহত হয়। এ ঘটনার সাথে সাথে বিজয়নগরের সম্পূর্ণ পতন না ঘটলেও গোলকুণ্ডা সুলতান কুতুবশাহ নির্দয় ভাবে বিজয়নগর লুঠ করেছিলেন। বিজয়নগর এইভাবে ধ্বংস হলে পুলিকট বন্দরের অভ্যন্তরীণ শক্তি নিঃশেষিত হয়। তবে বন্দর হিসেবে পুলিকটের পতনের পশ্চাতে 'পর্তুগিজ নীতি'র কম ভূমিকা ছিল না। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গোপসাগর

সম্পর্কে পর্তুগীজ নীতিতে পরিবর্তন আসে। এতদিন বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে পর্তুগীজদের বাণিজ্য ছিল রাজকীয় বাণিজ্য। রাজার মালিকানাধীন জাহাজে বাণিজ্যিক পণ্য চলাচল করত। এখন বিশেষ বিশেষ লোককে পর্তুগালের রাজা অনুমতি দেয় তাদের নিজস্ব জাহাজে বাণিজ্য করার। তবে রাজার জাহাজে অন্যান্য বণিকেরা মাল পাঠাতে পারতো। ফলে রাজার জাহাজের পাশাপাশি অন্যান্য জাহাজেও বাণিজ্য শুরু হয়। ষোলশতকের প্রথমার্ধে পর্তুগিজরা বঙ্গোপসাগরে জাহাজ চলাচলে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। বিশেষত তাদের বন্ধু-বণিকদের ক্ষেত্রে। তবে শত্রু বণিকদের জাহাজ দেখলেই তারা আক্রমণ করত। ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পর্তুগীজদের এই নীতিতে পরিবর্তন আসে। এর পেছনে ঐ বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত জাহাজগুলির ভূমিকা ছিল। পুলিকট থেকে মালাক্কায় অন্য জাহাজ চলাচল করলে ও ওই বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত জাহাজের মুনাফা কমে যায়। রাজার পক্ষে যা সহনীয় ছিল, তা প্রজার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কারণে ঠিক হয় বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত জাহাজগুলি গোয়া থেকে পুলিকট হয়ে মালাক্কায় যাবে। এই বাণিজ্য তার একচেটিয়া অধিকার থাকবে। অর্থাৎ পুলিকট থেকে ভারতীয় জাহাজের মালাক্কায় বাণিজ্য করতে যাবার পথ এর ফলে বন্ধ হয়ে যায়। পরিণামে ভারতীয় বণিকরা পুলিকটত্যাগ করে এবং পুলিকটের দ্রুত পতন ঘটে। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে যখন ওলান্দাজ বণিকরা পুলিকটে আসে তখন ওই বন্দরের শেষ অবস্থা। মাত্র দু-তিন হাজার লোকের বাস। বন্দর থেকে কোন জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দেয় না। সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য জাহাজ ধরতে বণিকরা কিছুটা উত্তরে অবস্থিত মসুলিপত্তনে পণ্য পাঠায়। ষোল শতকের প্রথমে করমণ্ডল উপকূলের বিখ্যাত বন্দর পুলিকট আর সতেরো শতকের প্রথমে মসুলিপত্তন করমণ্ডল উপকূলের বিখ্যাত বন্দর। অধ্যাপক আরসরত্নমের মতে, করমণ্ডল উপকূলের প্রধান বন্দরগুলি উপকূলের রাজনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং বন্দরের সমৃদ্ধি অভ্যন্তরভাগের রাজনৈতিক শক্তিগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল। লক্ষণীয় যে, মসুলিপত্তনের জাহাজি বণিকরা পুলিকটের বণিকদের মত মালাক্কায় জাহাজ পাঠাত না। তার পরিবর্তে তারা উত্তরে অবস্থিত মায়ানমারে ইরাবতী নদীর মোহনায় অবস্থিত পেগুতে তাদের পণ্যবাহী জাহাজ পাঠাতে শুরু করে। আর পাঠাতো পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে। মনে রাখতে হবে ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন বন্দর হিসাবে মুসলিপত্তনের উত্থান হচ্ছে, তখন পর্তুগিজরা বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তাদের বন্ধুত্বের নীতি পরিত্যাগ করে। সেই কারণেই পরবর্তীকালে মসুলিপত্তনের বণিকরা পর্তুগিজ অধিকৃত মালাক্কা এড়িয়ে আঁচের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং মসুলিপত্তনের ভূমিকা বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে পর্তুগিজ বিরোধী হয়ে ওঠে।

২০.৪ মধ্যযুগের ভারতীয় বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে বন্দরের ভূমিকা

ভারতের ইতিহাসে গুজরাটের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ওই অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল থেকেই অনেক বন্দরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে লক্ষণীয় যে, অনেকের মধ্যে সর্বদা একটি প্রধান বন্দরের মর্যাদা লাভ করে এসেছে এবং অন্যান্য বন্দরগুলি তার সহযোগীর ভূমিকা পালন করে মাত্র। ওই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিখ্যাত বন্দরটি হল ব্রোচ। এটাই প্রথম ওই অঞ্চলের বন্দরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করে। পরবর্তীকালে ক্যাম্বে বন্দর হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পায়।

দশম শতকে ক্যাম্বে বন্দর হিসেবে খুব গুরুত্ব অর্জন করে এবং পরবর্তী প্রায় সাড়ে তিন শতক ধরে সে তার সুনাম বজায় রাখে। পারস্য ও আরবের মুসলমান বণিকরা এই বন্দর শহরে বসতি গড়ে। তাছাড়া ভেরাভাল ও জুনাগড়েও তাদের আস্তানা গড়ে ওঠে। মুসলিম শাসন শুরু হবার পরেও ক্যাম্বের এই গুরুত্ব অব্যাহত থাকে এবং গুজরাটের স্বাধীন সুলতানদের আমলেও (১৪০১-১৫৭৩) ক্যাম্বেই ছিল এই অঞ্চলের প্রধান বন্দর। গুজরাটের উপকূল রেখা বরাবর পরবর্তীকালে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা-ই ক্রমে ক্যাম্বের পতন ডেকে আনে। ক্যাম্বের সমগ্র

উপকূল একসময় জলভাগের উপরে উঠে আসে এবং উপসাগরে পলি সঞ্চয়ের ফলে অনেক দ্বীপময় অঞ্চল সৃষ্টি হওয়ায় ক্যাম্বে বন্দরে নৌ-চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে টমপিরেজ যখন ক্যাম্বেতে আসেন তখন বড় বড় জাহাজ ক্যাম্বেতে আসা খুব বিপদজনক হয়ে পড়ে। ফলে সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য নিরাপদ কোনো বন্দরের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে জাহাজগুলো এখন থেকে ক্যাম্বের বিপরীতে উপসাগরের অন্য পাড়ে গোঘাতে এসে ভিড়তে থাকে। বন্দর হিসেবে সুরাটের উত্থানের পথ এইভাবে প্রশস্ত হয়। ষোড়শ শতকে ক্যাম্বে-কে পেছনে ফেলে সুরাট এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বন্দর হয়ে ওঠে।

ক্যাম্বে উত্তর অধ্যায়ে কাথিয়াওয়াড় উপকূলে অবস্থিত দিউ বন্দর ছিল প্রথম দিকে উদীয়মান বন্দর হিসাবে সুরাটের প্রতিদ্বন্দী। সুরাটের গভর্নর মালিক আয়াজের উদ্যোগে নগরটি গুজরাটের সাথে লোহিত সাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু দিউয়ের ভৌগলিক অবস্থান এই বন্দরের খ্যাতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ষোড়শ শতকের মধ্য ভাগে পর্তুগিজরা দিউ দখল করে নেয়। তখন থেকে এটি একটি ইন্দো-পর্তুগিজ শহরে রূপান্তরিত হয়, যা লোহিত সাগরের সাথে বাণিজ্যকারী কাপোল বানিয়াদের প্রধান আস্তানা হয়ে ওঠে। আর সুরাট পরিণত হয় মুঘল ভারতের প্রধান বন্দরে।

২০.৫ বন্দর হিসেবে সুরাটের উত্থান

বন্দর হিসাবে সুরাটেরএই উত্থানের পশ্চাতে ছিল নিঃসন্দেহে মুঘলদের ভূমিকা। শহরের নিরাপত্তা মুঘল শাসনের অধীনে সুরক্ষিত হয়। পশ্চাৎভূমির সঙ্গে সড়কপথে এই বন্দরের যোগ সূচিত হয়। সুরাট মুসলমান তীর্থক্ষেত্র মক্কায় হজ যাত্রার জন্য মুঘলদের প্রধান বন্দর হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রতি বছর হজে যাবার জন্য তারা সুরাটে এসে জাহাজ ধরে। তবে সুরাটের ক্ষেত্রে এসব পরিবর্তন বা বন্দর হিসেবে তার এই গুরুত্ব অর্জন হঠাৎ করে ঘটেছিল তা মনে করার কারণ নেই। অন্যদিকে সুরাটের এই উত্থানের পেছনে কেবল মুঘলদেরই যে হাত ছিল, তাও ভাববার কোনো অবকাশ নেই। সুরাটের উত্থানের সাথে সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ষোড়শ শতকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম ভারত সাগরকে ঘিরে তিনটি নতুন মুসলমান শক্তির আবির্ভাব ঘটে ভারতে মুঘল, পারস্যে সাফাভি আর মিশর ও সিরিয়ায় অটোমান সাম্রাজ্য। ভারতে যখন বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছেন ঠিক সে সময় পারস্যে সাফাভি সাম্রাজ্য গড়ে উঠছে। এই বংশের প্রথম নৃপতি শাহ ইসমাইল (১৫০১-১৫২৪) এবং তার পুত্র শাহ তাহমাস্প (১৫২৪-১৫৭৬) সাফাভি সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকে শিয়া ইরানের জন্ম হয়। পারস্যে সাফাভিদের উত্থান অটোমান তুর্কিরা ভাল চোখে দেখেনি। তাদের শাসক প্রথম সেলিম ইরাণের দিকে অগ্রসর হয়ে সাফাভিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পারস্যের শাসক শাহ ইসমাইল সেলিমের কাছে চালদিরানের যুদ্ধে পরাজিত হয় (১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে)। অটোমানরা ইরাক দখল করে কিন্তু ইরানে কোন অটোমান সৈন্য স্থায়ীভাবে প্রবেশ করেনি। সাময়িক এই বিপর্যয়ের পর সাফাভিরা পারস্যে নিজ ভূখণ্ডের উপর সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাদের সুলতান শাহ আব্বাসের আমলে গৌরবের শীর্ষে উপনীত হয়। পারস্যে সাফাভি শাসনের সুপ্রতিষ্ঠা পারস্য উপসাগরের বাণিজ্য সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে এবং পারস্য উপসাগরের বাণিজ্য পর্তুগিজ অধীনতা পাশ মুক্ত হয়।

সেলিম এরপর মামলুকদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মিশর সিরিয়া তখন মামেলুকদের অধীনে। সেলিম মামেলুকদের পরাজিত করে মিশর ও সিরিয়া দখল করে (১৫১৬-১৫১৭)। ফলে ঐ অঞ্চল অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সেলিমের উত্তরাধিকারী সুলেমান (১৫২০-১৫৬০)। লোহিত সাগরের মুখে অবস্থিত এডেন বন্দর তার আমলে

আটোমানরা দখল করে। এক কথায় বলতে হয় যে, ভারতে বাবর যখন মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছেন, সে সময় পারস্যে সাফাভি সাম্রাজ্য গড়ে উঠছে আর ঐ একই সময়ে অটোমান তুর্কিরা ইরাক সিরিয়া মিশরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে লোহিত সাগরের উপর আধিপত্য কায়েম করে ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে পর্তুগিজরা এইসময় তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে অটোমানরা ইয়েমেন জয় করে। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে লোহিত সাগরের মুখে অবস্থিত এডেনও তাদের অধিকার স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে আরব ভূখন্ডের পূর্বাংশে অটোমান সাম্রাজ্যের এই প্রসার এই অঞ্চলে সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম ধর্মের প্রধান তীর্থক্ষেত্রগুলি তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং এলেপ্পো, দামাস্কাস, কায়রো, মক্কা যাবার তীর্থযাত্রার পথে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মুঘলরা আরব সাগরের পূর্বপাড়ে যখন হজ যাত্রার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিত, তখন পশ্চিমপাড়ে হজ যাত্রার জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে অটোমানরা। অটোমানরা ভারত সাগর থেকে পর্তুগিজদের উৎখাত করতে পারেনি ঠিকই, তবে তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে পেরেছিল। এই পরিস্থিতিতে সুরাট বন্দরের উত্থান ঘটে। বস্তুত পারস্য উপসাগরে সাফাভিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং লোহিত সাগরীয় অঞ্চলে অটোমানদের প্রাধান্যের বিষয়টি বন্দর হিসাবে সুরাটের উত্থানের পথকে প্রশস্ত করে। ষোড়শ শতকে ভারত মহাসাগরের পশ্চিমে বাণিজ্যের বিশেষ বাড়বাড়ন্ত দেখা দেয়। আর সুরাট হয়ে পড়ে সেই বাণিজ্যের প্রধান বন্দর।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বন্দর হিসেবে সুরাটের পতন ঐতিহাসিক মহলে বহুল চর্চিত একটি বিষয়। এ প্রসঙ্গে অশীন দাশগুপ্ত রচিত *Indian Marchants and the Decline of Surat* (1979) সম্ভবত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সুরাটের পতন নিয়ে ঐতিহাসিকগণ বিস্তৃত আলোচনা করলেও এই বন্দরের উত্থান প্রসঙ্গটি বিশেষজ্ঞদের তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। তবে মনে করা হয় সুরাটের উত্থান গুজরাটে মুঘল শক্তির ক্ষমতা বিস্তারের ফলশ্রুতি। ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর গুজরাট জয় করেন। জনৈক মুঘল ইতিহাসের গবেষক মনে করেন ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাম্বে গুজরাটের প্রধান বন্দর ছিল। আর সুরাটের দ্রুত উত্থান ঘটে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে। মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাতে সুরাটের বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুরাট মুসলিম তীর্থযাত্রীদের বা হজযাত্রীদের লোহিত সাগর অঞ্চলে তীর্থযাত্রার প্রধান বন্দর হয়ে ওঠে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে মনে করা হয় যে, গুজরাটে মুঘলদের রাজনৈতিক সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং সুরাটের সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় অংশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগ বৃদ্ধি এই নগরের উত্থানের পথকে প্রশস্ত করেছিল। ঠিক যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের অবনমনের সাথে সাথে এই যোগাযোগের সূত্রটি ছিন্ন হওয়ায় সুরাটের পতনকে ব্যাখ্যা করা হয়।

ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে গুজরাট উপকূলে যে সব বন্দর ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্যাম্বে বা খাম্বাত এবং দিউ। দিউ-এর উপর কর্তৃত্ব করতেন মালিক আয়াজ। আর খাম্বাত বা ক্যাম্বের শাসক ছিলেন গোপীনাথ নামে বাণিজ্যে উৎসাহী এক ব্যক্তি, যিনি মালিক গোপি নামে পরিচিত ছিলেন। সুরাটের লোক হয়েও এই ক্যাম্বেতেই তার বাণিজ্যের সিংহভাগ কেন্দ্রীভূত ছিল। সুরাটের কথা টম পিরেজ বা দুয়ার্তে বারবোসার মত মত প্রথমদিকের পর্তুগিজ লেখকদের রচনায় পাওয়া গেলেও আলোচ্য সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের প্রথম কয়েক দশকে এই শহর ছিল মূলত তাপ্তি নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত রাণ্ডের নগরের খ্যাতির আড়ালে। নাবায়াৎ মুসলমানরা ছিলেন এই শহরের বাসিন্দারা যারা পশ্চিম ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালানোর কাজ করতেন। পঞ্চদশ শতকের শেষে ও ষোড়শ শতকের সূচনায় পলি সঞ্চয়ের কারণে যখন ক্যাম্বে ধীরে ধীরে পতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন বন্দর হিসেবে এই রাণ্ডের লাভ হয়েছিল। তবে দিউ-ও সেই লভ্যাংশে ভাগ বসিয়েছিল। কারণ সেখানে তখন মালিক আয়াজের উদ্যোগে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে তার পুত্র মালিক ইশাকও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাণ্ডের এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় সুলতান বাহাদুর তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে

লড়াইয়ের সময় রাণ্ডের দুই ধনী বণিকের অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করছেন। এই বণিকদ্বয় হলেন কোজে বাবু এবং নায়াৎচা। সুলতান বাহাদুরও পর্তুগিজদের মধ্যে বিবাদ কালে এই রাণ্ডের পর্তুগিজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পর্তুগিজ নেতা আন্তেনিও ডি সিলভেইরা ভারত মহাসাগরের সমুদ্রবাণিজ্যে রাণ্ডের উজ্জ্বল ভবিষ্যত অনুধাবন করেছিলেন। অশীন দাশগুপ্ত বলেছেন পর্তুগীজ নেতা আন্তেনিও ডি সিলভেইরা-র আক্রমণে এই শহরের কিছুটা অংশ ভস্মীভূত হয় (১৫৩০)। ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে রাণ্ডের গুরুত্ব অর্জনের যে উজ্জ্বল সম্ভবনা দেখা গিয়েছিল এই আক্রমণের পর রাণ্ডের আর ঘুরে দাড়াতে পারেনি।

১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে যখন পর্তুগিজরা গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের কাছ থেকে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পায়, তখন এশিয় বণিকদের পক্ষে দিউ পরিত্যাগ করে নব্য বন্দর খুঁজে নিয়ে সেখান থেকে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। পর্তুগীজরা সুরাট আক্রমণ করেছিল। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সুরাটের গভর্নর খাজা সফর উস সলমানি তাপ্তি নদীর ওপরে দুর্গ নির্মাণ করেন। তৎসত্ত্বেও ১৫৪৭ সালে পর্তুগিজরা সুরাট আক্রমণ ও লুট করে। তবে ১৫৬০-১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা আবার সুরাট আক্রমণ করলে তা ব্যর্থ হয়। এর কিছুকাল পর ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর সুরাট দখল করেন এবং ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুরাটে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। খাজা-সফর-উস-সালমানি ১৫২০-র দশকে ভারতে আসেন। তাঁর উদ্যোগে সুরাট দিউ (যা তখন পর্তুগীজদের অধীন ছিল) ও ক্যাম্বের বিকল্প হিসাবে গড়েওঠে।

এ ব্যাপারে গুজরাটের সুলতান মামুদ শাহ-এর (১৫৩৭-৫৪) দরবারে কী ভূমিকা ছিল, তা স্পষ্ট নয়। মামুদ শাহের রাজত্বের প্রথম দিকে তার দরবারে দরিয়া খান এবং আলম খান লোদী নামে দুই প্রভাবশালী ব্যাক্তি ছিলেন, সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ে যাদের আগ্রহ ছিল। গুজরাট ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক পিয়ার্সন মনে করেন, ১৫৩৯ সাল থেকে সুরাটে যে দুর্গ নির্মাণ হয় তা ছিল মূলত খাজা সফরের সিদ্ধান্ত। নিজ রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গুজরাটের সুলতানরাও যে সমুদ্র বাণিজ্যে উৎসাহী ছিলেন, এই বক্তব্যে অবশ্য সেকথা চাপা পড়ে যায়। সম্ভবত দুর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ১৫৩৮ সালে গুজরাটি-অটোমানদের দিউ দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হলে। যখন হামিদ সুলেমান পাশার (আটমান-তুর্কিনেতা) নৌবহর দিউ দখলে ব্যর্থ হয়ে আরব সাগরের পূর্ব প্রান্ত থেকে প্রায় শূন্য হাতে ফিরে যায়। ইন্দো-পারসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে কামান স্থাপন করে সুরাট দুর্গের সুরক্ষার যে ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই কামান সংগৃহীত হয়েছিল পাশার নৌবহর থেকে। আর সুরাটে দুর্গ নির্মাণ হয়েছিল খাজা সফরের উৎসাহে। সুরাটের গভর্নর ছিলেন খাজা সফর সুলেমানি। তার অপর নাম ছিল খুদাবন্দখান। ইতালির এক অমুসলমান পরিবারে তার জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তুর্কিস্তানে যান এবং সেখানকার সুলতানের সাথে দেখা করেন। সে সময়ে ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে সুলেমানি মুসলমান হন। এর কিছুদিন পর তিনি সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন। নৌ-যুদ্ধে পারদর্শী এই সফর সুলেমানি নৌ-রণনীতি রচনায় ছিলেন দক্ষ। সে সময় সমুদ্র পথে সুরাট বারবার দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিল। গুজরাটের সুলতান সেজন্য সুরাটের নিরাপত্তার জন্য দিল্লীর সুলতানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে দিল্লি থেকে সফর সুলেমানিকে গুজরাটের গভর্নর করে পাঠানো হয়। সুরাটের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এই সফর সুলেমানি এক দুর্গ নির্মাণ করেন এবং তুর্কিস্তান থেকে আনীত কামান দ্বারা তা সুসজ্জিত করেন।

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সুলতান খাজা সফরের নেতৃত্বে একদল সৈন্য দিউ অভিযানে পাঠান। এই দলের সহযোগী হয় অটোমান সাম্রাজ্যের একদল সৈন্য। গুজরাটি-অটোমানদের এই অভিযান অবশ্য সাফল্য অর্জন করেনি। তারা পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণাধীন দিউ দখল করতে ব্যর্থ হয়। চার মাস ধরে অবরুদ্ধ হলেও পর্তুগিজরা দক্ষতার সাথে

গুজরাটি-অটোমান আক্রমণ প্রতিহত করে। মনে রাখতে হবে এই যুদ্ধ ছিল অটোমান-পর্তুগিজ সঙ্ঘাতের অংশমাত্র। অটোমান তুর্কিরা আরব সাগরে পর্তুগিজদের হটিয়ে দিয়ে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৫৩১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে নুনো দ্য কুনহো-র নেতৃত্বে পর্তুগিজরা দিউ দখলের চেষ্টা করে। তবে তাদের সে চেষ্টা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর তারা গুজরাটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। গুজরাটের বিভিন্ন বন্দর শহরের, বিশেষত, সুরাটের উপর হামলা চালাতে থাকে। এর অনতিকালপর গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ হুমায়ুন কর্তৃক আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় শঙ্কিত হন এবং মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পর্তুগিজ সাহায্যের প্রত্যাশী হয়েওঠেন। এহেন পরিস্থিতিতে বাহাদুর শাহ পর্তুগিজদের সাথে এক চুক্তি করেন ও তাদের দিউ প্রদান করেন। বিনিময়ে পর্তুগিজরা তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। পর্তুগিজরা দিউতে দুর্গ নির্মাণ করে। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য হুমায়ুনের আক্রমণের সম্ভাবনা দূরীভূত হলে বাহাদুর শাহ দিউ থেকে পর্তুগীজদের অপসারিত করার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩-ই ফেব্রুয়ারি সমুদ্রবক্ষে এই রকম এক আলোচনার সময় মাঝ সমুদ্রের পড়ে গিয়ে তার সলিল সমাধি ঘটে। এ ঘটনার চিত্র *আকবরনামা*-য় দেখতে পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজদের দ্বারা নির্মিত নয় এমন দুর্গের সংখ্যা হাতে গোনা। এর মধ্যে সুরাটের দূর্গ ছিল অন্যতম। শহরকে রক্ষায় এর বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি মুঘল আক্রমণের (১৫৭৩) বিরুদ্ধে এ দুর্গ কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এরপর থেকে বন্দর হিসাবে সুরাট ক্রমশ সমুদ্র বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এ অঞ্চলের প্রাচীন বিখ্যাত বন্দর দিউয়ের তুলনায় সে অধিক গুরুত্ব অর্জন করে। অন্যদিকে আঁচে ও লোহিত সাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে সমুদ্র বাণিজ্যে, বিশেষত গোলমরিচের বাণিজ্যে 'গুজরাটের মধ্যস্থ ভূমিকা' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খাজা সফরের মৃত্যুর পরও সুরাটের সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং এ নগর পর্তুগিজ আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। ১৫৪৬ সালে খাজা সফরের পর খুদাওয়ান্দ খান রুমি সুরাট বন্দর নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষার দায়িত্ব সামলান। ১৫৫০-এর দশকের শেষের দিকে চেঙ্গিস খান দ্বিতীয় খুদাওয়ান্দ খানকে হত্যা করে সুরাট দখল করেন। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর টিমুরিদ মির্জা সুরাট দুর্গ দখল করেন। পরবর্তীকালে গুজরাট অভিযানকালে আকবর ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে সুরাট দখল করেন। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক পালা বদলের এই ঘটনাক্রমের মধ্যেও বন্দর হিসেবে সুরাটের সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। মুঘলরা শহরটি দখল করার পর সমৃদ্ধ গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলের সঙ্গে সুরাটের সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় এর সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য আরো বৃদ্ধি পায়। তবে একথাও মনে রাখতে হবে মুঘলদের দ্বারা অধিকৃত হবার পূর্বেই সুরাট অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী বন্দরের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী বা সমৃদ্ধশালী বন্দর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। গুজরাটের সমুদ্র বাণিজ্যে সুরাট প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে পরিণত হয়েছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল খাজা সফর, তার উত্তরাধিকারী খুদাওয়ান্দ খান (দ্বিতীয়) ঈমদ-উল-মুলক এবং চেঙ্গিস খানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে।

২০.৬ উপসংহার

বস্তুত সুরাটের উত্থান কতগুলো পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রথম পর্যায় ১৫৩০-এর দশকে যখন ধীরে ধীরে ক্যাম্বে বন্দরের অবনমন ঘটছিল তখন সেই পরিস্থিতির সুযোগে রাণ্ডের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়। এবং এই সময়ে সুরাট কিছুটা লাভবান হয়েছিল। কিন্তু সে সম্ভাবনা কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয় দিউ ও সুরাটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পর্তুগিজরা ১৫৩৫ সালে দিউ দখল করে। এই ঘটনার তিন বছরের মধ্যে ১৫৩৮ সালে সুরাটের গভর্নরের দিউ অভিযান ব্যর্থ হলে খাজাসফর দুর্গ নির্মাণ করে সুরাট শহরের সুরক্ষার ব্যবস্থা যেমন

সুনিশ্চিত করেন, তেমনি বাণিজ্যিক সম্ভাবনার দিক থেকে বন্দর হিসেবে সুরাট কেবল ক্যাম্বেই নয়, দিউ-এরও বিকল্প হয়ে ওঠে। এরপর থেকে দিউ পর্তুগিজদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ফলে পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকরা এসে ভিড় করে সুরাট বন্দরে। এ সময়ে সুরাট উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ পশ্চাৎভূমির প্রধান বন্দর অপেক্ষা বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ৎ বা কেন্দ্রে হিসাবে বেশি বিকাশ লাভ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত জলপথে প্রসারিত গোলমরিচ ব্যবসার মধ্যবর্তী কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে এই সুরাট বন্দর। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বক্সার বলেছেন, লোহিত সাগর ও আঁচের মধ্যে মসলার রমরমা বাণিজ্যের মূলে ছিল গুজরাটি বণিকদের উদ্যোগ ও সহযোগীতা। এই ভাবে সুরাট ১৫৪০-এর দশকের মধ্যভাগে সুমাত্রা ও পশ্চিম-এশিয়ার মধ্যে নৌ-পরিবহন ও বাণিজ্যিক যোগসূত্ররূপে অবতীর্ণ হয়। এই শহর পশ্চিম এশিয় বণিক ও সুমাত্রার ব্যবসায়ীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আর এভাবে মুঘল আক্রমণের পূর্বেই সুরাট এক cosmopolitan বা বহুজাতিক চরিত্র লাভ করে। মুঘলদের দ্বারা সুরাট অধিকৃত হলে দক্ষিণ গুজরাট ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আরও প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হয়ে যাওয়ায় উত্তর ভারত ও গাঙ্গেয়-দোয়াব অঞ্চল এর পশ্চাত ভূমিতে পরিণত হয়। ফলে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুরাট ভারতের বৃহত্তম বন্দরে পরিণত হয়।

২০.৭ প্রশ্নাবলী

১. মধ্যযুগের ভারতে নৌ-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।
২. আরব সাগরে পর্তুগিজ শক্তির উত্থান কীভাবে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল?
৩. ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে পর্তুগিজ শক্তির উত্থানকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
৪. সুরাট বন্দরের উত্থান বিশ্লেষণ করুন। সুরাট বন্দরের উত্থান এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে কী প্রভাব ফেলেছিল?

২০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (Eds.), *The Cambridge Economic History of India, Volume 1, c.1200-1750,* CUP, 1982

Ashin Dasgupta, *The World of the Indian Ocean Merchant, 1500-1800,* Collected Essays of Ashin Das Gupta, OUP, 2001

Sanjay Subrahmanyam, A Note on the Rise of Surat in the Sixteenth Century, *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 2000, Vol. 43, No. 1, (2000), pp. 23-33

Stephen Dale, *Indian Merchants and Eurasian Trade, 1600-1750,* CUP, 1994

Radhika Seshan, 'Merchants and Marts- Gujarat's Networks of Trade in the Sixteenth and Seventeenth Centuries' in (Edited by Edward A. Alpers and Chhaya Goswami' *Transregional Trade and Traders- Situating Gujarat in the Indian Ocean from Early Times to 1900*, OUP, 2019

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750,* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe*, Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000 -1765,* UK, 2019

গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগের কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ,* কলকাতা, ১৯৮৩

পর্যায় : ৬ ❐ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ সমূহ

একক : ২১ ❐ রাজনৈতিক মতাদর্শ সমূহ: তত্ত্ব এবং প্রয়োগ

গঠন

২১.০ **উদ্দেশ্য**

২১.১ **ভূমিকা**

২১.২ **মুঘলদের অন্তর্ভুক্তকরণ নীতি**

২১.৩ **আকবরের রাজনৈতিক মতাদর্শ**

২১.৪ **রাজনীতিবিদ হিসাবে আকবর**

২১.৫ **উপসংহার**

২১.৬ **প্রশ্নাবলী**

২১.৭ **গ্রন্থপঞ্জি**

২১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন-

- বাবর থেকে আকবর পর্যন্ত মুঘল সম্রাটদের অধীনে ভারতের রাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষাপট সমূহ।
- মুঘলদের সাথে ভারতীয়দের একীকরণের প্রচেষ্টা সমূহ।
- মুঘল প্রশাসনে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তির তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক নীতি সমূহ।

২১.১ ভূমিকা

মুঘল সম্রাট হিসাবে বাবর ও হুমায়ুনের রাজনৈতিক মতাদর্শ কোনো দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে না পারলেও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বাবর ও হুমায়ুন তাদের স্বল্পস্থায়ী শাসনকালে যে রাজনৈতিক দর্শনের উপর মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনাপর্ব ভারতে করেছিলেন, পরবর্তীকালে তার উপর ভিত্তি করে আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। আকবর অত্যন্ত সুদক্ষ শাসক, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ এবং কূটনীতিবিদ ও সমরনায়ক ছিলেন। নিজের দক্ষতার জন্যই আকবর সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিলেন। মুঘল সম্রাটরা সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের উদ্দেশ্যে সুদক্ষ শাসন-ব্যবস্থা কয়েম করেন। এই ব্যাপারে তাঁরা কয়েকজন বিচক্ষণ কর্মচারীর সাহায্য লাভ করেন। এককথায় মুঘল শাসকরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তারের জন্য সামরিক শক্তির পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে ভারতীয়দের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করেন এবং ঐ কৌশলগুলির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের মুঘল প্রশাসনের অন্তর্ভুক্তকরণের নীতি গ্রহণ করেন।

২১.২ মুঘলদের অন্তর্ভুক্তকরণ নীতি

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর বাবর তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও সকলকে তাতে সামিল করার নীতি গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি তাঁর সহযোগী সমরনায়কদের ভারতে জায়গির প্রদান করেন, এর ফলে জায়গির প্রাপক জায়গিরদাররা নিজেদের জায়গিরের নিরাপত্তা এবং সুশাসনের ব্যবস্থা করে পার্শবর্তী এলাকা দখলে সম্রাটকে সাহায্য করতেন। এইভাবে অনেক দেশীয় জমিদাররাও মুঘলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধনীতি গ্রহণের মাধ্যমে বাবর তার রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেন। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, ও ভৌগলিক অবস্থাকে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে বাবর অন্যতম আশ্চর্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সম্রাট ছিলেন। শাসক, যোদ্ধা এবং পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি মধ্যযুগের যে কোন বড় শাসকের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন। হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণের পর নিরন্তর নানা ধরনের চক্রান্তের সম্মুখীন হন। পিতার আদেশ মত সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশের অনেকটা ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দেন, ফলে সাম্রাজ্যের একতা ও সংহতি অনেকাংশে বিপন্ন হয়ে পড়ে। হুমায়ুনের দুর্বলতা তাঁর রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাড়ায় এবং এর পরিণতি স্বরূপ আফগানরা মুঘল সাম্রাজ্যকে নিজেদের অধীনে করে নেয়। জীবনের শেষ পর্বে হুমায়ুন তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে পুনরায় মুঘল সাম্রাজ্য দখল করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর আকবরের যোগ্য নেতৃত্ব, বিচক্ষণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি গ্রহণ ও মধ্য দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্য সাফল্যের শিখরে পৌছায়।

২১.৩ আকবরের রাজনৈতিক মতাদর্শ

১৫৫৬-র জানুয়ারিতে, হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় ভারতে মুঘলদের অবস্থান সুদৃঢ় তো দূরের কথা, স্বস্তিকরও ছিল না। আকবর শাসন ক্ষমতা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণের পূর্বে তাঁর অভিভাবক বৈরাম খাঁয়ের তদারকি — রাজত্বকালকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়টি হল আকবর-এর সিংহাসনে আরোহণের থেকে পানিপথের যুদ্ধের ঠিক আগে পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়টি পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী ঘটনাক্রম পর্যন্ত। তৃতীয় পর্যায় ১৫৫৯-র মাঝামাঝি পর্যন্ত যখন বৈরাম খাঁয়ের ক্ষমতা ও প্রভাব কমতে থাকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের জন্য বৈরাম খাঁয়ের শেষ চেষ্টার মধ্য দিয়ে চতুর্থ পর্যায়টি শুরু এবং দরবারের আমিরদের দলাদলির তীব্রতা বৃদ্ধি ও তদারক রাজত্ব অবসানের মধ্যদিয়ে শেষ। উপরের এই আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বৈরাম খাঁয়ের মত অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আকবরের রাজনৈতিক জীবন শুরু হলেও, নিজের রাজনৈতিক ভাবনার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে কেবল সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা করে তুলেছিলেন তাই নয়, হয়ে উঠেছিলেন মুঘলদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

২১.৪ রাজনীতিবিদ হিসাবে আকবর

আকবর সিংহাসনে বসার পর থেকেই বুঝেছিলেন যে, কেবলমাত্র মুসলমান কর্মচারীগণ এবং অন্যান্য বহিরাগত বিশেষ ব্যক্তিগণের উপর কেবলমাত্র বিশ্বাস রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না। সেই কারণে তিনি ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর সাহায্য নেওয়ার কথা চিন্তা করেন। যার মধ্যে অন্যতম ছিল রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর দূরদর্শিতা। তবে তিনি যে, সব ক্ষেত্রেই বিনা যুদ্ধে রাজপুতদের বিষয়ে সফল হয়েছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে একথা সত্য যে অধিকাংশ রাজপুত রাজ্য মুঘলদের সাথে থাকার ফলে আকবর সাম্রাজ্য

বিস্তার নীতিকে সফলতার সাথে বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। আকবর নিজে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন "একজন রাজা সর্বদা যুদ্ধজয়ের দিকে দৃষ্টি দেবেন, নতুবা তাঁহার প্রতিবেশিরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে।" আবুল ফজল আকবরের রাজনৈতিক আদর্শের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা করে বলেছেনে,—"ছোট ছোট রাজাদের কুশাসনে নিপীড়িত জনতার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি আনার জন্য তিনি রাজ্যজয় করেন।" রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর সৈন্যবাহিনীকে রাজ্যজয়ে ব্যস্ত রাখবার ব্যাপারে আকবরের একটি সামরিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলেছিলেন,—'সৈন্যবাহিনী সর্বদা যুদ্ধে অভ্যস্ত থাকবে, নতুবা অভ্যাসের অভাবে তারা আরামপ্রিয় হয়ে ওঠে।" এহেন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী আকবর ধর্ম সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন।

২১.৫ উপসংহার

ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের প্রসার ঘটেছিল সামরিক শক্তির জোরে, সমর কৌশলের নিপুণতায়। কিন্তু সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব, সংহতি ও সুদৃঢ়করণ নির্ভর করে শাসিতদের কাছ থেকে শাসন করার সম্মতি আদায় করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। বল বা শক্তি কখনই দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী করতে পারে না। মুঘলদের ভারতে আগমনের পূর্বে ক্ষমতার বিচারে দু-ধরনের জনগোষ্ঠী ছিল। প্রথমত, যারা শাসক শ্রেণির মানুষ; দ্বিতীয়ত, যারা উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত। সাধারণ ভাবে, প্রথম শ্রেণিভুক্তরা উৎপাদনের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করত; দ্বিতীয় শ্রেণির জনগণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করত। এর পাশাপাশি ভারতে ছিল বিপুল বৈচিত্র্য — ধর্মগত, জাতিগত, ভৌগলিকগত, ভাষাগত ইত্যাদি। পুরোনো শাসক শ্রেণির একটা অংশকে মুঘলরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, বিশেষ করে যারা মুঘলদের সঙ্গে সমঝোতায় রাজি ছিল না। এদের মধ্যে অধিকাংশরাই ছিল আফগান। রাজপুত শক্তিকে সম্রাট আকবর কাছে টেনে নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজপুতদের শৌর্য ও বীরত্ব তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যুদ্ধ, বিবাহ ও অন্যান্য রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে আকবর অধিকাংশ রাজপুত শক্তির সাহায্য লাভ করেছিলেন। মুঘল-রাজপুত মৈত্রী ভারতে মুঘল শাসনকাঠামোর অন্যতম ভিত্তি। এর ফলে একদিকে যেমন আফগানদের বিরুদ্ধ শক্তি তৈরি করা সম্ভব হয়, অন্যদিকে তেমনি বিদেশি, অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত যোদ্ধাগোষ্ঠীদের উপর মুঘলদের নির্ভরতা হ্রাস পায়। মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের এটি একটি বড়ো কারণ।

২১.৬ প্রশ্নাবলী

১. মুঘলরা কীভাবে ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষদের সাম্রাজ্যের অংশীদার করত?

২. আকবরের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাজনৈতিক নীতি কীভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতিসাধন ও বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল?

৩. মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক মতাদর্শ সমূহ তত্ত্ব এবং প্রয়োগের প্রক্ষিতে বিশ্লেষণ করুন।

২১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989.

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Satish Chandra, *Medieval India- From Sultanat to the Mughals, 1526-1748*, Part-II, 2019

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State,1526-1750,* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot, *India before Europe, Cambridge, 2006*

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000-1765*, UK, 2019

Pratyay Nath, *Climate of Conquest, War, Environment and Empire in Mughal North India*, Oxford, 2019.

Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707*, OUP, 2013

Iswari Prasad, *The Mughal Empire,* Allahabad, Chugh Publications, 1974

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

একক : ২২ ❐ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সূলহ-ই-কুল; সুফি আধ্যাত্মিকতা এবং বৌদ্ধিক মধ্যস্থতা

গঠন

২২.০ উদ্দেশ্য

২২.১ ভূমিকা

২২.২ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও মুঘল সম্রাটগণ

২২.৩ আকবরের ধর্মীয় মতাদর্শ

২২.৪ ইবাদৎখানায় ধর্মীয় আলোচনা

২২.৫ সুলহ-ই-কুল

২২.৬ দীন-ই-ইলাহী ও মহজারনামা

২২.৭ সুফি মতাদর্শ

২০.৮ উপসংহার

২২.৯ প্রশ্নাবলী

২২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন

- মুঘলদের ধর্মীয় দর্শন এবং রাষ্ট্রনীতিতে তার প্রভাব।
- আকবরের ধর্মীয় দর্শন ও তার প্রতিফলন।
- মুঘল শাসনে সুফিদের আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক মতাদর্শ।

২২.১ ভূমিকা

সুলতানি আমলে বিভিন্ন প্রদেশে, যেমন বাংলা গুজরাট, মালব, কাশ্মীর ইত্যাদিতে হিন্দুদের নিচু তলার কাজ পাওয়া ছাড়াও উঁচু পদে নিয়োগ করা হত। লোদীদের অধীনে কয়েকজন হিন্দুকে আমির করা হয়। পানিপথের বিজয়ের পরেই দিল্লীর সিংহাসনে বাবরের নেতৃত্বে মুঘল শাসনের ভূমিকা ঘটে। মুঘলদের নেতৃত্বে শুরু হয় ভারত-ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের। এই প্রথম মুঘল সম্রাটদের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতব্যাপী ঐক্যবদ্ধ মুঘল সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়াস শুরু হয় এবং তা বহুলাংশে বাস্তবায়িতও হয়। রাজনৈতিক ঐক্য, ধর্মীয় সহনশীলতা, সাংস্কৃতিক জাগরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতে 'জাতীয় রাষ্ট্র' গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে জাতীয় রাষ্ট্র শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে — আধুনিক ইতিহাসের দৃষ্টিতে নয়। জাতি, জাতি গঠন, জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় রাষ্ট্র ইউরোপীয় আধুনিকতা থেকে সৃষ্ট। তার সঙ্গে মুঘলদের এক করে দেখলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে।

শাসনতন্ত্র কায়েম করে আকবর ১৫৬৩ সালে হিন্দুদের তীর্থের উপর থেকে কর তুলে নেন। মথুরা ও অন্যান্য তীর্থে গেলে হিন্দুদের যে কর দিতে হত, সেটি উঠে যায়। আকবর শাসনতন্ত্র নিজের হাতে নেওয়ার পর বীরবল আকবরের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি আকবরের সঙ্গে যেখানে যেতেন, সেখানে তিনি নিজের ধর্ম পালন করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তখনো আকবর গোঁড়া উলেমাদের মত গ্রহণ করতেন, কিন্তু রাষ্ট্রনীতিতে উদারতা আসছিল। ধর্ম যে রাষ্ট্রনীতি থেকে আলাদা সেটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসে। ব্যক্তিগত মত ছাড়াও হিন্দুদের রাষ্ট্রনীতির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা কেন আকবর করেছিলেন, এটা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আকবর উদার সুফি চিন্তাবিদ যেমন মৌলানা রুমি ও হাফিজ-এর লেখা শুনতে ভালবাসতেন। এর ফলে ওঁর একটা অনুসন্ধিৎসু মন তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

২২.২ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও মুঘল সম্রাটগণ

মুঘল ভারতের ধর্মীয় জীবনে প্রাথমিক ভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া। সুলতানদের অনেকেই হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করলেও তাঁরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে শাসন-ব্যাপারে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের সমান অধিকার দিতে পারেননি। শেরশাহ সর্বপ্রথম শাসন-ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ তুলে দেন।

বাবর সুন্নি ছিলেন কিন্তু তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বে বাবর হিন্দুদের ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জিহাদের সঙ্গে তুলনা করতেন। কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করার পর তিনি হিন্দুদের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নি। ধর্মগত কারণে সমস্যায় পড়েছেন ভাগ্যবিড়ম্বিত সম্রাট হুমায়ুন। সুন্নি মতে হুমায়ুনের ছিল অটুট বিশ্বাস। মধ্য এশিয়ায় ভাগ্য পুনরুদ্ধারের জন্য হুমায়ুন যখন ব্যস্ত, সেই সময় পারস্যের শাহের সাদর অভ্যর্থনায় হুমায়ুন আশ্বস্ত হন। কিন্তু হুমায়ুনকে অভ্যর্থনার পেছনে পারস্যের শাহের এক গূঢ় চক্রান্ত ছিল। তিনি হুমায়ুনকে শিয়া মতবাদে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক সাফল্যের আশায় হুমায়ুন সম্মত হন। সম্রাট হুমায়ুন শান্ত স্বভাবের এবং দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। ক্ষমা ছিল তার কাছে বড় ধর্ম। তিনি নিজে সাহিত্য চর্চা করতেন এবং পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। জীবনে তিনি অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু কখনও তিনি হতাশ হননি।

ব্যক্তিগত জীবনে সম্রাট আকবর গোঁড়া মুসলমানদের মতই ধর্ম পালন করতেন। মুঘল সাম্রাজ্যে বিশাল হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল — তুর্কি, পারসিক, ধর্মান্তরিত মুসলমান ও পরে খ্রিস্টানরা ছিলেন। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য আকবর কয়েকটি নীতি নিয়েছিলেন। দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও সম্প্রীতি আনার জন্য তিনি হিন্দুদের উপর থেকে কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। তীর্থ কর, জিজিয়া ও অন্যান্য কয়েকটা কর বাতিল করে দেন। রাজ্যের উচ্চপদগুলি হিন্দুদের জন্য খোলা রাখা হল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বোঝাপড়া ভালো করার জন্য একদিকে ফারসি শিক্ষা ও অন্যদিকে সংস্কৃত ও হিন্দি শেখানোকে উৎসাহ দেওয়া হতে লাগল। তাঁর সুল-ই-কুল নীতির দ্বারা হিন্দুদের আরো কাছে টেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। ইবাদৎখানায় বিতর্কে ক্রমশ গোঁড়া উলেমারা অপদস্থ হতে থাকে। পরবর্তীকালে দীন-ই-ইলাহির প্রবর্তন করা হয়।

আকবর সারা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হবার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটি চেঙ্গিস খানের সময় থেকে এসেছে। কিন্তু তার জন্য প্রথম কাজ ছিল সারা ভারতকে একই শাসনে বাঁধা। তাঁর এ স্বপ্ন তাঁর জীবদ্দশায় বাস্তবে পরিণত হতে পারেনি।

২২.৩ আকবরের ধর্মীয় মতাদর্শ

ব্যক্তিগত জীবনে সম্রাট আকবর ছিলেন উদার, ফলে সমাজ ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর এই মতাদর্শের প্রতিফলন স্বাভাবিক ছিল। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে আকবর গোঁড়া মুসলমানদের ধর্ম পালন করতেন। কিন্তু শীঘ্রই তার অনুসৃত রাষ্ট্রনীতিতে উদারতার ছাপ ফুটে উঠতে থাকে, যদিও তখন দরবারে গোঁড়া উলেমাদের প্রাধান্য ছিল। বিচক্ষণ সম্রাট আকবর এই সময়ে ধর্মালোচনার মধ্য দিয়ে নতুন পথের সন্ধান করতে থাকেন যার ফলে তাঁর ধর্মমতের আমূল পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে এর ছাপ রাষ্ট্রনীতির উপরও পড়ে।

উজবেগ অভিজাতদের পরাজিত করার পর ও মালব, রাজস্থান এবং গুজরাট বিজয়ের পর আকবরের মানসিকতার পরিবর্তন শুরু হয়। তাঁর ক্রমশ মনে হতে থাকে যে তিনি ভারতবর্ষকে এক করার জন্য ভগবানের প্রেরিত পুরুষ। বদাওনী বলছেন যে এই সময়ে সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তার হয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে এর বিরুদ্ধাচরণ করার মত কেউ নেই। সম্রাটের হাতে সময় ছিল বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করার। দরবারে আলোচ্য বিষয়সূচী হয়েছিল ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা।

২২.৪ ইবাদৎখানায় ধর্মীয় আলোচনা

১৫৭৫ সালে ফতেপুর সিক্রীতে ইবাদৎখানা তৈরি হয়। এক বড় সুফি সন্ত শেখ আবদুল্লা নিয়াজী গুজরাট থেকে এসেছিলেন। তাঁর থাকার ঘরের চারপাশ দিয়ে একটা বড় সৌধ তৈরি করা হয়। চারদিকেই বড় বসার জায়গা ছিল। সম্রাটের প্রাসাদ থেকে এটা বেশি দূরে ছিল না যাতে আকবর সহজেই যাতায়াত করতে পারেন। ধর্মীয় আলোচনা কেন্দ্র ইবাবদৎখানা-তে প্রথম দিকে শুধু মুসলমানরাই আলোচনা করতেন। সরকারি কাজকর্ম সেরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে আকবর এখানে আসতেন। বেশি লোক হলে অনুপ তালাওর চত্বরে এই আলোচনা বসত। কখনো কখনো আকবর তাঁর শোবার ঘরে এই আলোচনা চালাতেন। প্রথমদিকে চারটি অংশে ভাগ করে আলোচনা হত এবং আকবর এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতেন। আকবর বলেছিলেন যে এই আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য অনুসন্ধান করা। কিন্তু উলেমারা এই সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্ম যে বেশি উন্নত সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগল। একটা বিষয় যেমন ছিল যে শাসক কতগুলি বিবাহ আইনত করতে পারেন। দেখা গেল যে এতে খুব মতবিরোধ হচ্ছে। উলেমারা অনেক সময়ে নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে হাতাহাতি হবার উপক্রম হত।

১৫৭৮ সালে আকবরের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পর তিনি হিন্দুদের জন্য দরজা খুলে দেন। জৈন, খ্রিস্টান ও জোরোস্ট্রিয়ানরাও এর মধ্যে আসেন। এর ফরে আরো গোলমাল বাড়ে। কতকগুলি বিষয়ে যেগুলি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ নেই, যেমন কোরানের বাক্য, মুহম্মদের নবী হওয়া, একেশ্বরবাদ, সেগুলি নিয়েও এখন প্রশ্ন উঠতে লাগল যার ফলে গোঁড়া মুসলমানরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আকবর নিজেও বুঝতে পারছিলেন যে আলোচনা নিষ্ফল হচ্ছে। ১৫৮১ সালে তিনি ইবাদৎখানা-র আলোচনা প্রায় বন্ধ করে দেন এবং ১৫৮২ সালে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আকবর কী চেয়েছিলেন সেটা বলা যায় না। সম্ভবত তিনি চাইছিলেন যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাদের বিভেদ ভুলে একটা সাধারণ জায়গায় এসে দাঁড়াবে। কিন্তু এদের ঐ ধরনের বিভেদ রক্ষা করার একটা স্বার্থ ছিল। এছাড়াও, প্রত্যেকেই তার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল এবং চাইছিল অন্যকে তর্কে পরাস্ত করে সম্রাটকে তার দিকে নিয়ে আসার জন্য। সাধারণ বোঝাপড়ার মধ্যে যেতে তাদের কোন উৎসাহ ছিল না।

২২.৫ সুলহ-ই-কুল

ইবাদৎখানা-র বিতর্ক চলার সময়েও আকবর ব্যক্তিগতভাবে সাধু ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতেন। এইভাবেই তিনি পুরুষোত্তম দেবীর সঙ্গে আলোচনা করেন। শেষে তাজউদ্দিন ও মোল্লা মুহম্মদ ইয়াজদ-এর সঙ্গে একই খাটিয়াতে বসে আলোচনা করেছেন। ইবাদৎখানা বন্ধ হয়ে যাবার পরও এইসব আলোচনা চলতে থাকে। বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছা আকবরের ছিল না। উনি নিজেই বলেছেন যে ধর্মগুরুদের কাছ থেকে এই ধরনের মতভেদ, এমনকি নবীর পরম্পরা বা কোরাণের ব্যাখ্যায় যে মতভেদ তিনি শুনেছেন, সেগুলি না শুনলেই ভালো হত। কিন্তু ইবাদৎখানা-র বিতর্ককে অসার বলে আখ্যা দেওয়া ভুল হবে। এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল ধরা যেতে পারে। প্রথমত, এই বিতর্ক থেকে আকবরের বিশ্বাস জন্মায় যে সব ধর্মের মধ্যেই কিছু সত্য আছে। এটা উনি অনুধাবন করেন যে সব পথ ধরেই পরমাত্মার কাছে পৌঁছানো যায়। আকবেরর ব্যক্তিগত ধর্মমত তৈরির পক্ষে ছিল এটি একটা বড় সোপান, যার থেকে সুলহ-ই-কুলের (সব ধর্মের মধ্যে শান্তি) ধারণা চলে আসে। দ্বিতীয়ত, এই বিতর্ক দরবারের মোল্লাদের সংকীর্ণ মতবাদ, গোঁড়ামী ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, যার ফলে তাদের সঙ্গে আকবরের একটা ফারাক তৈরি হয়। আবুল ফজল ও অন্যান্যরা আকবরের ধ্যান-ধারণার কাছাকাছি ছিলেন এবং তাঁরা মোল্লাদের গোঁড়ামী ও অজ্ঞানতা প্রকাশ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এর থেকে বলা যায় যে উদার ধর্মনীতি রাষ্ট্রের পক্ষে করার পিছনে ইবাদৎখানা-র বিতর্কের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল।

ইবাদৎখানার আলোচনা ও বিতর্কবিবাদ থেকে আকবর এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ইসলামের কোনো একটি ব্যাখ্যা সঠিক, এমনকি সর্বাগ্রগণ্যও নয়। আর কোনো একটি ধর্মই চূড়ান্ত সত্যের প্রকাশ হতে পারে না। বরং সমস্ত ধর্মমতই পরম সত্যের এক ক্ষুদ্র অংশের বহিঃপ্রকাশ। ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তি হিসাবে তাঁরই দায়িত্ব পরিপূর্ণ শান্তি বা সূলহ্-ই-কুল সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করা; যাতে বিভিন্ন ধর্ম এবং উপদলগুলির প্রবক্তারা অকারণ কোন্দলে লিপ্ত না হয়। এটা বলা হয় যে "ধর্ম (দীন) এবং (ঐহিক) পৃথিবী দুনিয়া" উভয়েই দ্বৈততার মেঘ' সমাচ্ছন্ন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাইরে এদের অবস্থান। এর ফলে সমস্ত ধর্ম সম্পর্কেই সহিষ্ণুতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় কিন্তু অনুসরণ করাটা বাধ্যতামূলক নয়। যদিও আকবরের এই সর্বেশ্বরবাদ এবং সূলহ্-ই-কুল-এর প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে অন্য বিতর্কের ভূমিকা হলেও সম্রাট নিজের রাজনৈতিক বুদ্ধিবলে তাকে প্রতিহত করেন।

২২.৬ দীন-ই-ইলাহী ও মহজারনামা

১৫৭৯ সালে সাতজন প্রধান উলেমা, যার মধ্যে আবদুন নবী ও আবদুল্লা সুলতানপুরী এবং আবুল ফজলের বাবা শেষ মুবারকও ছিলেন, সই করে একটি বিবৃতি দেন যাকে মহজর বলা হয়। এটি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন যে পোপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আকবর নিজেকে অভ্রান্ততার গুণ আরোপ করেছিলেন। মাখনলাল রায়চৌধুরী মনে করছেন যে এর দ্বারা আকবর তুর্কি খলিফাদের ও ইরানের শিয়াদের হাত থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানের কয়েকজন ঐতিহাসিক একে 'অসৎ দলিল' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এর ফলে আকবর আইনের ব্যাখ্যা করার অধিকার নিয়েছিলেন যদিও উনি ছিলেন প্রায় নিরক্ষর। শুধু তাই নয় আকবরের এই ঘোষণার মর্মার্থ রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায় ভালোভাবে নেয়নি। যদিও সম্রাট এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠন করতে তৎপর ছিলেন যেখানে সকলেই সমান, সেখানে ধর্মের বিভিন্নতার জন্য কেউ শাস্তি ভোগ করবেন না বা অবহেলিত হবেন না। এই উদ্দেশ্যেই তিনি দীন-ই-ইলাহী নামক একটি মতবাদও প্রচার করেন। এই

নূতন মতবাদটি ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রচারিত হয়। এতে সকল ধর্মের সার গ্রহণ করা হয়। এ মতাদর্শে কোন প্রেরিত পুরুষ ছিলেন না বা কোন অন্ধবিশ্বাস ছিল না; সম্রাট নিজেই ছিলেন এর উদ্যোক্তা। এই মতবাদের ভিত্তি ছিল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস বা একেশ্বরবাদ।

২২.৭ সুফি মতাদর্শ

ষোড়শ শতকের ধর্ম আন্দোলন, ধর্মীয় উদারতা এবং প্রেম ও ভক্তিবাদের প্রচার আকবরের জিজ্ঞাসু-মননে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, সুফিসন্ত ও ভক্তিবাদী সাধকদের মানবপ্রেম ও সহিষ্ণুতা আকবরকে আকৃষ্ট করেছিল। শুধু তাই নয়, আকবর ছিলেন সাদী, রুমী, হাফিজ প্রমুখের মত একজন উদারপন্থী সুফি বলে অনেকে মনে করেন। এমনকি তাদের মতে আকবরের 'দীন-ই-ইলাহি' ছিল প্রকৃত পক্ষে 'ইসলামের একটি সুফি রূপ'। সুফি দর্শনের 'আত্মা অবিনশ্বর এবং পরমাত্মার অংশবিশেষ' এই বক্তব্য আকবরের মনে গভীর রেখাপাত করে। ইরান এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতের কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাই নয়, সেখান থেকে আগত সুফি বা মুসলিম মরমিয়া সাধনার পরম্পরাগুলি ভারতে অনুকুল পরিবেশ পেয়েছিল। ফলে ষোড়শ শতক নাগাদ অধিকাংশ গোঁড়া ধর্মতত্ত্ববিদ ইসলামের বাহ্যিক আইনকানুন, শরিয়ত মানার শর্তসাপেক্ষে সুফিবাদকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। আকবরের সৃষ্টির মধ্যে একতার মতবাদকে বহু সুফি সমর্থন করেছিলেন। তবে সুফিদের গোঁড়া মতাবলম্বীরা এর বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। সুফি দর্শনের বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবনা থেকে আকবর নিজের ধর্মীয় মতাদর্শকে কেবলমাত্র পরিশীলিত করেছিলেন তাই নয়, রাষ্ট্রনীতিতেও তিনি সুফি দর্শনকে প্রয়োগ করেছিলেন বলেই রাষ্ট্র পরিচালনায় সকলকে তিনি সামিল করতে পেরেছিলেন।

২২.৮ উপসংহার

মুঘল শাসন ভারতে শুরু হওয়ার আগে থেকেই এই দেশে ইসলাম ও তার বিভিন্ন ধারার অস্তিত্ব ছিল। এর পাশাপাশি ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সনাতন ধর্ম সমূহ, যা প্রাচীন যুগ থেকে ভারতে প্রচলিত। হিন্দু ধর্মের অজস্র শাখা-প্রশাখা — শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, আউল, বাউল ইত্যাদি, ইসলামের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা যেমন সুফি, দরবেশ প্রভৃতি এই বিশাল দেশে বহমান ধারা মত ছিল। মুঘল সম্রাটগণ, বিশেষত, আকবর এই ধর্মীয় বৈচিত্র্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রনীতিকে তিনি সুনির্দিষ্ট ভাবে ও ক্রমান্বয়ে ধর্মের পরিসর থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তাঁর সময় ধর্মের ভিত্তিতে তিনি কাউকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করতেন না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি যথাসাধ্য সহনশীলতার নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সুলহ-ই-কুল ও দীন-ই-ইলাহী তাঁর উদ্ভাবিত প্রকল্প যা দিয়ে তিনি বহুর মধ্যে এক কে এবং এক এর মধ্যে বহুকে দেখতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের চিরন্তন সত্যকে আকবর কিছুটা হলেও স্পর্শ করতে পেরেছিলেন।

২২.৯ প্রশ্নাবলী

১. সুলহ-ই-কুল সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।
২. দীন-ই-ইলাহী কী?
৩. আকবরের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন।
৪. সুফি মতাদর্শ কি আকবরকে প্রভাবিত করেছিল?

২২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

A. L. Srivastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1989

Douglas E. Streusand, *The Formation of the Mughal Empire*, Delhi, 1989.

John F. Richards, *The Mughal Empire*, Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India*, New Delhi, 2007

Satish Chandra, *Medieval India- From Sultanat to the Mughals, 1526-1748*, Part-II, 2019

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750*, New Delhi, 2005

Catherine B. *Asher and Cynthia Talbot, India before Europe*, Cambridg, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000-1765*, UK, 2019

Iswari Prasad, *The Mughal Empire*, Allahabad, Chugh Publications, 1974

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০

ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৯

একক : ২৩ □ উলেমাদের ভূমিকা

গঠন

২৩.০ উদ্দেশ্য

২৩.১ ভূমিকা

২৩.২ ইসলামিক রাষ্ট্র-কাঠামোতে উলেমাদের ভূমিকা

২৩.৩ সম্রাট আকবর, উলেমা গোষ্ঠী ও ইসলামী ধর্মতত্ত্ব

২৩.৪ উপসংহার

২৩.৫ প্রশ্নাবলী

২৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার উদ্দেশ্য হল

- মুঘল রাজদরবারে, বিশেষত সম্রাট আকবরের সময় উলেমাদের ভূমিকা কী ছিল।
- আকবরের সময় মুঘল রাষ্ট্র-উলেমা সম্পর্ক কী ভাবে বিবর্তিত হয়েছিল।

২৩.১ ভূমিকা

মুঘলদের সময়কালে উলেমাদের অবস্থান ও ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়টি আমরা সুলতানি পরম্পরার সূত্রে মুঘল দরবার, প্রশাসন ও মুসলিম সমাজে দেখতে পাই। যেমন, লোদীদের সময়কালের উলেমা মুকদাম-উল-মুলক মুঘলদের আদি পর্বের শাসনে প্রভাবশালী আমলা পদে আসীন ছিলেন। ধর্মীয় রক্ষণশীলতার পরিমণ্ডলে আকবর তার জীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে দরবারে উলেমাদের ঔদ্ধত্য, সংকীর্ণ মানসিকতা, অসহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক বৈরিতার কারণে উলেমাদের সম্পর্কে আকবরের মোহমুক্তি ঘটে। ফলে তিনি ইতিপূর্বে তার দরবারে ক্ষমতা ও সম্মানপ্রাপ্ত কয়েকজন উলেমাকে, মুকদাম-উল-মুলক, শেখ-আল-ইসলাম এবং শেখ আবাদ-আল-নবিকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং হিজাজ-এ নির্বাসনের নির্দেশ প্রদান করেন। উলেমাদের ক্ষমতাকে আকবর যেভাবে হ্রাস করেন তা তারা আর কখনই ফিরে পায়নি। এমনকি ঔরঙ্গজেবের সময়ও নয়।

২৩.২ ইসলামিক রাষ্ট্র-কাঠামোতে উলেমাদের ভূমিকা

মুসলিম আইনজ্ঞদের মতে মুসলিম শাসকদের আদর্শ হল তাদের প্রজাদের রক্ষা করা ও শরিয়তি আইন মেনে চলা। স্বাভাবিক ভাবেই ইসলামিক রাষ্ট্র কাঠামোতে মুসলিম আইনের সঠিক প্রয়োগ ও যথাযথ প্রচারের জন্য শাসকরা উদ্যোগী হবেন এটাই ছিল ইসলামিক ধর্মতত্ত্ববিদগণের অভিপ্রায়। এই উদ্দেশ্যে সরকার একদল অভিজ্ঞ জ্ঞানী এবং পণ্ডিত লোক রাখতেন যারা মুসলিম ধর্ম প্রচার করবে ও সম্রাটকে প্রয়োজনমত মন্ত্রণা দেবে। এই পণ্ডিতদের উলেমা বলা হত যাদের মধ্যে থেকে একজনকে সম্রাট প্রধান হিসেবে বেছে নিতেন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভূমিকার আদিপর্বে বেশকিছু নকশবন্দি সুফিসন্তদের পীর হিসাবে যে সব ভূমিকা পালন করতে আমরা দেখতে পাই তা কখনওই

তাদেরকে রাজকীয় পীরের অভিধায় ভূষিত করে না। লক্ষণীয় বিষয় হল এই সুফিদের মধ্যে অনেকেই আবার উলেমা হিসেবে পরিচিত লাভ করেছিল। আকবরের শাসনকালের ভূমিকায় খাজা আবাদ আল-শাহিদ সমরখন্দ থেকে ভারতে এলে আকবর তাকে পাঞ্জাব প্রদেশের চামরি পরগণা প্রদান করেন এবং তিনি সেখানে দুই দশক পর্যন্ত আধ্যাত্মবাদী সাধনাতে মগ্ন ছিলেন। আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় আমরা কাশগড়ের নকশবন্দি সুফি সাধক শরাফউদ্দিন হুসেন সম্রাটকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এই বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করি। শরাফউদ্দিন হুসেন পরবর্তীকালে মুঘল দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদ ও ক্ষমতাভোগীতে পরিণত হয়েছিলেন। মুঘল দরবার ও প্রশাসনে নকশবন্দিদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৫৭০-এর দশকের পর থেকে তাদের প্রভাব হ্রাস পায়। কেবলমাত্র আবাদ-আল-আজিম, যিনি সুলতান খাজা নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন তিনিই শুধু আকবরের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

২৩.৩ সম্রাট আকবর, উলেমা গোষ্ঠী ও ইসলামী ধর্মতত্ত্ব

১৫৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমরা সম্রাট ও অভিজাতদের সম্পর্কের যে নতুন সমীকরণ দেখতে পাই তা রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনে এবং বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের বিশেষত, হিন্দু ও শিয়াপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করে। যেহেতু মুঘলরা হানাফি সুন্নি মতাবলম্বী ছিল এবং আকবর নিজেও ১৫৭০-এর দশক পর্যন্ত এই মতাদর্শের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন ফলে প্রশাসনে অ-মুসলিম এবং অ-সুন্নিদের নিয়োগের ফলে পুর্বের সমস্ত ভাবধারায় পরিবর্তন আসে। এই ঘটনার পরিণতিতে আমরা দেখতে পাই ১৫৭০-এর দশকের পর আকবর ইসলামিক শাসকের পরিবর্তে নিজেকে সার্বজনীন শাসকের মর্যাদায় আসীন করেন। এমনকি এই সময় থেকে আকবর চিস্তি সুফি সাধনার প্রতি নিজের আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। তবে চিস্তিদের তিনি রাজকীয় পীরের মর্যাদা দিয়েছেন এরকম কোন প্রমাণ নেই। তবে একথা ঠিক যে বালক আকবরের শাসনকালে রাষ্ট্র ও প্রশাসনকে উলেমারা বিভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিল। ফলে রাষ্ট্রের বিভেদকামী চিন্তা প্রকট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের কোন নজির উলেমারা এই সময় স্থাপন করতে পারেননি। যার দরুণ আমরা দেখতেপাই ধর্মরক্ষার নামে উলেমারা কেবলমাত্র অ-মুসলমানদেরই নয়, মুসলমানদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের কণ্ঠরোধ করতেও পিছুপা হননি। উলেমাদের এই অসহিষ্ণু আচরণ যুবক আকবরকে ব্যাথিত করে এবং রাষ্ট্র ও প্রশাসনে তিনি উলেমাদের প্রভাব ও আধিপত্য খর্ব করতে ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'মাহজারনামা' ঘোষণা করে কোরানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারীর ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন। শেখ মুবারক ঐ ঘোষণাপত্রটি লিখেছিলেন এবং এতে পাঁচ জন উলেমা স্বাক্ষর করেন। এই ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে সম্রাটের নির্দেশ পালনে উলেমারাও বাধ্য ছিল। তবে এ কথা ঠিক যে সম্রাটের এই ঘোষণায় গোঁড়াপন্থী উলেমারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সম্রাটকে চাপে রাখার কোনো কৌশল বা ক্ষমতা কিছুই এই সময় উলেমাদের ছিল না। কেবল মাত্র বিক্ষিপ্ত কিছু বিরোধিতার নজির উলেমারা গড়ে তুলেছিলেন যার অন্যতম হল ভ্রাতা হাকিম এর বিদ্রোহ। বদাউনি উলেমাদের পতনকে ইসলামের পতন হিসাবে দেখেছেন। তাঁর মতে, আকবর উলেমাদের যে শাস্তি দেন তার ফলে মসজিদ, খানকা ও মাদ্রাসার অবনতি হয়েছিল। তবে আমরা জানি যে জীবনের শেষ পর্বে বদাউনি আকবরের প্রতি বিরূপ ছিলেন ফলে তার এই মন্তব্যে অতিরঞ্জন অবশ্যই আছে। কারণ মুসলমানদের গণপ্রার্থনার অধিকার আকবর কখনই খর্ব করেননি। সবচাইতে বড় কথা ভারতে তরিকতের যুগ (সুফিদের যুগ) আকবরের সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বিস্তারলাভ করতে পেরিছিল। আর বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো রক্ষণশীল (শরিয়ত) ইসলামের যুগ। উল্লেখ্য যে এই শরিয়তপন্থী গোঁড়া মুসলিম উলেমাদের নেতৃত্বেই ধর্মের বিধিবিধান সংকলিত হয়। ধর্ম নিয়ে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংস্কার সাধিত হয়। সেইকারণে আমরা দেখতে পাই, উলেমারা আকবরের ভাব ও ভাবনার পরিপন্থী দর্শনকে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাবনায় প্রযুক্ত করার চেষ্টা করলেও সফল হতে পারেননি। এর আরও একটি প্রমাণ হল উলেমারা মুতাহ ও নিকাহ বিধি অনুযায়ী মুসলমান পুরুষদের চার বা ততোধিক পত্নী গ্রহণের অধিকারের কথা বলেছিলেন আকবর তার বিরোধিতা করেন। তিনি আদেশ জারি করে বলেছিলেন সাধারণ আয়ের মুসলমান একপত্নী গ্রহণ করবেন, এই পত্নী বন্ধ্যা প্রমাণিত হলে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবেন। তবে সম্রাট আকবরের বহুবিবাহের সমর্থনে এই উলেমারাই আবার কোরানের ভ্রান্ত বাখ্যা করে সম্রাটের আনুগত্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন সে নজিরও আছে।

২৩.৪ উপসংহার

এই এককটিতে মুঘল শাসনের প্রাথমিক পর্বের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের পরম্পরাকে তুলে ধরার পাশাপাশি সম্রাট আকবরের শাসনকালে ধর্ম ও ধর্মীয় মতাদর্শের বিবর্তন এবং ধর্মগুরুদের ভূমিকাটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। আকবর একদিকে ছিলেন সুন্নি ইসলামি ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী; অন্যদিকে ছিলেন বাস্তববাদী ও স্বচ্ছচিন্তার অধিকারী। তাঁর শাসনকালের প্রাথমিক পর্যায়ে উলেমারা তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল যা তিনি মানতে পারেননি। রাষ্ট্রনীতিকে তিনি বহুলাংশে ধর্মের প্রভাবমুক্ত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে সুফি মত তাঁকে প্রভাবিত করে। এর ফলে রাজদরবারে উলেমাদের প্রভাব প্রায় ক্ষীণ হয়ে যায়। 'মাহজারনামা' ঘোষণা অনুযায়ী কোরান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্তরে আকবর কী পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

২৩.৫ প্রশ্নাবলী

১. ধর্মীয় সহনশীলতার ধারণাটিকে আকবর কী ভাবে রাষ্ট্র ও প্রশাসনে প্রয়োগ করেছিলেন ব্যাখ্যা করুন।

২. আকবর কীভাবে উলেমাদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন?

২৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

John F. Richards, *The Mughal Empire.* Cambridge, 1993

Satish Chandra, *Histroy of Medieval India,* New Delhi, 2007

Satish Chandra, *Medieval India- From Sultanat to the Mughals, 1526-1748,* Part-II, 2019

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (Eds.), *The Mughal State, 1526-1750,* New Delhi, 2005

Catherine B. Asher and Cynthia Talbot– *India before Europe.* Cambridge, 2006

Richard Eaton, *India in the Persianate Age, 1000 - 1765,* UK, 2019

Aziz Ahmad, "The Role of Ulema in Indo,Muslim History", *Studia Islamica,* 1970.

Muzaffar Alam, "The Mughals, the Sufi Shaikhs and the formation of the Akbari Dispensation", *Modern Asian Studies, 2009.*

NOTES

NOTES